উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন

পপুলার লাইব্রেরী
১৯৫।১বি, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

এ কালের বাঙালীর তুলনায় সে কালের অর্থাৎ উনিশ-শতকের বাঙালীর দেহ ও মনের জঠরে যে জারক রসের আধিক্য ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। তাই তাঁহারা প্রতীচীর ভাবধারা আত্মসাৎ করিয়া বাংলা সাহিত্যের অভাবনীয় শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন।

উনিশ শতকের বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাবধারার সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের ইতিহাস। ইহার ফলে বাংলা দেশে যে নব জাগৃতি ঘটিয়াছিল, বিগত শতাব্দীর সাহিত্য উহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

একজন মনস্বী পাশ্চাত্ত্য সমালোচক বলিয়াছেন, রাজ্ঞী এলিজাবেথের যুগে আমরা ইংরেজ জাতির জীবনে এক নূতন প্রাণের স্পন্দন দেখিতে পাই। এই যুগে একদিকে দুর্গমের অভিযাত্রীদের ক্লান্তিহীন প্রচেষ্টার ফলে নব-নব দেশের আবিষ্কার হইয়াছিল, অপরদিকে সাহিত্যে একই কালে বহু প্রতিভার অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। ফলে, ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা একদিকে যেমন বাহিরের প্রকাণ্ড জগৎ-সম্পর্কে সচেতন হইয়াছিল, তেমনি অন্তর্জগতের রহস্য-সন্ধানেও অনেক মনীষীর কৌতূহল জাগ্রত হইয়াছিল। তাহাদের অন্তরে জাগিয়াছিল নূতন আশা, নবীন আকাঙ্ক্ষা, তাহাদের দৃষ্টি পড়িয়াছিল গ্রীক ও লাটিন ভাষায় রচিত পুরাতন সাহিত্যের অতুলনীয় ঐশ্বর্যের দিকে, আর তাহারা দেখিয়াছিল গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন। ফলে, ইংরেজি সাহিত্যের অভাবনীয় শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় যাহা ঘটিয়াছিল, তাহাও অনেকাংশে অনুরূপ ঘটনা। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-দীক্ষার ফলে একটি বিপুল ও সমৃদ্ধ সাহিত্য-জগৎ বাংলার মনীষীদের চোখের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল, সেই সাহিত্যের দুইটি বৈশিষ্ট্য তাহাদিগকে আকৃষ্ট করিয়াছিল—(১) স্বদেশপ্রেম ও স্বাজাত্যবোধের আদর্শ ও (২) মানবতার জয়গান। ফলে, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের বিশাল ভাণ্ডারের দিকেও তাহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। আবার আমাদের সৌভাগ্যক্রমে বিগত শতাব্দীতে বাংলায় যুগপৎ বহু

মনীষারও আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। বাস্তবিক, এই যুগে বাংলার নব জাগরণ ও বাঙালীর সাহিত্য-সাধনা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

'উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে' বাংলার কয়েকজন বিশিষ্ট মনীষীর অন্তর্জীবন, জীবন-দর্শন ও সাহিত্য-কৃতির পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছি।

উনিশ শতকে 'যুগসন্ধির কবি' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রতীচ্যের সাহিত্যভাণ্ডারের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত না হইলেও যুগের প্রভাবকে একেবারে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। আবার সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী 'নাটুকে রামনারায়ণ' পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে অনভিজ্ঞ হইলেও সাহিত্যের মধ্য দিয়া সমাজ-সংস্কারেরই প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু মদনমোহন তর্কালঙ্কার একজন শব্দ-কুশলী কবি হইলেও তাঁহার কাব্যে যুগ-চেতনা প্রতিফলিত হয় নাই, তিনি ছিলেন ভারতচন্দ্রেরই ভাব-শিষ্য। এই জন্যই আমরা ঈশ্বর গুপ্ত ও রামনারায়ণের প্রতিভার পরিচয় দিতে প্রয়াস পাইয়াছি কিন্তু মদনমোহন আমাদের আলোচনার বিষয়ীভূত হন নাই।

একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র শুধু স্বয়ং একটি যুগ নহেন, যুগ-প্রবর্তকও বটেন। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া বাংলা সাহিত্যে যে লেখক-গোষ্ঠীর অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে উপন্যাস-রচনায় রমেশচন্দ্র দত্ত এবং প্রবন্ধে ও সমালোচনায় অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও চন্দ্রনাথ বসু বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। আবার, এককালে বাংলার কার্লাইল নামে পরিচিত কালীপ্রসন্ন ঘোষও এই বঙ্কিম-যুগেই বাংলার প্রবন্ধ-সাহিত্যে বিশুদ্ধ গৌড়ী রীতির প্রবর্তন করিয়াছিলেন। এদিকে বঙ্কিমের অন্যতম ভাব-শিষ্য চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় বাংলার প্রবন্ধ-সাহিত্যে কাব্যরসের সঞ্চার করিয়াছিলেন। কিন্তু 'উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে' আমি এই লেখক-গোষ্ঠীর সম্পর্কে স্বতন্ত্র কোন আলোচনা করি নাই। কেন-না, এক হিসাবে ইঁহারা জ্যোতিষ্মান্ বঙ্কিম-সূর্যের প্রদক্ষিণকারী গ্রহমণ্ডলী।

কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী উনিশ শতকের প্রায় শেষ পাদে (১৮৭০) বাংলার কাব্যকুঞ্জকে এক অভিনব সুরে ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিয়াছিলেন, কিন্তু বীরগাথা বা মহাকাব্যের যুগে বিহারীলালের অস্ফুট কণ্ঠের কাকলী বাংলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদেরও 'কানের ভিতর দিয়া মর্মে প্রবেশ করে নাই'। রবীন্দ্র-

নাথ বলিয়াছেন—'এদেশে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য হইতে আনীত নবগীতিকবিতার আদি কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী। মহাকাব্যের উচ্চ শিখর হইতে অবতরণ করিয়া গীতিকবিতার স্বর্ণসিংহদ্বার তিনিই বিশেষভাবে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন'। কিন্তু সকলেই জানেন, বিহারীলাল যে পথে সাধনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই পথে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' করিয়া পরিপূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ। উনিশ শতকের কবি হইয়াও বিহারীলালের সাহিত্য-সাধনার ধারা ছিল স্বতন্ত্র। এদিকে রবীন্দ্রনাথও উনিশ শতকেই সাহিত্য-সাধনা আরম্ভ করেন এবং এই শতকেই স্বীয় প্রতিভার বলে স্বতন্ত্র পথ বাছিয়া লন। তথাপি উনিশ শতকের শেষার্ধে শিক্ষিত বাঙালীর হৃদয়-সিংহাসনে পাঁচজন কবিই বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন,—যুগ-প্রবর্তক মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র (সংস্কৃত আলঙ্কারিকের সংজ্ঞায় বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয়ই একজন শ্রেষ্ঠ কবি) এবং যুগ-প্রতিনিধি রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র।

এই জন্যই আমরা 'উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে' বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথের অভিনব ও বিস্ময়কর কবি-প্রতিভার সম্পর্কে কোন আলোচনা করি নাই। এই গ্রন্থে যাঁহাদের সম্পর্কে আলোচনা করি নাই, তাঁহাদের সম্পর্কে স্বতন্ত্র পুস্তকে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

পয়লা মাঘ,
১৩৬০ বঙ্গাব্দ

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য' কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশিত হইল। প্রয়োজন-বোধে ইহাতে দুইটি নূতন প্রবন্ধ সংযোজিত হইয়াছে।

বাংলা সাহিত্যে রঙ্গলাল যুগস্রষ্টা কবি না হইলেও ঐতিহাসিক আখ্যান-কাব্যের প্রবর্তক, আবার প্রতীচ্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালীর নব-জাগ্রত স্বাধীনতা-স্পৃহা তাঁহার কণ্ঠেই প্রথম ভাষা পাইয়াছে; তাই তিনি নিঃসন্দেহে নবযুগের অন্যতম প্রতিনিধি। এই জন্যই 'উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে' 'রঙ্গলাল ও ঐতিহাসিক আখ্যান কাব্য' নামে একটি নিবন্ধ সংযোজিত হইয়াছে।

বিহারীলাল মহাকাব্যের যুগে কাব্য-সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেও আধুনিক গীতি-কবিতার ক্ষীণ ধারায় (মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে' এই ধারা লক্ষ্য করা যায়) প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য আনয়ন করিয়া উহাকে ঐশ্বর্য্যশালিনী করিয়া তোলেন। সুতরাং আধুনিক গীতি-কবিতায় নূতন সুর ও ভাবকল্পনা আনয়ন করিলেও বিহারীলাল উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শুধু একটি বিচ্ছিন্ন ধারা নহেন, তাঁহার কবি-মানসের সঙ্গে মধুসূদনের কবি-মানসের একটি সূক্ষ্ম সংযোগ-সূত্র আছে। আবার মুখ্যত গীতি কবি হইলেও বিহারীলালের রচনায় একটি যুগ-প্রবৃত্তি, পরাধীনতার বেদনা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই জন্য আমরা গ্রন্থখানিতে বিহারীলাল সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট করিয়াছি।

আমার সহকর্মী অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় এই গ্রন্থের রচনা-কালে আমাকে নানা ভাবে সাহায্য ও উৎসাহ দান করিয়াছেন এবং আমার পরম প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত শিবনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় শ্রম স্বীকার করিয়া গ্রন্থখানির 'নির্দ্দেশিকা' প্রস্তুত করিয়াছেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের বন্ধুত্বের অবমাননা করিতে চাহি না।

পরিশেষে বক্তব্য এই, গ্রন্থখানির দুই এক স্থানে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি রহিয়া গিয়াছে, সহৃদয় পাঠকগণ উহা 'ক্ষমা-সুন্দর চক্ষে' দেখিলে বাধিত হইব।

বুদ্ধ পূর্ণিমা
১৩৬৫ বঙ্গাব্দ

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন

সূচীপত্র

রাজা রামমোহন ও বাংলা গদ্য-সাহিত্যের আদি পর্ব

(১৭৭৪—১৮৩৩)

(নববর্ষার আবির্ভাবে পর্বত-শৃঙ্গ হইতে যখন ধরার বুকে বারিধারা নামিয়া আসে, শীর্ণকায়া তটিনী তখন সহসা প্রাণবেগে চঞ্চল হইয়া উঠে, 'পঙ্কিল পল্বলে বন্যাজলের কল্লোল' শোনা যায়। কোনও জাতির জীবনেও এমনি ভাবে মাঝে মাঝে মহাভাবের প্লাবন আসিয়া তাহাকে এক দুর্বার দুর্দম গতিবেগ দান করে। প্রাচীন শাস্ত্রকারের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, কোন জাতির জীবনে কখনও বা তমোগুণ প্রবল হইয়া তাহাকে সুপ্তির জড়িমায় আচ্ছন্ন করে, আবার কখনও বা রজোগুণ প্রবল হইয়া তাহার প্রাণে এক অভূতপূর্ব উন্মাদনা জাগাইয়া তোলে। ষোড়শ শতাব্দীতে আমরা একদিন বাঙালী মনীষার এক অপূর্ব দীপ্তি, বাঙালী প্রতিভার এক বিস্ময়কর জাগরণ দেখিয়াছি) সেদিন 'দীধিতি'র লেখক রঘুনাথ এবং ভবানন্দ ও তাঁহার শিষ্য জগদীশ ন্যায়শাস্ত্রে কুশাগ্রীয় বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন, স্মার্ত রঘুনন্দন হিন্দু সমাজকে প্রতিকূল শক্তি হইতে রক্ষা করিবার জন্য নব্য স্মৃতি রচনা করিয়াছিলেন, তান্ত্রিক পণ্ডিত কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ পাণ্ডিত্য ও ক্রিয়াকুশলতা এবং তন্ত্রশাস্ত্রের বহুল প্রচারের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, সর্বোপরি শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিব্য জীবনকে অবলম্বন করিয়া বাঙালী নূতন চরিত-সাহিত্যের প্রবর্তন করিয়াছিল, নব্য রসশাস্ত্র ও অভিনব দর্শনের সৃষ্টি করিয়াছিল। 'রাধা-ভাব-দ্যুতি-সুবলিত' শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিব্য লীলা যাঁহারা ধ্যানে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সেই মহাজনগণ পদাবলী-সাহিত্যকে শব্দৈশ্বর্যে অধিকতর পুষ্ট ও অধিকতর ভাব-সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়া-

ছিলেন। ফলতঃ ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙালীর জীবনে যে ভাব-বন্যা দেখা দিয়াছিল, তাহার ফলে বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্য নানা ক্ষেত্রে বিপুল ঐশ্বর্যে মণ্ডিত হইয়াছিল। সে দিনের বাঙালীর চিন্তাধারা মহাপ্রভুর দিব্য জীবনের দিকে কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল, নানাদিকে বিক্ষিপ্ত হয় নাই। সুতরাং ষোড়শ শতাব্দীতে সমগ্র দেশে যে মহাভাবের প্লাবন জাগিয়াছিল, উহার বেগ প্রচণ্ড ও দুর্বার হইলেও উহা বহু ধারায় প্রবাহিত নহে।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে যে নবজাগৃতি দেখা দিয়াছিল, বাঙালীর জীবনে যে বিচিত্র ও বহুমুখী কর্ম-প্রচেষ্টা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহার গতি-প্রকৃতি স্বতন্ত্র।

বিগত শতাব্দীতে বাঙালী প্রতিভার এক বিস্ময়কর ও সর্বতোমুখী বিকাশ ঘটিয়াছিল। প্রতীচীর বিশাল জ্ঞান-ভাণ্ডার ও সাহিত্য-সম্পদ সহসা মনের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হওয়ায় বাঙালী বাহিরের বিশ্বের সঙ্গে পরিচয় লাভ করিয়া প্রাণপ্রাচুর্যে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। এই যুগে বাংলার গদ্য সাহিত্য শুধু ভূমিষ্ঠ হয় নাই, যৌবনের শ্রী ও লাবণ্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিল আর এই যুগেই বাংলার কাব্য-সাহিত্যও নব নব খাতে প্রবাহিত হইয়াছিল। প্রতীচীর ভাব-ধারাকে আত্মসাৎ করিয়া কত মনীষীই না বাংলা সাহিত্যকে নব নব সৃষ্টির ঐশ্বর্যে সম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের তাৎপর্য ও গৌরব সম্যক উপলব্ধি করিতে হইলে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, এই শতবর্ষব্যাপী কালে বাঙালী মনীষীদের মধ্যে কিভাবে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার সংঘাত উপস্থিত হইয়াছিল, কিভাবে তাঁহারা এই দুই বিরুদ্ধ সংস্কৃতির সমন্বয়-সাধনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, নবজীবনের লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাঁহারা কতটা সচেতন হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অন্তর্জীবনে কিভাবে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং তাঁহাদের রচিত

সাহিত্যে উহা কতখানি প্রতিফলিত হইয়াছিল। তাঁহাদের ধর্ম ও জাতীয়তার আদর্শ কি এবং জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী কিরূপ ছিল, উহাও আমাদিগকে প্রণিধান করিতে হইবে। তাই, এই শতকের সাহিত্য-সম্পর্কে আলোচনা করিতে হইলে আমাদিগকে নবযুগের অগ্রদূত এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক রাজা রামমোহনের কথা সবিস্তারে আলোচনা করিতে হইবে। রাজা রামমোহন অবশ্য ধর্ম-সংস্কার ও সমাজ-সংস্কারের প্রেরণার বশেই বাংলা ভাষায় গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাই তাঁহাকে শিল্পী হিসাবে বিচার করিলে আমরা ভ্রমে পতিত হইব। তাঁহার প্রথম বাংলা গ্রন্থ প্রকাশের (বেদান্ত গ্রন্থ, ১৮১৫ খ্রীঃ) কয়েক বৎসর পূর্বেই রামরাম বসু ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বাংলা গদ্যে গ্রন্থ-রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন যে বাংলা গদ্যের স্রষ্টা বা জনক নহেন, একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে, আবার চিন্তার ক্ষেত্রেও যে কোন কোন বিষয়ে রামরাম ও মৃত্যুঞ্জয় রামমোহনের অগ্রগামী, একথাও সত্য, তথাপি একথা মুক্তকণ্ঠে বলা যায় যে রামমোহনের মধ্যে এবং একমাত্র রামমোহনের মধ্যেই 'একটা যুগের বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারা সংহত হয়' এবং বাংলা গদ্যের পরিপুষ্টি-সাধন ও পরবর্তী মনীষিগণের চিন্তাধারায়ও তাঁহার প্রভাব উপেক্ষণীয় নহে।

আধুনিক যুগে রাজা রামমোহনই সর্বপ্রথম বাঙালী, যাঁহার মধ্যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও ক্ষাত্রধর্মের এক অভূতপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল। ব্রাহ্মণ রামমোহন জিজ্ঞাসু, ক্ষত্রিয় রামমোহন যুযুৎসু। ব্রাহ্মণ রামমোহন গভীর অভিনিবেশ ও শ্রদ্ধাসহকারে পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মূল ধর্মগ্রন্থসমূহ পাঠ করেন আর ক্ষত্রিয় রামমোহন সব্যসাচীর ন্যায় দেশীয় পণ্ডিতগণের ও বৈদেশিক পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিগণের সহিত বাগ্‌যুদ্ধে ও মসীযুদ্ধে রত হন। ব্রাহ্মণ রামমোহন

বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা আর ক্ষত্রিয় রামমোহন একদিকে লৌকিক হিন্দুধর্মের অচলায়তন ভঙ্গ করিতে ও অপরদিকে খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকগণের অযথা গ্লানি ও অন্যায় কটূক্তি হইতে হিন্দুধর্মকে রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর। ব্রাহ্মণ রামমোহন উপনিষদের অনুবাদ প্রচার করেন, বেদান্তসূত্রের ভাষ্য রচনা করেন, গায়ত্রীর ব্যাখ্যান প্রচার করেন, বেদান্তের অদ্বৈতবাদের সঙ্গে তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ডের সমন্বয় করেন ; নানা পুরাণ ও তন্ত্রের সহিত বেদান্তের সামঞ্জস্য আবিষ্কারের চেষ্টা করেন, আর ক্ষত্রিয় রামমোহন 'ব্রাহ্মণ-সেবধি' প্রকাশ করেন, পাদরী ও চীন দেশীয় শিষ্যত্রয়ের কথোপকথনে খ্রীষ্টীয় ত্রিত্ববাদ বা Trinitarianismকে ব্যঙ্গ করেন, 'গোস্বামীর সহিত বিচার', 'কবিতাকারের সহিত বিচার', 'কায়স্থের সহিত মদ্যপান-বিষয়ক বিচার' প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়া পরমত-খণ্ডন ও স্বমত-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। আমাদের মনে রাখিতে হইবে, ক্ষত্রিয় রামমোহনের যুযুৎসা জিগীষা বা জিঘাংসা-প্রণোদিত নহে ;—রামমোহন যে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাকে তিনি ধর্মযুদ্ধ বলিয়াই মনে করিতেন। একদিন পুণ্যক্ষেত্র ভারতক্ষেত্রে আচার্য শঙ্কর স্বধর্মরক্ষার জন্য যুযুৎসু হইয়া নানা উপধর্মের অক্ষৌহিণী সেনার বিরুদ্ধে একাকী দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। রাজা রামমোহন আচার্য শঙ্করকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহার সম্বন্ধে যখনই উল্লেখ করিতেন, তখনই ভগবান ভাষ্যকার এই পদদ্বয়ের উল্লেখ করিতেন। বর্তমান যুগে একমাত্র রামমোহনই আচার্য শঙ্করের অবলম্বিত বিচার-পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং পূর্বপক্ষ আশ্রয় করিয়া আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন এবং উত্তরপক্ষ আশ্রয় করিয়া তাহার মীমাংসা করিয়াছেন। সহমরণ-বিষয়ক পুস্তকে প্রবর্তক ও নিবর্তক উভয়েই স্বমতের সমর্থনের জন্য ভূরি ভূরি শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়াছেন।

রামমোহনের এই অসাধারণ মনীষা ও তর্কের আশ্রয়ে সত্য-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আমাদিগকে বিস্মিত করে। রামমোহনের প্রতিভা মূলতঃ সাহিত্যিক প্রতিভা নয়—দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রতিভা।

আমাদের দেশের সাধকগণ যুগে যুগে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের গম্যস্থান যে এক—এই পরম সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন,—'যে তোমায় যে ভাবে ডাকে তাতেই তুমি হও মা রাজী,' এটা যেন বাংলার সাধকেরই মর্মবাণী। কিন্তু রামমোহনই সর্বপ্রথম মনীষার দ্বারা নানা ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যোগ-সূত্র আবিষ্কার করেন। বাংলার ধর্মান্দোলনের ইতিহাসে এ এক অভিনব ঘটনা।

রামমোহন বিশ্বাস করিতেন, 'কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যবিনির্ণয়ঃ', অথচ তিনি শাস্ত্রকে কখনও উপেক্ষা করেন নাই; যাহা যথার্থ ঋষিবাক্য, তাহা যে ভ্রমপ্রমাদ-রহিত, এ বিষয়ে হয়তো তাঁহার মনে কোন প্রশ্ন জাগে নাই। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম নানা ধর্মের সারভাগ-সংগ্রহ বা eclecticism মাত্র নয়; তিনি সেমিতিক সাধনার সঙ্গে আর্য সাধনার যে অংশে সাদৃশ্য দেখিয়াছেন এবং ভারতীয় সাধনা ও সংস্কৃতির যে বৈশিষ্ট্য তাঁহার চোখে ধরা পড়িয়াছে,—সেই দিকে দেশবাসীর দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি শাস্ত্র ও যুক্তির সাহায্যে উপনিষৎ, তন্ত্র, পুরাণ প্রভৃতির মূলগত ঐক্য আবিষ্কার করিবারও চেষ্টা করিয়াছেন।

রাজা রামমোহন যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা পৃথিবীর ইতিহাসে অন্ধকারময় যুগ নহে। ফরাসী বিদ্রোহ প্রতীচ্য জাতিগণের মধ্যে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার যে উন্মাদনা জাগাইয়াছিল, তাহাতে সমগ্র বিশ্ব যেন নূতন প্রাণের স্পন্দনে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। তখন বাংলার প্রাচীন-পন্থী সাহিত্য-রসিকগণের চিত্ত-বিনোদন করিত তাৎকালিক কবি ও পাঁচালী সাহিত্য এবং বাঙ্গালীর কাব্যপ্রতিভা যে তখনও একেবারে লুপ্ত

হয় নাই, এই নব-অভ্যুদিত সাহিত্যে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে একটা প্রচণ্ড বিক্ষোভ, একটা তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছিল। তখন একদিকে বাংলার গদ্য-সাহিত্যে মৃত্যুঞ্জয়, ভবানীচরণ প্রভৃতি নানা মনীষীর আবির্ভাব ঘটিয়াছে, অপরদিকে শ্রীরামপুরের ধর্মযাজকগণ খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের চেষ্টা করিতে যাইয়াও পরোক্ষ-ভাবে বাঙালী জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আবার, একদিকে রাজা রামমোহন নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনাকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া প্রচার করিতেছেন, জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের বহু পূর্বে নারী জাতির অধিকার-প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করিতেছেন, অপর দিকে সমগ্র হিন্দুসমাজ রাজা রামমোহনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতেছে। একদিকে দ্বারকানাথ ঠাকুর রাজা রামমোহনকে তাঁহার সর্ববিধ প্রচেষ্টায় সাহায্য করিতে অগ্রসর হইতেছেন, অপর দিকে রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন (ইনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পিতামহ) প্রভৃতি রক্ষণশীল সমাজের প্রতিভূগণ রাজা রাম-মোহনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। আবার রামমোহনের জীবিতকালে বাংলা দেশে যে সমস্ত মনীষীর আবির্ভাব হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা রামমোহনের চিন্তাধারার দ্বারা বিশিষ্টরূপে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, কেহ বা সেই প্রভাব হইতে একেবারে মুক্ত ছিলেন, কেহ বা আপন মনীষার দ্বারা স্বতন্ত্র পন্থা আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

প্রতীচ্যের নবজাগরণ

আমরা 'ব্রাহ্মসমাজের কথা' নামক সাপ্তাহিক হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করিলাম :—

'রামমোহনের জন্মের অব্যবহিত পূর্বে জার্মাণী ও ইতালীয় রাষ্ট্র সংগঠিত হইয়া উঠিতেছে ; আয়ার্ল্যাণ্ডবাসী এডমণ্ড বার্কের বাগ্মিতা

ইংলণ্ডকে মুগ্ধ করিতেছে ; আমেরিকা উপনিবেশের উপর ইংলণ্ডের চূড়ান্ত কর্তৃত্বের কথা পিট অস্বীকার করিতেছেন ও মন্ত্রি-সভা-গঠনে অগ্রসর হইয়াছেন ; রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের নিমিত্ত সংবাদপত্র-পরিচালনা, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম দেখা দিয়াছে। রামমোহনের জন্মের পরে পৃথিবী এক নূতন পৃথিবী হইয়া দাঁড়াইল। এখানে মাত্র কয়েকটি বড় ঘটনার নির্দেশ করা যাইতেছে। ঠিক ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকাকে শাসন করিতে গিয়া ইংলণ্ডের সহিত আমেরিকার বিরোধের আরম্ভ, জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্ব গ্রহণ (১৭৭৫), আমেরিকা কর্তৃক যুদ্ধ ঘোষণা (১৭৭৬), ইঙ্গ-আমেরিকা যুদ্ধ, আমেরিকাকে রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকার ও সন্ধি-স্থাপন (১৭৮২), পিটের মৃত্যুর পর সমগ্র ইউরোপ ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ; দাস ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও ইহার উচ্ছেদ-সাধন (১৭৮৬), কৃষি-প্রধান দেশ হইতে ইংলণ্ডের শিল্পপ্রধান দেশে পরিণতি ; বাষ্পচালিত ইঞ্জিন (১৭৭৬) ; পঁচিশ বৎসর বয়সে পিটের (২য় পিট) মন্ত্রিসভার গঠন (১৭৮৪) ; অ্যাডাম স্মিথের 'বিভিন্ন জাতির ধনসম্পদ' প্রকাশ (১৭৭৬), ব্যাষ্টিল বিদ্রোহ (১৭৮৯), প্রুশিয়া, রুশিয়া, ও তুরস্কে পরিবর্তন ; ক্যানাডাকে স্বায়ত্ত শাসন দান (১৭৯০), ফরাসী বিপ্লব (১৭৯৩) ; ফ্রান্সের অগ্রগতি, নেপোলিয়ানের উত্থান ও পতন (১৭৯৪-১৮১৫), ইংলণ্ডের নূতন উপনিবেশ—পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, উত্তমাশা অন্তরীপ, সিংহল ইত্যাদি ; ওলন্দাজদের উপনিবেশ লাভ—জাভা, মালাক্কা ইত্যাদি ; আয়ার্ল্যাণ্ডের বিদ্রোহে উৎসাহ (১৭৯৬) ; ফ্রান্স, স্পেন ও হল্যাণ্ডের সম্মিলিত নৌবাহিনী ইংরেজদের বিরুদ্ধে শক্তিহীন (১৭৯৭) ; ফ্রান্সের মিশর-বিজয় (১৭৯৮) ; রুশিয়াতে নেপোলিয়ান (১৮০০), মিশরে ফরাসী শাসনের অবসান (১৭৯১) ; ট্র্যাফালগারে যুদ্ধ (১৮০৫), স্পেন বিদ্রোহ (১৮০৭), পর্তুগালের ভাগ (১৮১১),

জেরেমি বেন্থাম (১৮০২), নেপোলিয়ানের মস্কো-অভিযান (১৮১৪), ইঙ্গ-আমেরিকা যুদ্ধ (১৮১৪); ওয়াটার্লুর যুদ্ধে নেপোলিয়ানের পরাজয় (১৮১৫), তুরস্কের স্বাধীনতা লাভ (১৮২৭-২৯), রিকার্ডো ও ম্যালথাস, সংস্কার বিল (১৮৩২); বেলজিয়মের স্বাধীনতা-লাভ। রামমোহনের জীবন-কাল ব্যাপিয়া ইউরোপ ও আমেরিকায় যে তুমুল ঝটিকা দেখা দিয়াছিল, ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দেও তাহা শান্ত হয় নাই।' (ব্রাহ্মসমাজের কথা—রামমোহন সংখ্যা, ৬ই আশ্বিন, ১৩৪৭)।

রাজা রামমোহন ও চারিত্রনীতি

রাজা রামমোহন এদেশে বিশুদ্ধ বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্মের পুনঃ-প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হইলেও খ্রীষ্টীয় চারিত্রনীতি বা Moral codeএর প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন কেন, আমরা সে প্রশ্নের উত্তরদানে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

রাজা রামমোহনকে যে মনীষী তুলনামূলক ধর্মবিজ্ঞানের (Comparative Religion) প্রবর্তক বলিয়াছেলেন, তিনি নিতান্ত মিথ্যা কথা বলেন নাই। রামমোহনের বিরাট মনীষা, তাঁহার ক্ষুরধার যুক্তি ও পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্ম-সম্প্রদায়ের দুরবগাহ শাস্ত্রে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পরিচয় তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীতেও অতি সুস্পষ্ট। তিনি স্বীয় গ্রন্থে হিব্রু ভাষায় ও গ্রীক ভাষায় রচিত বাইবেল হইতে যেমন প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন, তেমনি মূল কোরান ও আরবী ভাষায় অনূদিত বাইবেল হইতেও ভূরি ভূরি বচন সংগ্রহ করিয়াছেন। আবার নানা উপনিষদ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতির মধ্যেও ঐক্যসূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন এই—হিন্দুশাস্ত্রে যিনি গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়া দেশবাসীর সম্মুখে প্রামাণ্য উপনিষদের প্রচারে দৃঢ়ব্রত

হইয়াছিলেন, তিনি ঈশাকথিত চারিত্র-নীতির এমন পক্ষপাতী হইলেন কেন? আমরা যথাস্থানে রামমোহনের দিক হইতে এই প্রশ্নের যে উত্তর, তাহার আলোচনা করিব।

রাজা রামমোহন New Testament এর Gospel (according to St. Matthew, St. Mark, St. Luke ও St. John) হইতে সার্বভৌমিক অংশসমূহ উদ্ধার করিয়া এক মনোরম সংগ্রহ-গ্রন্থ প্রচার করেন। এই গ্রন্থের নাম—The Precepts of Jesus the Guide to Peace and Happiness Extracted from the Books of the New Testament Ascribed to the four Evangelists.

এই গ্রন্থে তিনি বাইবেলের যে অংশে ঈশার জীবনের অলৌকিক কাহিনীসমূহ বর্ণিত হইয়াছে, সেই সকল অংশ বর্জন করেন। এই গ্রন্থ প্রচারের পর কোন খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজক তাঁহাকে heathen (অর্থাৎ খ্রীষ্টধর্মে অবিশ্বাসী) সংজ্ঞায় অভিহিত করিলে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থের নাম—An appeal to the Christian Public in defence of the precepts of Jesus (By a friend to truth).

ইহার পর খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকদের সহিত তাঁহার যে মসীযুদ্ধ চলিতে থাকে, তাহারই ফলে তাঁহার দুইখানি বৃহৎ গ্রন্থ—Second Appeal to the Christian Public এবং Final Appeal to the Christian Public প্রকাশিত হয়। এই দুইখানি গ্রন্থ ধর্মবিজ্ঞানের মুকুটমণি,—গভীর পাণ্ডিত্য ও সত্যানুসন্ধিৎসার নিদর্শন।

স্বাধীনতা ও মানবতা

রাজা রামমোহন হিন্দুশাস্ত্রের গহন অরণ্যে প্রবেশ করিয়া হিন্দুগণের চারিত্র-নীতির সার-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন নাই। তিনি যে লোকশ্রেয় ও বিচারবুদ্ধির দ্বারা পরিশোধিত ধর্মের আদর্শ প্রচার করিয়াছেন, সেই আদর্শের সন্ধান পাইয়াছেন মহাপুরুষ ঈশার বাণীতে। যে স্বাধীনতা ও বিশ্বমানবতার আদর্শকে তিনি ধর্মের আদর্শের সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া মনে করিতেন, সেই স্বাধীনতা ও মানবতার আদর্শ অতি সহজবোধ্য ভাষায় যিনি প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি রামমোহনের মস্তক স্বতঃই শ্রদ্ধায় অবনত হইয়াছিল। 'Love thy neighbour as thyself,' 'প্রতিবেশীকে আত্মবৎ প্রীতি করিবে,' 'Do unto others as you would be done by', 'তুমি অপরের নিকট যেরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা কর, অপরের প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার করিবে'—এই সকল বাণীতে দর্শনের জটিলতা নাই, খ্রীষ্টীয় সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র নাই। ঈশার এইসকল উপদেশই রামমোহনকে নীতির দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। দার্শনিক Immanuel Kantও এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া একদিন বলিয়াছিলেন—

Always treat humanity, both in thine own person, as well as in the persons of others, always as an end, never merely as a means' (Critique of Practical Reason).

রাজা রামমোহন ও লোকশ্রেয়

ঈশা বলিয়াছেন,—যদি তোমরা অপরের নিকট গৌরব লাভ করিতে চাও, সেই গৌরব প্রথমে অপরকে দান করিতে হইবে, যদি অপরের নিকট হইতে সৌজন্য ও শিষ্টাচার আশা কর, তবে

অপরের প্রতি সৌজন্য ও শিষ্টাচার প্রদর্শন করিতে হইবে, যদি অপরের নিকট প্রীতি ও ভালবাসা লাভ করিতে চাও, তবে অপরকে প্রীতি ও ভালবাসার চক্ষে দেখিতে হইবে। যদি তোমরা আশা কর যে অপরে তোমার ধর্মকে শ্রদ্ধা করুক, তবে প্রথমে তাহার ধর্মে শ্রদ্ধাবান হইতে হইবে, যদি আশা কর যে, তোমার প্রতিবেশিগণ তোমাকে আপদে বিপদে সাহায্য করুক, তবে অগ্রে তোমার প্রতিবেশিগণকে আপদে বিপদে সাহায্য করিতে হইবে। ঈশার এই বাণী—'All things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even to them,' রাজা রামমোহনকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করিয়াছিল। বাস্তবিক এই বাণীই পরিবার ও সমাজের স্থিতির মূল, সমাজ-বিজ্ঞান বা Sociology এবং পৌরবিজ্ঞান বা Civics এই নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত। Organic Theory of Society এই নীতিরই ভাষ্য-স্বরূপ। পূর্বেই বলিয়াছি, ঈশার এই বাণীতে দর্শনের জটিলতা নাই, নৈয়ায়িকের চুলচেরা বিচার নাই ;—ইহা দিবালোকের মত স্পষ্ট ও আকাশের মত উদার। এই জন্যই কাণ্ডজ্ঞান-সম্পন্ন রাজা রামমোহন ঈশার প্রবর্তিত চারিত্রনীতির এমন পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাজা রামমোহন বাস্তবিক পক্ষে ব্যবহারিক জীবনকেই সব চেয়ে বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন—দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি-সাধনের ব্রতই তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতিকে তাই তিনি ধর্মের সহিত অভিন্ন করিয়া দেখিয়াছিলেন। এই জন্যই তিনি মায়াবাদের উপর চারিত্রনীতির প্রতিষ্ঠা করেন নাই। লর্ড আমহার্ষ্টের নিকট রাজা রামমোহন প্রতীচ্য শিক্ষার সমর্থন করিয়া যে দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন,—

Nor will youths be fitted to be better members of

society by the Vedantic doctrines which teach them to believe, that all visible things have no real existence, that as father, brother, etc. have no actual entity, they consequently deserve no real affection.

এই জন্যই, যে রামমোহন বেদান্ত-প্রতিবাদ্য ধর্মের পুনঃ-প্রবর্তক তিনিই ঈশা-কথিত চারিত্রনীতি গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি জেরেমি বেন্থামের লোকশ্রেয়ের আদর্শে মুগ্ধ হইয়াছেন, আবার মহানির্বাণতন্ত্রের অনুশাসনেও এই আদর্শেরই সন্ধান পাইয়াছেন।

ধর্ম ও জীবন

রাজা রামমোহন সমাজে ও রাষ্ট্রে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন, ব্যষ্টির মুক্তি অপেক্ষা সমষ্টির কল্যাণকে বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন। ইহাই নবযুগের বাণী। যে মানুষ আপনার মুক্তির জন্য পর্বতগুহায় বা গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে, তাহার উগ্র তপস্যাকে নবযুগ তেমন মর্যাদা দেয়না, কিন্তু যিনি সমাজ বা রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য আত্মাহুতি দেন,—সর্ববিধ অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, ব্যভিচারের বিরুদ্ধে বীরের মত সংগ্রাম করেন, নবযুগ সবিস্ময় শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমে তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করে। রাজা রামমোহন যে বাংলায় এই নবযুগের অগ্রদূত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

রাজা রামমোহন বলিয়াছেন—আমি প্রচলিত ধর্মের সংস্কারকামী হইয়াছি কেন? কারণ, জনসাধারণ যাহাকে ধর্ম বলিয়া বিশ্বাস করে, উহা মানুষকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। সমাজ মানুষে মানুষে কৃত্রিম ব্যবধান রচনা করিয়াছে, নারীকে মানুষের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। আবার পরস্পর বিবদমান বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত হিন্দুগণ রাষ্ট্রীয় জীবনে পঙ্গু হইয়াছে এবং ধর্মসংস্কার ভিন্ন তাহাদের পক্ষে রাষ্ট্রীয় উন্নতিলাভ কখনও সম্ভবপর হইবে না।

'It is, I think, necessary that some change should take place in their religion, at least for the sake of their political advantage and social comfort'.—Rammohun's letter to John Digby.

এখানে বলা প্রয়োজন যে, রামমোহনের স্বাধীন মুক্ত আত্মা প্রচলিত কোন ধর্মকেই একান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করে নাই। সকল শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়াও তিনি যুক্তির আলোকে পথ চলিতে চাহিয়াছিলেন। অসাধারণ মনীষার বলে তিনি ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন করিয়াছিলেন এবং রাষ্ট্রনীতি ও সমাজ-নীতিকে ধর্মনীতির সহিত অভিন্ন করিয়া দেখিয়াছিলেন। তিনি ঈশার বাণীর মধ্যে রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি ও চারিত্রনীতির সামঞ্জস্য দেখিতে পাইয়াছিলেন। এ বিষয়ে রামমোহনের মধ্যে একটু আতিশয্য ও উগ্রতা ছিল। রামমোহন বলিতেছেন--

'Genuine Christianity is more conducive to the moral, social and political progress of a people than any other known creed'.

'মহামানবের সাগরে জয়'

রাজা রামমোহনের মনীষা যেমন অলোকসামান্য, পাণ্ডিত্য যেমন বহুমুখী, কাণ্ডজ্ঞানও তেমনি প্রচুর ছিল। যে নব্য ন্যায়ে আমরা বাঙ্গালী মনীষার চরম বিকাশ দেখিতে পাই, উহার দীপ্তি বিস্ময়কর বটে, কিন্তু উহাতে আত্মার চরম পরিতৃপ্তি নাই। অধিকন্তু, জীবন ও জগৎকে উপেক্ষা করিয়া কেবল বুদ্ধির কসরত বা ঘোড়দৌড় খেলা ব্যক্তির বা জাতির জীবনে কল্যাণপ্রসূ হয় নাই, উহাতে শুধু কাণ্ডজ্ঞানশূন্য এক দল পণ্ডিতমূর্খের সৃষ্টি হইয়াছে। রাজা রামমোহন জীবন ও জগৎকে বড় করিয়া দেখিয়াছেন; রামমোহন

বুঝিয়াছেন, মানুষের কল্যাণের জন্য, বিশ্বের হিতের জন্য এমন ধর্মের প্রয়োজন যে ধর্ম যুক্তি ও শাস্ত্রীয় প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে ; এমন চারিত্র-নীতি বা Moral Codeএর প্রয়োজন যাহা নিখিল ভুবনে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করিবে, যাহা রাষ্ট্রনীতি বা Politics, পৌরবিজ্ঞান বা Civics এবং সমাজনীতি বা Sociologyর ভিত্তিস্বরূপ হইবে। রামমোহনের এই যুক্তিবাদ তাঁহার 'তুহফাতুল্ মুওয়াহ্হিদীন' (বা একেশ্বরবাদের ফল) নামক গ্রন্থেও দেখা যায়। তিনি অভ্রান্ত শাস্ত্রে, ভ্রম-প্রমাদশূন্য মানুষে, অনন্ত স্বর্গে বা অনন্ত নরকে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। তথাপি, তিনি একথা স্বীকার করিয়াছেন যে মানুষ যেমন রাজভয়ে পাপ হইতে বিরত থাকে, তেমনি নরকের ভয়েও পাপ হইতে নিবৃত্ত হয়, সুতরাং পরকালে বিশ্বাস সমাজের স্থিতির মূল। কিন্তু কালক্রমে ধর্মের সঙ্গে কুসংস্কারসমূহ এমন অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত হইয়া পড়ে যে, যাহা পরম কল্যাণের নিদান, তাহাই পরম অকল্যাণের হেতু হইয়া দাঁড়ায়। রামমোহনের এই সিদ্ধান্ত আধুনিক ধর্মবিজ্ঞানেরও সম্পূর্ণ অনুমোদিত। রামমোহন একদিকে আচার্য শঙ্করের ক্ষুরধার যুক্তি ও অপূর্ব মনীষায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন, অপর দিকে মুসলমান নৈয়ায়িকগণের (মোতাজেলাগণের) বিচারপদ্ধতিও তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল ; একদিকে বৈজ্ঞানিকপ্রবর নিউটন ও দার্শনিক লকের (John Locke) বুদ্ধির দীপ্তি তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছিল, অপর দিকে ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী তাঁহাকে যুগধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিল, একদিকে বেন্থামের হিতবাদের আদর্শে তিনি কর্মের কৌশল আবিষ্কার করিয়াছিলেন, অপর দিকে ঈশার মানবতার বাণীতে ও সুফীগণের মানব-প্রীতির আদর্শে তিনি বিশ্বজনীন ধর্মের ভিত্তির সন্ধান পাইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি

খ্রীষ্টধর্মের মানবতার আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অতিলৌকিক তত্ত্বসকল বর্জন করিয়াছিলেন।

এ কথা সত্য যে, রাজা রামমোহনই সর্বপ্রথম বিচারের দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, পৃথিবীর নানা ধর্ম এক অখণ্ড সত্যের বিচিত্র প্রকাশ মাত্র। ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল শিকাগো সহরের Parliament of Religions সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন :—

'The ideal of humanity is not completely unfolded in any, for each race potentially contains the fulness of the ideal, but actually renders a few phases only, some expressing lower or fewer, others higher or more numerous ones. To trace the outlines of this Universal Ideal, we must collate and compare the fragmentary imperfect reflections not at all in eclectic fashion, but as we seek to discover a real species or genus among individual variations and modes ; a Congress like this fulfils a glorious mission in helping to realise the vision of Universal Humanity, a vision no less wondrous than the manifestation of the Universe-body of the Lord in the Gita to Arjuna's wondering gaze'.

বলা বাহুল্য, রামমোহনই প্রথম বাঙ্গালী যিনি এই বিশ্বমানবতার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তিনিই প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন :—

'জগৎ জুড়িয়া এক জাতি শুধু,
সে জাতির নাম মানুষ জাতি।'

এই জন্যই রাজা রামমোহন যখন শুনিয়াছিলেন, নেপলসের অধিবাসিগণ স্বাধীনতার সংগ্রামে জয়যুক্ত হন নাই, অর্থাৎ দাসত্বের

শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই, তখন তিনি বলিয়াছিলেন—

'যাহারা স্বাধীনতার শত্রু, যাহারা প্রভুত্ব-মদে গর্বিত ও স্বেচ্ছাচারী, তাহারা কখনও পরিণামে জয়যুক্ত হয় নাই, কখনও হইতেই পারে না।' রামমোহনের সেই জলদ-গম্ভীর কণ্ঠস্বর যেন এখনও আমরা শুনিতে পাইতেছি—

'Enemies to liberty and friends of despotism have never been and never will be, ultimately successful'.

নবযুগের লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদেই বাঙালী বিশ্বের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণতলে 'ধূসর প্রসর রাজপথে জনতার মাঝখানে' আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ষোড়শশতাব্দীর বাঙালী সংস্কৃতি লইয়া বাঙালী যতই গর্ব করুক, বিশ্ববাণীর সহিত বঙ্গবাণীর মৈত্রী-বন্ধন তখনও স্থাপিত হয় নাই, বিশ্বের আলো-বাতাস হইতে বঞ্চিত হইয়া বাঙালী সত্যই জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে পঙ্গু হইয়াছিল। রাজা রামমোহনই আমাদের দেশে সর্বপ্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, প্রতীচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সাদরে আতিথ্য দান না করিলে আমাদের দেশের যথার্থ কল্যাণ কোন দিন সাধিত হইবে না, আমরা কখনও মানুষ হইতে পারিব না। এই উপলক্ষ্যে তিনি লর্ড আমহার্ষ্টকে যে দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ব্যাকরণ এবং বেদান্ত, ন্যায়, মীমাংসা প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রের সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ঐ অংশ পাঠ করিলে বুঝা যায়, রামমোহনের কাণ্ডজ্ঞান কেমন প্রখর ছিল। রাজা রামমোহন বলিতেছেন—'No improvement can be expected from inducing young men to consume a dozen of years of the most valuable period of their

lives in acquiring the niceties of Vyakarana or Sanskrit Grammar, for instance, in learning to discuss such points as the following; Khada, (খাদ্ ধাতু) signifying to eat, Khadati, he or she or it eats, query; whether does Khadati taken as a whole convey the meaning he, she or it eats, or are separate parts of this meaning conveyed by distinction of the words ? As if in the English Language it were asked, how much meaning is there in the eat and how much in the S? And is the whole meaning of the word conveyed by these two portions of it distinctly or by them taken jointly ?

Neither can much improvement arise from such speculations as the following which are the themes suggested by the Vedanta :—in what manner is the soul absorbed in the Deity ? What relation does it bear to the Divine Essence ? Nor will youths be fitted to be better members of society by the Vedantic doctrines which teach them to believe, that all visible things have no real existence, that as father, brother, etc., have no actual entity, they consquently deserve no real affection and therefore, the sooner we escape from them and leave the world, the better. Again, no essential benefit can be derived by the students of the Mimansa from knowing what it is that makes a killer of a goat sinless by pronouncing certain passages of the Vedanta (?) and what is the real nature and operative influence of the passage of the Vedas etc.

The student of the Nyaya Sastra cannot be said to have improved his mind, after he has learned from it

into how many ideal classes the objects in the universe are divided and what speculative relation the soul bears to the body, the body to the soul, the eye to the ear, etc.

শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, রাজা রামমোহন বেদান্তদর্শনের পক্ষপাতী ছিলেন, শুধু বেদান্তের প্রচলিত বাখ্যার বিরুদ্ধেই তিনি আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। বেদান্তের প্রচার যে রামমোহনের জীবনের অন্যতম ব্রত ছিল আর বেদান্তকে অবলম্বন করিয়াই যে সব্যসাচী রামমোহন একদিকে সাকারবাদী তান্ত্রিক উপাসকগণ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপর ও অপর দিকে খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকগণের উপর তীক্ষ্ণ যুক্তির শরজাল বর্ষণ করিয়াছিলেন, একথা আমরা জানি। কিন্তু রামমোহনের মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞান ও কাণ্ডজ্ঞানের কী অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল, উপরি-উদ্ধৃত পত্রাংশ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। এ বিষয়ে একমাত্র প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে তাঁহার সহিত তুলনা করা যায়।

আমরা যাহাকে নবযুগ বলি, তাহার প্রধান কথা—বিশ্বের ভাবধারার সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা। এই নবযুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য—ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, জাতির স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার উদ্যম, লাঞ্ছিতের দাবী স্বীকার, কৃষক ও শ্রমিকের আন্দোলন, স্বাধীনতা ও মানবতার, স্বদেশ-প্রেম ও বিশ্বপ্রেমের সামঞ্জস্য, নারী-জাগৃতি ও আত্মপ্রতিষ্ঠায় নারীর প্রয়াস প্রভৃতি। কিন্তু বাংলায় নবযুগের সূত্রপাত আরম্ভ হইয়াছে সেই দিন, যেদিন প্রাচী ও প্রতীচীর মধ্যে ভাবের সেতুবন্ধন হইয়াছে। সুতরাং যুগদেবতার ইঙ্গিত রামমোহন যেমন সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়াছেন, এমন আর কেহই করিতে পারেন নাই। এবিষয়ে পণ্ডিত ও সাহিত্যসেবী মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বা

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় হইতে তাঁহার স্বতন্ত্রতা পরিলক্ষিত হয়। রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেন—'যে সময় ইংলণ্ডীয় মহাসভায় চ্যাথাম, বার্ক, ফক্স প্রভৃতি রাজনীতিজ্ঞ বাগ্মিগণের অগ্নিময় বক্তৃতা ন্যায় ও স্বাধীনতার পক্ষ সমর্থন করিতেছিল, যে সময়ে আমেরিকা-নিবাসিগণ পরাধীনতারূপ কঠোর নিগড় ভেদ করিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিতেছিলেন, এবং ফ্রাঙ্কলিন্, ওয়াশিংটন প্রভৃতি মহাত্মারা উক্ত মহদুদ্দেশ্য-সাধন-জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, যে সময়ে "সভ্যতার রত্নখনি" ফরাসী ভূমিতে প্রবল ঝঞ্ঝাঝটিকার পূর্বলক্ষণস্বরূপ মেঘরাশি ঘনীভূত হইতেছিল,—ভলটেয়ার ও রুশোর ঐন্দ্রজালিক লেখনী স্বাধীনতা ও সাম্যের মহিমা ঘোষণাপূর্বক জাতীয় মহাবিপ্লবের দিন নিকটতর করিতেছিল, যে সময়ে ভারতবর্ষে, ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের বুদ্ধিচাতুর্য ও প্রবল প্রতাপে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য দৃঢ়ীকৃত হইতেছিল, সেই সময়ে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।'

রাজা রামমোহনের দৃষ্টি উদার ও বিশ্বতোমুখী ছিল বলিয়াই ভগবানের বিশ্বরূপ তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। স্বদেশবাসীর শোচনীয় দুঃখ ও দুর্গতি তাঁহার হৃদয়ে পুঞ্জীভূত বেদনা ও ক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছিল বলিয়াই তিনি পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাইয়া নব-প্রবুদ্ধ প্রতীচ্য জাতিসমূহের স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার যে সংগ্রাম, তাহার গতি পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন এবং ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রের মধ্যে বিধাতার মঙ্গলময় নির্দেশ দেখিতে পাইয়াছিলেন। রামমোহন লর্ড আমহার্ষ্টকে লিখিয়াছেন—'পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডে অঙ্কশাস্ত্র, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, শারীরতত্ত্ব প্রভৃতি যে সমস্ত বিদ্যা অতি দ্রুত উন্নতি লাভ করিয়াছে, য়ুরোপীয় মনীষিগণ ভারতবাসীদিগকে সেই সকল বিদ্যায় শিক্ষাদান করিলে

এ দেশের যথার্থ মঙ্গল হইবে। যে যুগকে অন্ধকারময় যুগ বলা হয় সে যুগে সমগ্র য়ুরোপে এমন কোন মনীষী জন্মগ্রহণ করেন নাই, যিনি মানুষের চিন্তাধারাকে নূতন পথে পরিচালিত করিতে পারেন, মানুষ তখন অন্ধভাবে ধর্মশাস্ত্রকে বিশ্বাস করিয়াছে এবং ঐ বিশ্বাসের উপর কিম্ভূতকিমাকার মতবাদসমূহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। কিন্তু অবশেষে য়ুরোপের এই দীর্ঘ মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে,—ফ্রান্সিস্ বেকন্ দার্শনিক চিন্তাধারায় নবযুগের সূত্রপাত করিয়াছেন। বেকন বলিয়াছেন—সত্যকে জানিতে হইলে সংস্কার-মুক্ত মনে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার প্রয়োজন। য়ুরোপ এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সত্যের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং জ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে নানা তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছে। এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্ব যদি ভারতবাসীদিগকে শিক্ষাদানের উপযুক্ত ব্যবস্থা না হয়, তাহা হইলে মধ্যযুগের য়ুরোপবাসীদিগের যে দুর্গতি ঘটিয়াছিল, আমাদের সেই দুর্গতির কখনও অবসান হইবে না।'

রামমোহন পাশ্চাত্ত্য দর্শনশাস্ত্রে নবযুগের প্রবর্তক ফ্রান্সিস বেকনের কথা বলিয়াছেন। অবশ্য, বেকনের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ Novum Organum প্রকাশিত হইবার পূর্বেও প্রতীচ্য ভূখণ্ডে বিজ্ঞানের নানা শাখায় মনীষিগণ নূতন নূতন তথ্যের আবিষ্কার করিতেছিলেন। দার্শনিক পণ্ডিত A. W. Benn তাঁহার History of Modern Philosophy গ্রন্থে বলিয়াছেন—'Already before the middle of the sixteenth century great advance had been made in Algebra, Trigonometry, Astronomy, Mineralogy, Botany, Anatomy and Physiology. Before publication of the Novum Organum Napier had invented logarithms. Galileo was reconstituting

Physics, Gilbert had created the science of magnetism and Harvey had discovered the circulation of blood.'

কিন্তু তর্কশাস্ত্রের যে পদ্ধতির উপর বেকন পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, সেই আরোহ পদ্ধতিই তর্কশাস্ত্রের সঙ্গে নানাবিধ বিজ্ঞানের সেতুবন্ধন করিয়াছে। আবার বেকন বলিতেছেন—দর্পণ যতক্ষণ পর্যন্ত মলিন থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত যেমন কোন মূর্তি সেখানে প্রতিফলিত হয় না, তেমনি সংস্কারাচ্ছন্ন মনে কখনও সত্য প্রতিফলিত হয় না। সুতরাং, বেকন যে য়ুরোপীয় চিন্তাধারার অন্যতম যুগ-প্রবর্তক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

রাজা রামমোহন এই সত্যানুসন্ধিৎসা ও সংস্কারমুক্ত মন লইয়া নানা ধর্মশাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছিলেন—আবার কাণ্ড-জ্ঞান-সম্পন্ন অনলস কর্মীর মতই সমাজ-সংস্কারে ও জাতির স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হইয়াছিলেন এবং স্বপ্নদ্রষ্টা ও ভাবুকের মতই স্বদেশের গৌরবময় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ কবি ও সমালোচক শশাঙ্কমোহন সেন রাজা রামমোহন সম্বন্ধে বলিতেছেন—

'রামমোহন ইংরেজ, মুসলমান ও প্রাচীন হিন্দু ঋষির পরম রজঃসত্ত্ব-গুণের সমষ্টি। প্রাচীন ব্রাহ্মণের সরল বেদবেদান্ত-গামিনী বুদ্ধি এবং ঐ বুদ্ধির বিশ্বগ্রাহিণী উদারতা, ইংরেজের নির্ভীক কর্ম-তৎপরতা, মুসলমান এবং হিব্রু ঋষির অকুণ্ঠিত একেশ্বর-নিষ্ঠা, এই সমস্ত গুণসঙ্গমে রামমোহন এশিয়া এবং ইউরোপের সম্মিলিত সদ্ভাবগরিষ্ঠ বীরপুরুষ। বিশ্ব-সভ্যতার বর্তমান যুগস্রোতে টিকিয়া থাকিতে হইলে, আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, ভারতবর্ষকে যেরূপ মনুষ্য-সৃষ্টি করিতে হইবে, তাহারই সর্বাদর্শ-বীজভূত এই রাম-মোহন। পরাধীন বাঙ্গালী সর্ববিষয়ে নির্জীব নহে, বিশ্ব-

রঙ্গভূমে তাহার লীলা ফুরায় নাই, জীবন-যজ্ঞশালায় তাহার হৃদয়াগ্নি একেবারে নির্বাপিত হয় নাই; সমিধ প্রযুক্ত হইলে উহা এখনও প্রজ্বলিত হইতে পারে, ইহার প্রমাণস্বরূপ এই রামমোহন। এই প্রকৃতির চরিত্র-মধ্যেই অধঃপতিত জাতির অপরিসীম আশা ও আশ্বাস রহিয়াছে। এতদ্দেশীয় মনুষ্যত্বের ক্ষেত্র একেবারে কঙ্করময় হইয়া পড়ে নাই, রামমোহনই তাহা সর্বপ্রথম প্রমাণিত করিয়া গিয়াছেন।' [বঙ্গবাণী, পৃঃ ৪৪—৪৫]

রামমোহন ও ভারতবর্ষের ইতিহাস

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদেই আমরা রাজা রামমোহনের মধ্যে নবযুগের দুইটি বিশিষ্ট ধর্মের অভিব্যক্তি দেখিতে পাই—জাতির স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা এবং প্রাচী ও প্রতীচীর মিলনের স্বপ্ন। আমরা দেখিতে পাই, রাজা রামমোহন একদিকে যেমন গভীর অভিনিবেশের সহিত সমসাময়িক ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করিতেছেন, অপরদিকে তেমনি কঠোর শ্রম-সহকারে ভারতের অতীত ইতিহাস আলোচনা করিতেছেন। রাজা রামমোহনের মনেই সর্বপ্রথম একটি জটিল অথচ গুরুতর প্রশ্ন জাগিয়াছে এবং তিনি যথাশক্তি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রশ্নটি এই—ভারতবর্ষ পরাধীন কেন? রাজা রামমোহন দেখিয়াছেন—ভারতবর্ষ পরস্পর বিবদমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছে, সুতরাং অখণ্ড ভারত-সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিবার অবসর পায় নাই। (অবশ্য ধর্মাশোক এই অখণ্ড ভারত-সাম্রাজ্যের পরিকল্পনাকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছিলেন)। রাজা রামমোহন দেখিয়াছেন—ভারতভূমিতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন, অসংহত নানা সম্প্রদায় আত্মঘাতী আত্মকলহে রত হইয়াছে, এই মহাভারতে কেবলই কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের অভিনয় হইয়াছে। হিন্দু-সমাজ

মানুষে-মানুষে যে ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছে, উহা কালক্রমে রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে তাহাদিগকে আনিয়া দিয়াছে পরাধীনতার গ্লানি। ব্রাহ্মণ্যশক্তির পতনে ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, ব্রাহ্মণদিগকে জীবিকার্জনের জন্য ক্ষত্রিয় নরপতির অধীনতা স্বীকার করিতে হইয়াছে, ক্ষাত্রশক্তি ব্রাহ্মণ্যশক্তির সহায়তায় প্রজাশোষণের জন্য বা প্রজাকুলের উপর আপনাদিগের অখণ্ড আধিপত্য স্থাপনের জন্য মনুষ্যত্বের অবমাননাকারী বিধিসমূহ প্রণয়ন করাইয়াছে। এই পাপের ফলে হিন্দুর স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়াছে, ভারতবর্ষ পরাধীন ও বৈদেশিক-শক্তির পদানত হইয়াছে। রাজা রামমোহন বলিতেছেন—

'In consequence of the multiplied divisions and subdivisions of the land into separate and independent kingdoms, under the authority of numerous princes hostile towards each other, owing to the successive introduction of a vast number of castes and sects, destroying every texture of social and political unity—the country was at different periods invaded and brought under temporary subjection to foreign princes, celebrated for power and ambition.'

রাজা রামমোহন ভারতের মুসলমান রাজত্ব-সম্পর্কে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায়, খাঁটি ঐতিহাসিকের দৃষ্টি তাঁহার ছিল; বৈদেশিক ঐতিহাসিকের ন্যায় তিনি স্বজাতির প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখান নাই বা সত্যের অপলাপ করেন নাই। আবার, ইংরেজ-রাজত্বের মধ্যে তিনি ভারতের নব অভ্যুদয়ের সূচনা দেখিতে পাইয়াছেন।

মনীষী গিরিজাশঙ্কর বাবু তাঁহার 'স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলায় উনবিংশ শতাব্দী' নামক গ্রন্থে রাজা রামমোহন ও স্বামী

বিবেকানন্দের ভারত-ইতিহাস আলোচনার ধারা-সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করিয়ছেন এবং স্বামী বিবেকানন্দের "বর্ত্তমান ভারত" হইতে বহু উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। অথচ ভারতবর্ষের পরাধীনতার কারণ-সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র যে নিপুণ বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহে আমাদের প্রণিধানযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'ভারত-কলঙ্ক' নামক প্রবন্ধটিকে দুই অংশে ভাগ করিয়াছেন—(১) ভারতবর্ষ পরাধীন কেন? (২) ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা।

ভারতবর্ষের পরাধীনতার কারণ সম্পর্কে রামমোহন ও বঙ্কিম-চন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, তাহার তুলনামূলক আলোচনা করা চলে।

রামমোহন ও বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীন হিন্দুগণের বাহুবল এবং রণনৈপুণ্যের সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক নজীর উদ্ধার করিয়াছেন, প্রাচীন হিন্দুগণের বলবীর্য যে গ্রীক ঐতিহাসিকগণেরও বিস্ময়ের বস্তু হইয়াছে, সে কথারও উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু শৌর্য, বীর্য এক জিনিস, আর স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা ও জাতি-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা অন্য জিনিস। বঙ্কিম চন্দ্রের মতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-লোপের প্রথম কারণ— "ভারতবর্ষীয়েরা স্বভাবতঃই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা-রহিত। গ্রীকেরা স্বাধীনতাপ্রিয়, হিন্দুরা স্বাধীনতাপ্রিয় নহে, শান্তিসুখের অভিলাষী; ইহা কেবল জাতিগত স্বভাব-বৈচিত্র্যের ফল, বিস্ময়ের বিষয় নহে।" দ্বিতীয় কারণ—"হিন্দু সমাজের অনৈক্য, সমাজমধ্যে জাতিপ্রতিষ্ঠার অভাব, জাতিহিতৈষিতার অভাব অথবা অন্য যাহাই বলুন।" ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—

"এই ভারতবর্ষে নানা জাতি। বাসস্থানের প্রভেদে, ভাষার

প্রভেদে, বংশের প্রভেদে, ধর্ম্মের প্রভেদে নানা জাতি। বাঙালী, পাঞ্জাবী, তৈলঙ্গী, মহারাষ্ট্রী, রাজপুত, জাঠ, হিন্দু, মুসলমান ইহার মধ্যে কে কাহার সঙ্গে একতাযুক্ত হইবে? ধর্মগত ঐক্য থাকিলে বংশগত ঐক্য নাই, বংশগত ঐক্য থাকিলে ভাষাগত ঐক্য নাই, ভাষাগত ঐক্য থাকিলে নিবাসগত ঐক্য নাই।

ইতিহাসকীর্তিত কালমধ্যে কেবল দুইবার হিন্দু সমাজ মধ্যে জাতি-প্রতিষ্ঠার উদয় হইয়াছিল। একবার মহারাষ্ট্রে শিবাজী এই মহামন্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন, তাঁহার সিংহনাদে মহারাষ্ট্র জাগরিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয়বারের ঐন্দ্রজালিক রণজিৎ সিংহ, ইন্দ্রজাল খালসা। যদি কদাচিৎ কোন প্রদেশখণ্ডে জাতি-প্রতিষ্ঠার উদয়ে এতদূর ঘটিয়াছিল, তবে সমুদায় ভারত একজাতীয় বন্ধনে বদ্ধ হইলে কি না হইতে পারে?"

উপসংহারে বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন—"ভারতবর্ষে বর্তমান যুগে যে স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এবং জাতি-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা দেখা যাইতেছে, উহা ইংরেজ শাসনের ফল, সুতরাং ইংরেজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী।"

রাজা রামোহন ও বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবর্ষের পরাধীনতার কারণ সম্বন্ধে যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, উহাদের সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে।

"ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা" নামক প্রবন্ধে বঙ্কিম-চন্দ্র বলিতেছেন—আধুনিক ভারতে যেমন "দেশী বিলাতীতে বৈষম্য" ভারতে তেমনি ব্রাহ্মণ ও শূদ্রে বৈষম্য ছিল। আমরা যে রাম-রাজত্বের স্বপ্ন দেখি, উহাতে সকল প্রজা শুধু নিরবচ্ছিন্ন সুখ ভোগ করিত, একথা সত্য নহে। কোন কোন বিষয়ে প্রাচীন ভারতের বর্ণ-বৈষম্য আধুনিক যুগের "দেশী বিলাতীতে বৈষম্যের" চেয়েও

মারাত্মক—কিন্তু সকল বিষয়ে নহে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে "আধুনিক অপেক্ষা প্রাচীন ভারতবর্ষে উচ্চ শ্রেণীর লোকের স্বাধীনতাজনিত কিছু সুখ ছিল। আধুনিক ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অর্থাৎ উচ্চ শ্রেণীস্থ লোকের অবনতি ঘটিয়াছে, শূদ্র অর্থাৎ সাধারণ প্রজার একটু উন্নতি ঘটিয়াছে।" রাজা রামমোহন ব্রাহ্মণ সমাজের অবনতি এবং ক্ষত্রিয়গণের আনুগত্য স্বীকারকে ভারতের পরাধীনতার অন্যতম কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। রাজা রামামোহন বলেন—স্বেচ্ছাচারী রাজন্যবর্গ ব্রাহ্মণের দ্বারা আপনাদিগের স্বার্থের অনুকূল বিধিসমূহ প্রণয়ন করাইতেন এবং প্রজাপীড়ন করিতেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণদিগের অখণ্ড প্রভুত্ব কখনও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন—

"ক্ষত্রিয়দিগের প্রাধান্য, প্রাচীন ভারতে চিরকাল অপ্রতিহত ছিল না, ব্রাহ্মণদিগের গৌরব একদিনের জন্যও লঘু হয় নাই। বেদদ্বেষী বৌদ্ধদিগের সময়েও রাজকার্য ব্রাহ্মণদিগের হস্ত হইতে অন্য হাতে যায় নাই—কেননা, তাঁহারাই পণ্ডিত, সুশিক্ষিত এবং কার্যক্ষম। অতএব প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণেরাই প্রকৃতরূপে রাজপুরুষপদবাচ্য।" কিন্তু এই রাজপুরুষগণ যে দণ্ডনীতি প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা সাম্য বা অপক্ষপাত বিচার-বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন—

"ব্রাহ্মণরাজ্যে শূদ্রহন্তা ব্রাহ্মণের এবং ব্রাহ্মণহন্তা শূদ্রের দণ্ডের কত বৈষম্য! সুতরাং স্বাধীনতা যে প্রাচীন ভারতে প্রজা-সাধারণের পক্ষে সর্বাংশে কল্যাণপ্রসূ হয় নাই, একথা স্বীকার্য। আবার পরাধীনতাও তেমনি আধুনিক ভারতের পক্ষে সর্বাংশে অকল্যাণপ্রসূ হয় নাই।" তবে বঙ্কিমচন্দ্র পরাধীনতার একটি দোষের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এই,—আমাদের রাজ্যরক্ষা ও রাজ্যপালন-বিদ্যা শিক্ষা হইতেছে না—জাতীয় গুণের স্ফূর্তি হইতেছে না।"

মিলনের স্বপ্ন ও রামমোহন

রাজা রামমোহনই সর্বপ্রথম মানবজাতির অখণ্ড ঐক্য অনুভব করিয়াছিলেন, মানবীয় সভ্যতার বিভিন্ন প্রকাশ যে একই ব্রহ্মের বিচিত্র লীলা-বিলাস, এই পরম সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই তিনি প্রাচী ও প্রতীচীর মধ্যে সেতুবন্ধ-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। উত্তরকালে কেশবচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ এই মহান্ ব্রতেই আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং দাম্ভিক ইংরেজ কবির সগর্ব উক্তি—"The East is East and the West is West and the twain shall never meet" অনেকাংশে ব্যর্থ করিয়াছিলেন। বিশ্বের বরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথও এই মিলনের স্বপ্নই দেখিয়াছিলেন—তিনি সেই অনাগত দিনের জয়গান করিয়াছেন, যেদিন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার মিলনে পৃথিবীর এক বৃহত্তর ও মহত্তর সভ্যতা গড়িয়া উঠিবে। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

'পৃথিবীর সকল দেশের লোককে দুই মোটা ভাগে বিভক্ত করে' বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্রের কোঠায় ফেলা যায়। বশিষ্ঠ বাস করেন, আর বিশ্বামিত্র ব্যাপ্ত হন। বশিষ্ঠ ধেনু পালন করেন আর বিশ্বামিত্র ধেনু হরণ করেন। বশিষ্ঠ রামচন্দ্রের কানে মন্ত্র দেন, আর বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রের হস্তে অস্ত্র দেন। বশিষ্ঠ ঐশ্বর্যশালী গৃহের পুরোহিত, আর বিশ্বামিত্র দুর্গম বনপথের নেতা।

'বর্তমান যুগে ভারতবর্ষ· ···বশিষ্ঠের মন্ত্রে দীক্ষিত; আর য়ুরোপ বিশ্বামিত্রের আহ্বানে চঞ্চল। এই দুই ঋষি কি কোনদিন প্রেমে মিলবে না? আর যদি না মিলতে পারেন, তা হলে পৃথিবীতে কি কোন কালে বিরোধের অবসান হবে? যদি এমন আশা কর যে দুইয়ের মধ্যে এক ঋষি যেদিন মারা যাবেন সেই

দিনই পৃথিবীতে শান্তি দেখা দিবে, তবে সে আশা সফল হবে না, কেননা জগতে বশিষ্ঠও অমর বিশ্বামিত্রও অমর। আমার বিশ্বাস একদিন এই দুই ঋষিই এক যজ্ঞের ভার নেবেন, মন্ত্র এবং অস্ত্র, অমৃত এবং উপকরণ একত্রে মিলিত হবে, সেই যজ্ঞের অগ্নিশিখা আর নিববে না। এশিয়া এবং য়ুরোপ যদি কোন দিন সত্যে মিলতে পারে, তা হলেই মানুষের সাধনা সিদ্ধ হবে—নইলে রক্তবৃষ্টিতে মানুষের তপস্যা বারংবার কলুষিত হতে থাকবে'।

[বিলাত-যাত্রীর পত্র, ২৪শে মে, ১৯২০]

রামমোহন ও বাংলার নারী

ফরাসী বিপ্লবের অগ্রদূতগণ যে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার মন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন, সেই মন্ত্রে দীক্ষিত রামমোহন ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদেই নবজাগ্রত প্রতীচ্য ভূখণ্ডের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন এবং স্বদেশবাসিগণের দুর্গতি মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছিলেন। দার্শনিকপ্রবর ইম্যানুয়্যাল ক্যাণ্ট (Immanuel Kant) প্রচার করিয়াছিলেন—মানুষের আত্মা আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল, সুতরাং মানুষের আত্মাকে মর্যাদা দান করিবে। যখন মানুষ মানুষকে আপন উদ্দেশ্য-সিদ্ধির বা স্বার্থ-সিদ্ধির যন্ত্ররূপে পরিণত করে, তখন সে মানুষের আত্মাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে, তাহার স্বাধীন ব্যক্তি-সত্তাকে অস্বীকার করে। এইজন্য তিনি জলদগম্ভীর স্বরে প্রচার করিয়াছেন—

"কখনও স্বীয় আত্মার মহিমাকে ক্ষুণ্ণ হইতে দিবে না এবং মানুষ মাত্রেরই স্বাধীন ব্যক্তি-সত্তাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দান করিবে। রোমান্টিক যুগে ইংলণ্ডে যে সমস্ত কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই এই স্বাধীনতা ও মানবতার ধর্মে উদ্বুদ্ধ

হইয়াছিলেন। উত্তর কালে প্রতীচ্য জগতে যে সমস্ত দার্শনিক চিন্তাধারার জন্ম হইয়াছিল, তাহাদের প্রধান কথা—Humanism বা মানবতা। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আগষ্ট কোম্‌তে, জন ষ্টুয়ার্ট মিল, হার্বার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি যে সমস্ত দার্শনিকের * প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তাঁহারা দুর্জ্জেয় অতীন্দ্রিয় তত্ত্বসমূহের আলোচনায় কালক্ষেপ করেন নাই; তাঁহাদের আলোচনার কেন্দ্রস্থান—মানুষ। এইজন্য সে যুগকে Age of Humanism বলা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ পাদের আর একটি প্রধান কথা—নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকৃতি দান। সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ইবসেন তাঁহার Doll's House এ নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন, গৃহে পুরুষ যে পদে পদে নারীর ব্যক্তিত্বকে ক্ষুণ্ণ ও তাহার মনুষ্যত্বকে পদদলিত করে, 'নোরা'র বিদায়-বাণীতে সেই কথাই প্রচার করিয়াছেন। জন ষ্টুয়ার্ট মিল সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর অধিকার-লোপ এবং গৃহে নারীর পরাধীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছেন।

রাজা রামমোহন ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদেই তাঁহার 'সহমরণ-বিষয়' নামক পুস্তকে নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করিয়াছেন, পুরুষের নৃশংসতা ও হৃদয়-হীনতা, অন্তঃপুরে নারী-নির্যাতন, সমাজে ও রাষ্ট্রে নারীর অধিকার-লোপ প্রভৃতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন, এক কথায়, বাংলার নারীজাতির দরদী বন্ধুরূপে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন। রামমোহন নারীজাতির বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন, শাস্ত্রালোচনায় ও ব্রহ্মজ্ঞানে যে নারীরও অধিকার আছে, একথা তিনি সুস্পষ্ট

* আগষ্ট কোম্‌তে (১৭৯৮—১৮৫৭), জন ষ্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬—১৮৭৩), হার্বার্ট স্পেন্সার (১৮২০—১৯০৩)।

ভাষায় প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন :—স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন্ কালে লইয়াছেন যে অনায়াসেই তাহাদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যাশিক্ষা এবং জ্ঞানশিক্ষা দিলে পরে, ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়; আপনারা বিদ্যাশিক্ষা, জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাঁহারা বুদ্ধিহীন হয়, ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন? বরঞ্চ লীলাবতী, কর্ণাট রাজার পত্নী প্রভৃতি যাহাকে যাহাকে বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছিলেন, তাহারা সর্বশাস্ত্রে পারগরূপে বিখ্যাত আছে; বিশেষত বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্যক্তই প্রমাণ আছে, অত্যন্ত দূরূহ ব্রহ্মজ্ঞান তাহা যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছেন, মৈত্রেয়ীও তাহার গ্রহণ পূর্বক কৃতার্থ হয়েন।

রামমোহন শুধু সতীদাহ-প্রথার বিলোপ সাধন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, নানা বিষয়ে (যেমন পৈতৃক সম্পত্তিতে) নারীর অধিকার স্থাপনের জন্যও চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সকল বিষয়ে রাজা রামমোহন যুগের কতখানি অগ্রগামী ছিলেন, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

রামমোহন ও বাংলা সাহিত্য

রাজা রামমোহনের ভাষায় শিল্পিজনোচিত নৈপুণ্য না থাকিলেও বৈজ্ঞানিকজনোচিত বাক্‌সংযম আছে, চিন্তাধারার সুস্পষ্টতা আছে, পণ্ডিতজন-সুলভ প্রৌঢ়ি ও বহুশ্রুতত্ব আছে, সর্বোপরি উচ্ছ্বাসবর্জিত বিশুদ্ধ যুক্তির অবতারণা আছে। পরবর্তী বাংলা গদ্য সাহিত্যে রামমোহনের প্রভাব তেমন সুস্পষ্ট না হইলেও রামমোহন যে শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা তৎকালীন অপর কোন বাঙালীর পক্ষে দুর্লভ হইয়াছে। মৃত্যুঞ্জয় ও বিদ্যাসাগর উভয়েই শিল্পী; রামমোহন

দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক। রামমোহনের চিন্তাধারা দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার এবং উত্তরকালে স্বামী বিবেকানন্দকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। রামমোহনের রচনায় বিশেষত্ব কি? চিন্তাধারার সুস্পষ্টতা, অনাবশ্যক শব্দের বর্জন, উচ্ছ্বাসরাহিত্য, সুনির্বাচিত অর্থভূয়িষ্ঠ শব্দের প্রয়োগ। রামমোহন শব্দচয়ন-বিষয়ে অতিমাত্রায় সতর্ক, তাঁহার দৃষ্টি ললিত পদবিন্যাসের দিকে নয়, বিশিষ্ট বাণী-ভঙ্গিমায় তাঁহার প্রতিভার পরিচয় নয়, তাঁহার মনীষার পরিচয় পাওয়া যায় শব্দচয়ন-ব্যাপারে মাত্রাবোধের মধ্যে। মনে করুন, হার্বার্ট স্পেন্সার যখন অভিব্যক্তির সংজ্ঞা দিতেছেন—'Evolution is an integration of matter and concomitant dissipation of motion in which matter passes from an indefinite incoherent homogeneity to a definite coherent heterogeneity and during which the retained motion undergoes a parallel transformation'—তখন বৈজ্ঞানিকের অতি-সতর্ক পদ-প্রয়োগ-কৌশল আমাদের চোখে পড়ে। অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি প্রভৃতি দোষ পরিহার করিবার জন্যই বৈজ্ঞানিক সর্বদা অতি-সতর্ক পদক্ষেপ করেন। বাংলা সাহিত্যে রাজা রামমোহনের রচনায় এই বাক্‌সংযমের পরিচয় যেমন পাওয়া যায়, এমন আর কাহারও রচনায় পাওয়া যায় না।

এবার আমরা রামমোহনের 'ব্রহ্মোপাসনা-বিধি' হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করির।

শিষ্যের প্রশ্ন। কাহাকে উপাসনা কহেন?

আচার্যের প্রত্যুত্তর। তুষ্টির উদ্দেশ্যে যত্নকে উপাসনা কহা যায়, কিন্তু পরব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞানের আবৃত্তিকে উপাসনা কহি।

প্রশ্ন। কে উপাস্য?

উত্তর। অনন্ত প্রকার বস্তু ও ব্যক্তি-সম্বলিত অচিন্তনীয়

রচনাবিশিষ্ট যে এই জগৎ ঘটিকাযন্ত্র অপেক্ষাও অতিশয় আশ্চর্যান্বিত রাশিচক্রে বেগে ধাবমান চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদিযুক্ত যে এই জগৎ এবং নানাবিধ স্থাবর-জঙ্গম শরীর যাহার কোন এক অঙ্গ নিষ্প্রয়োজন নহে, সেই সকল শরীর ও শরীরীতে পরিপূর্ণ যে এই জগৎ, ইহার কারণ ও নির্বাহকর্ত্তা যিনি, তিনি উপাস্য হন।

প্রশ্ন। তিনি কি প্রকার ?

উত্তর। তোমাকে পূর্বেই কহিয়াছি যে, যিনি এই জগতের কারণ ও নির্বাহকর্ত্তা তিনিই উপাস্য হন ; ইহার অতিরিক্ত তাঁহার নির্ধারণ করিতে কি শ্রুতি কি যুক্তি সমর্থ হয় না।

প্রশ্ন। কোন্ উপায়ে তাঁহার স্বরূপের নির্ণয় করা হয় ?

উত্তর। তাঁহার স্বরূপ কি মনেতে কি বাক্যেতে নিরূপণ করা যায় না, ইহা শ্রুতিতে স্মৃতিতে বারংবার কহিয়াছেন। এবং যুক্তি-সিদ্ধও ইহা হয়, যেহেতু এই জগৎ প্রত্যক্ষ অথচ ইহার স্বরূপ কেহ নির্ধারণ করিতে পারে না, সুতরাং এই জগতের কারণ ও নির্বাহকর্ত্তা যিনি লক্ষিত হইতেছেন তাঁহার স্বরূপ ও পরিমাণের নির্ধারণ কি প্রকারে সম্ভব হইবে ?

প্রশ্ন। বিচারত এই উপাসনার বিরোধী কেহ আছে কিনা ?

উত্তর। এ উপাসনার বিরোধী বিচারত কেহ নাই, যেহেতু, আমরা 'জগতের কারণ ও নির্বাহকর্তা' এই উপলক্ষ্য করিয়া উপাসনা করি ; অতএব এরূপ উপাসনায় বিরোধ সম্ভব হয় না ; কেননা প্রত্যেক দেবতার উপাসকেরা সেই সেই দেবতাকে জগৎ-কারণ ও জগতের নির্বাহকর্তা এই বিশ্বাসপূর্বক উপাসনা করেন, সুতরাং তাঁহাদের বিশ্বাসানুসারে আমাদের এই উপাসনাকে তাঁহারা সেই সেই দেবতার উপাসনারূপে অবশ্যই স্বীকার করিবেন। এই প্রকারে যাঁহারা কাল কিংবা স্বভাব অথবা বুদ্ধ কিংবা অন্য কোন পদার্থকে জগতের নির্বাহকর্ত্তা কহিয়া থাকেন, তাঁরাও বিচারত এ

উপাসনার, অর্থাৎ জগতের নির্বাহকর্তারূপে চিন্তনের, বিরোধী হইতে পারিবেন না। চীন ও তিব্বত ও ইউরোপ ও অন্য দেশে যে সকল নানাবিধ উপাসকেরা আছেন তাঁহারাও আপন আপন উপাস্যকে জগতের কারণ ও নির্বাহক কহেন, সুতরাং তাঁহারাও আপন আপন বিশ্বাস অনুসারে আমাদের এই উপাসনাকে সেই সেই আপন উপাস্যের আরাধনারূপে অবশ্যই স্বীকার করিবেন।'

রাজা রামমোহন বৈষ্ণব-প্রেমগাথা-মুখরিত ও তান্ত্রিক সাধনার পীঠ-স্থান এই বাংলা দেশে ব্রহ্মসংগীতেব প্রথম প্রবর্তন করিয়াছেন, গদ্য-প্রবন্ধে রানমোহন যাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, ব্রহ্মসংগীত তাহারই সুরতাল-সংযোজিত রূপ। একটি প্রসিদ্ধ ব্রহ্মসংগীত উদ্ধৃত করিতেছি।

'ভাব সেই একে।
জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে।
সে রচিল এ সংসার আদি অন্ত নাহি যার
সে জানে সকল, কেহ নাহি জানে তাকে।'

কেরী, রামরাম, মৃত্যুঞ্জয় ও রামমোহন

বাংলা গদ্য-সাহিত্যে রামমোহনের স্থান নির্দেশ করিতে হইলে আমাদিগকে সর্বপ্রথম এ কথাটি স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তিনি বাংলা গদ্যের প্রবর্তক না হইয়াও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন।

উনিশ শতকের প্রথম পাদে বাংলা গদ্যের বিপুল সম্ভাবনাকে যিনি সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তিনি বিদেশী পণ্ডিত উইলিয়াম কেরী। হ্যালহেডের অনুসরণে কেরী ইংরেজি ভাষায় যে বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন, উহাতে তিনি বলিয়াছেন—লালিত্যে ও প্রকাশ-ক্ষমতায় বাংলা প্রাচ্য ভাষা-সমূহের মধ্যে অন্যতম

শ্রেষ্ঠ ভাষা। (One of the most expressive and elegant languages of the East). বাংলাভাষার মধ্যে, বিশেষত, বাংলা ভাষার প্রাকৃত শব্দসমূহের মধ্যে যে বিপুল সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে, কেরী তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই 'কথোপকথন' নামক গ্রন্থ সঙ্কলন করাইয়াছিলেন। পুস্তকখানি ইংরেজি অনুবাদ সহ ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। কেরীর আর একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারতের প্রথম মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশ (১৮০২ খ্রীষ্টাব্দ)। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস 'উইলিয়ম কেরী' নামক পুস্তিকায় (সাহিত্যসাধক-চরিতমালা, ১৫) কেরীর রচিত বা সম্পাদিত 'ইতিহাসমালা' নামে একখানি পুস্তকেরও উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত, 'বাংলা-ইংরেজী অভিধান' রচনায় কেরী যে বিপুল পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। কেরী অবশ্য অন্ধকারাচ্ছন্ন (?) 'প্যাগানদের' ভিতর খ্রীষ্টধর্মের আলোকচ্ছটা বিকিরণ করিবার পবিত্র উদ্দেশ্য লইয়াই এ দেশে আগমন করিয়াছিলেন এবং সে উদ্দেশ্য তিনি কদাচ বিস্মৃত হন নাই ; রামরাম বসুর সহায়তায় তিনি সমগ্র বাইবেল-গ্রন্থ বাংলা ভাষায় খণ্ডে খণ্ডে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং সংস্কৃত ভাষায়ও খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্র অনুবাদ করিয়াছিলেন। তথাপি, উনিশ শতকের প্রথম পাদে কেরী বাংলা গদ্যের ভিত্তিস্থাপনের জন্য যে বিপুল পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা আমরা চিরদিন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করিব।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগণ যে বাংলা গদ্যে পাঠ্য পুস্তক-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহারও মূলে ছিল বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ কেরী সাহেবের ঐকান্তিক প্রেরণা। তাঁহারই উৎসাহে রামরাম বসু ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রতাপাদিত্য-চরিত্র' রচনা করেন। রামরামই সর্বপ্রথম বাঙালী যিনি বাংলা গদ্যে মৌলিক

গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই দিক দিয়া প্রতাপাদিত্য-চরিত্রের যথেষ্ট সাহিত্যিক মূল্য আছে। গ্রন্থখানির ঐতিহাসিক মূল্যও স্বল্প নহে। পরবর্তী বৎসর অর্থাৎ ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে রামরাম বসুর 'লিপিমালা' প্রকাশিত হয়। বাংলা গদ্যের এই গোড়া-পত্তনের যুগে গদ্য রচনার কোন আদর্শ আবিষ্কৃত হয় নাই, গদ্য-সাহিত্য তখন সদ্যোজাত শিশুর মত ক্ষীণাঙ্গ, অপরিণত, সে তখনও হাঁটিতে শিখে নাই, আছাড় খাইয়া খাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছে মাত্র; তথাপি এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে রামরামের 'লিপিমালা' প্রতাপাদিত্য-চরিত্রের মত পারস্য শব্দের দ্বারা অযথা ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে নাই। রামরাম বসু অবশ্য পদ্য-রচনায় (অনুবাদ ও মৌলিক রচনায়) দক্ষতা দেখাইয়ছিলেন, কিন্তু খ্রীষ্টের জীবন বা খ্রীষ্টধর্ম তাঁহার কবিতার বিষয়-বস্তু হওয়াতে সেগুলি এদেশে তেমন সমাদর লাভ করিতে পারে নাই।

কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগণের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারই সর্বোপেক্ষা স্মরণীয় ব্যক্তি। তাঁহার মধ্যে পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল এবং তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যে শিল্পনৈপুণ্যের অবতারণা করিয়াছিলেন। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হইয়াও তিনি চলতি ভাষার শক্তিসম্পর্কে উদাসীন ছিলেন না। তিনি যদি বাংলা গদ্যের অন্তর্নিহিত সুষমা আবিষ্কার না করিতেন, ইহাতে কলা-নৈপুণ্যের সঞ্চার না করিতেন এবং গদ্য-রচনার নানাবিধ রীতির প্রবর্তন না করিতেন, তাহা হইলে বিদ্যাসাগরের হস্তে বাংলা গদ্য এত সহজে একটা সুপরিণত, সুষীম রূপ লাভ করিতে পারিত কিনা, সন্দেহ। এইখানেই মৃত্যুঞ্জয়ের প্রধান কৃতিত্ব ও গৌরব। রামমোহনের প্রথম গদ্য-রচনা প্রকাশিত হয় ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই বাংলা গদ্য-রচনায় মনোনিবেশ করেন। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার 'বত্রিশ

সিংহাসন' এবং ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে 'হিতোপদেশ' ও 'রাজাবলি' প্রকাশিত হয়। রামমোহনের পূর্বে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের আরও কয়েকজন পণ্ডিত বাংলা গদ্যে পাঠ্যপুস্তক রচনায় প্রবৃত্ত হন। গোলোকনাথ শর্মার 'হিতোপদেশ' ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে, চণ্ডীচরণ মুন্সীর 'তোতা ইতিহাস' ও রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে ও রামকিশোর তর্কচূড়ামণির 'হিতোপদেশ' ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে আত্মপ্রকাশ করে। সুতরাং, রামমোহন যখন বাংলা গদ্যে গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত হন, তখন বাংলা গদ্য নিতান্ত নবজাতক নহে, উহার অঙ্গে কিঞ্চিৎ লাবণ্যেরও সঞ্চার হইয়াছে।

আমরা বলিয়াছি, রাজা রামমোহন বাংলা গদ্যের স্রষ্টা নহেন কিন্তু বাংলার গদ্যসাহিত্যে তিনি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। রাজা রামমোহন সম্পর্কে সর্বপ্রথম এ কথাটি স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তিনি ধর্ম-সংস্কার ও সমাজ-সংস্কারের মহান আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়াই গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অন্যান্য পণ্ডিতগণের (তারিণীচরণ মিত্র, চণ্ডীচরণ মুন্সী, গোলোক-নাথ শর্ম্মা, হরপ্রসাদ রায়, মোহনপ্রসাদ ঠাকুর ও কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন) সাহিত্যকৃতি প্রধানতঃ পাঠ্যপুস্তক-রচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, সুতরাং ইঁহাদের কেহই গ্রন্থ-রচনাকে উপলক্ষ্য করিয়া দেশবাসীর চিত্তকে প্রবুদ্ধ করিতে অথবা সমগ্র দেশময় একটা তুমুল আন্দোলন ও বিক্ষোভ সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। সে যুগে একমাত্র রাজা রামমোহন ভিন্ন আর কোন মনীষীর মধ্যেই একটা সমগ্র যুগের চিন্তাধারা এমন সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয় নাই। এই দিক দিয়া রাজা রামমোহন আমাদের দেশে অনন্য-সাধারণ। যে গৌরব রাজা রামমোহনের প্রাপ্য নয়, আমরা সেই

গৌরব তাঁহাকে অর্পণ করিয়া সত্যের অপলাপ করিব না, কিন্তু এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, এ যুগে আমরা অনেকের ভিতর রাজা রামমোহনের মহিমাকে ক্ষুণ্ণ করিবার একটা অপচেষ্টা লক্ষ্য করিয়াছি। কেহ কেহ বলিয়াছেন—রামমোহনের চিন্তাধারায় তেমন কোন মৌলিকতার নিদর্শন নাই। কারণ, রামমোহনের পূর্বেই রামরাম বসু হিন্দুগণের প্রতিমাপূজা বা প্রতীকোপাসনার (তথাকথিত পৌত্তলিকতার) বিরুদ্ধে গ্রন্থ রচনা করেন আর মৃত্যুঞ্জয় সংস্কৃত ভাষায় লিখিত একটি ব্যবস্থা-পত্রে সহমরণের অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করেন। কিন্তু এ কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, রামরাম বসুর চিন্তাধারা খ্রীষ্টীয় মিশনারিগণের চিন্তাধারার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল আর রামমোহন খ্রীষ্টীয় মিশনারিগণের কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতা প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহাদের সঙ্গেও মসীযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং পৌত্তলিকতা-সম্পর্কে রামরাম ও রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ এক নহে, রামমোহন নিম্নাধিকারীর জন্য প্রতিমা-পূজার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন নাই, এ বিষয়ে রামমোহনের দৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে না হউক অন্ততঃ আংশিকভাবে ভারতীয়, তাঁহার চিন্তাধারা প্রথমে ইসলাম-ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হইলেও পরবর্তীকালে তিনি সেই প্রভাব হইতে অনেকটা মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু রামরাম খ্রীষ্টীয় মিশনারিগণের প্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া হিন্দুদিগের তথাকথিত পৌত্তলিকতার (প্রতীকোপাসনার) বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। আবার, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার সহমরণের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিলেও রামমোহনের মত উদার ও বিশ্বতো-মুখ দৃষ্টি তাঁহার ছিল না। পাঠ্যপুস্তক-রচনা ভিন্ন মৃত্যুঞ্জয় রাম-মোহনের মত-খণ্ডনের জন্য 'বেদান্ত-চন্দ্রিকা' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। রামমোহন তাঁহার 'বেদান্তগ্রন্থে' দেখাইয়াছেন,

বেদান্ত ভারতীয় দর্শনের মুকুট-মণি এবং ব্রহ্মই একমাত্র উপাস্য। মৃত্যুঞ্জয়ের বক্তব্য এই, গৃহস্থের ব্রহ্মোপাসনার অধিকার নাই আর নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনাও সম্ভবপর নহে, অতএব প্রতিমা-পূজাই সংসারী মানুষের পক্ষে একমাত্র পন্থা। গ্রন্থমধ্যে মৃত্যুঞ্জয় রামমোহনের উদ্দেশ্যে যথেষ্ট কটূক্তি বর্ষণ করিয়াছেন। এ বিষয়ে রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গি কত উদার ছিল পরবর্তী কাল তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। উত্তর কালে স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তের বাণী পাশ্চাত্ত্য দেশে বহন করিয়াছেন এবং ব্যবহারিক বা লৌকিক জগতেও যে বেদান্তের প্রয়োগ সম্ভবপর, তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী রামমোহন ও স্বামী বিবেকানন্দের রচনা-হইতে প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, রামমোহন চিন্তার ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের অগ্রগামী ছিলেন। সুতরাং রামমোহনের রচনায় শিল্পিজনোচিত নৈপুণ্য না থাকুক, তিনি আমাদের দেশে দার্শনিক রচনার পথ-প্রদর্শক; এই সব রচনার মধ্য দিয়াই তিনি একদিকে বাংলা ভাষাকে শব্দৈশ্বর্যে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং অপর দিকে তাঁহার দেশবাসীর যুগ-সঞ্চিত সংস্কারে আঘাত করিয়া তাঁহাদের চিন্তা-শক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই দিক দিয়া রামমোহনের কৃতিত্বের সঙ্গে সম-সাময়িক আর কাহারও কৃতিত্বের তুলনা হইতে পারে না। যুক্তি-মূলক, সারগর্ভ অথচ স্বল্পাক্ষরে গ্রথিত, ভাব-সম্পদে ভূয়িষ্ঠ অথচ উচ্ছ্বাস-বর্জিত রচনাবলী বাংলা সাহিত্যে রামমোহনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

দ্বিতীয়তঃ, রামমোহন বাক্য-মধ্যে পদ-সমূহের দূরান্বয়-দোষ অনেকটা পরিহার করিয়াছিলেন। বেদান্ত-গ্রন্থে তিনি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বুঝাইয়াছেন, কি ভাবে বাক্য-মধ্যস্থ পদসমূহের অন্বয় করিলে বাক্যের অর্থবোধ সহজ হইবে। রামমোহনের রচনায়

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য লাঞ্ছিত মানবতার প্রতি বেদনা-বোধ। এই বৈশিষ্ট্য তাঁহার 'সহমরণ-বিষয়ে' বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়।

শাস্ত্রবচনের সঙ্গে যে যুক্তির সমন্বয় করা চলে, রামমোহন তাঁহার সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্ত্তকের সংবাদে' তাহা দেখাইয়াছেন। কিন্তু লাঞ্ছিত নারীজাতির প্রতি যে সহানুভূতি গ্রন্থখানির ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট, উহাই আজও আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে। হৃদয়ের এই ঔদার্য, লাঞ্ছিত মানবতার প্রতি এই সমবেদনা সে যুগের আর কোন লেখকের মধ্যে দেখা যায় না। এই দিক দিয়া বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'সহমরণ বিষয়ের' একটি স্বতন্ত্র মূল্য আছে। গিরিজাশঙ্কর বাবু দেখাইয়াছেন, সমাজ-সংস্কার-বিষয়ে বিদ্যাসাগর রামমোহমের অনুগামী, অর্থাৎ, তিনিও রামমোহনের মত শাস্ত্র ও যুক্তির সমন্বয়ের প্রয়াস পাইয়াছেন।

রামমোহনের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে সম-সাময়িক লেখক-দের তুলনায় তিনি অনেকটা সংযম ও শালীনতার পরিচয় দিয়াছেন। অবশ্য এ কথা সত্য নহে যে রামমোহন কখনও প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করেন নাই অথবা কাহারও প্রতি ব্যঙ্গোক্তি প্রয়োগ করেন নাই। তথাপি, একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে তাঁহার সুরুচি-বোধ সমসাময়িকদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল।

রামমোহন তাঁহার রচনাবলীর মধ্য দিয়াই নবযুগের ভিত্তি-স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি নানা বিরুদ্ধ মতের ভিতর সমন্বয়-স্থাপনের প্রয়াস পাইলেও ভারতীয় সাধনার অখণ্ড রূপটি ধ্যানে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন নাই। যিনি উপনিষৎ, বেদান্ত, গীতা, তন্ত্রশাস্ত্র এবং মধ্যযুগীয় সাধক-গণের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সমন্বয়-স্থাপন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতি, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রতি, এমন কি, স্বয়ং মহাপ্রভুর প্রতি সুবিচার করিতে পারেন নাই। তথাপি, রামমোহনের বিরাট মনীষা ও বিপুল

দানের কথা স্মরণ করিলে বিস্ময়ে অভিভূত না হইয়া থাকা যায় না। রামমোহনের দৃষ্টি শুধু বাংলাদেশে নয়, শুধু ভারতবর্ষে নয়, নিখিল বিশ্বে প্রসারিত ছিল, তাই নবযুগের প্রবর্ত্তক রামমোহন চিরদিন আমাদের নমস্য।

ধর্ম ও রাজনীতি

রাজা রামমোহন শুধু বেদান্ত-প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মের উপাসনাই প্রতিষ্ঠিত করেন নাই, তিনি সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। রাজা রামমোহন বলিয়াছেন—'ধর্ম যদি ঈশ্বরের, রাজনীতি কি তবে শয়তানের?' রাজা বিশ্বাস করিতেন, ইংরেজের সাহচর্য ও প্রতীচ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনায় বাঙ্গালীর তথা ভারতবাসীর সর্ববিধ কল্যাণ সাধিত হইবে। তথাপি, অনাগত কালে এমন এক শুভদিন উপস্থিত হইবে, যেদিন ভারতবর্ষে কানাডার মত ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে। যদি জাতির ভাগ্যে কখনও এমন দিন উপস্থিত হয় যে, ভারতের সহিত ব্রিটিশের সকল রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যায়, তথাপি বন্ধুত্বের সম্পর্ক কদাপি ছিন্ন হইবে না। আর প্রাচ্য ভূখণ্ড একদিন সমগ্র জগতের ধর্মগুরু হইবে এবং এ বিষয়ে তখন প্রতীচ্যকে প্রাচ্যের ঋণ স্বীকার করিতে হইবে।

রাজা রামমোহন বাংলা ও ফারসী ভাষায় সংবাদপত্র পরিচালনা করেন (ব্রাহ্মণ-সেবধি, সংবাদ কৌমুদী ও মীরাত উল আখবর), মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাসম্পর্কে আন্দোলন করেন, ইংরেজ ও ভারত-বাসীর পারস্পরিক সহযোগিতায় যে আমাদের দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে, তৎসম্বন্ধে টাউন হলে বক্তৃতা করেন।

রাজা রামমোহনের বিষয়-বুদ্ধি ও কাণ্ডজ্ঞান এমন প্রখর ছিল যে, ধর্মতত্ত্বের আলোচনা করিতে গিয়াও তিনি জাতির সামাজিক ও

রাজনৈতিক কল্যাণ-চিন্তাকে একেবারে বিসর্জন দিতে পারেন নাই। আবার ফরাসী বিপ্লবের মূল মন্ত্র সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শে দীক্ষিত রামমোহন পৃথিবীর নানা জাতির স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে আন্তরিক সহানুভূতির চক্ষে দেখিয়াছিলেন। শ্রদ্ধেয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন—'তিনি (রামমোহন) রাজনৈতিক ব্যাপারে উদার এবং আন্তর্জাতিক মনোভাবসম্পন্ন ছিলেন।' (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—১৬, পৃষ্ঠা ৬০)। 'রামমোহন ফ্রান্সভ্রমণের ছাড়পত্র চাহিয়া যে পত্রখানি রচনা করেন, তাহার একটি নকল বিলাতে ইণ্ডিয়া আপিসে আছে। ইহাতে দেশ ও জাতিনির্বিশেষে মানবের ঐক্যের বাণী পরিস্ফুট হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, সেকালেও যে রামমোহনের মনে একটি জাতিসঙ্ঘ-গঠনের পরিকল্পনা জাগিয়াছিল, তাহাও স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।' (ঐ, পৃঃ ৬৪)। রামমোহনের মধ্যেই যে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার প্রথম সমন্বয় ঘটিয়াছিল এবং নব-যুগের মর্মবাণী প্রথম ধ্বনিত হইয়াছিল, সে সম্পর্কে ব্রজেনবাবু বলিয়াছেন ঃ—

"পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান, রীতিনীতি ও চিন্তাধারার সহিত ভারতীয় জ্ঞান, রীতিনীতি ও চিন্তাধারার সমন্বয়ের পথ-নির্দেশ রামমোহনের প্রধান কীর্তি। তিনি চিন্তায় ও কর্মে সার্বভৌমিক ছিলেন, জাতীয় সঙ্কীর্ণতা পছন্দ করিতেন না। তবুও তিনি জাতীয় ধর্ম ও আচার বর্জন করিবার বিপক্ষে ছিলেন। তিনি মনে করিতেন, এক জাতির আচার-ব্যবহার অন্য জাতির মধ্যে জোর করিয়া প্রবর্তন করা সম্ভব নহে, উচিতও নহে ; সুতরাং সংস্কারের প্রয়োজন হইলেও প্রত্যেক জাতিরই উহা জাতীয়ভাবে করা উচিত। সেজন্য একেশ্বরবাদও তিনি উপনিষদ ও বেদান্তের সাহায্যেই প্রচার করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। বিদেশী শাস্ত্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইলেও উহাদিগকে সর্বতোভাবে গ্রহণ করেন নাই। রামমোহনের পর যে

সকল মহাপুরুষ ভারতবর্ষের সামাজিক-জীবনে, সাহিত্যে বা শিল্পকলায় নূতন ধারার প্রবর্তন করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই তাঁহার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। এই জন্যই রামমোহন রায় ভারতবর্ষে বর্তমান যুগের প্রবর্তক। বস্তুতঃ নানা ক্ষেত্রেই তিনি প্রথম পথ দেখাইয়াছিলেন।" (ঐ পৃঃ ৬৯-৭০)।

যুগাচার্য বিবেকানন্দ একদিন ভগিনী নিবেদিতার নিকট রামমোহনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহাও আমাদের প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছিলেন—আচার্য রামমোহনের জীবনের তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ—বেদান্ত-চর্চার সূত্রপাত, দ্বিতীয়—স্বদেশপ্রেম, তৃতীয়—যে প্রেম হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদজ্ঞান লুপ্ত করিয়া দেয়, সেই উদার ভালবাসা। রাজা রামমোহনের দূরদৃষ্টি ও হৃদয়ের ঔদার্য যে কার্যের সূত্রপাত করিয়াছিল, আমি সেই কার্যকেই জীবনের ব্রত করিয়াছি। ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার Notes on some wanderings with the Swami Vivekananda নামক গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

'It was here (Nainital) too that we heard a talk on Rammohan Roy in which he (Vivekananda) pointed out three things as the dominant notes of this teacher's message, his acceptance of the Vedanta, his preaching of patriotism and the love that embraced the Mussalman along with the Hindu. In all these three things, he (Vivekananda) claimed himself to have taken the task that the breadth and foresight of Rammohan Roy had mapped out.'

বাস্তবিক, যুগ-প্রবর্ত্তক রাজা রামমোহনের মধ্যেই সর্বপ্রথম স্বদেশ-প্রীতি ও মানব-প্রেমের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল। তাঁহার দৃষ্টি শুধু বিশ্বতোমুখী ছিল না, সুদূর-প্রসারিণীও ছিল। আর এই কারণেই তিনি ছিলেন নবযুগের স্রষ্টাও অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি।

গ্রন্থপঞ্জী অর্থাৎ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের তালিকা

(১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত)

গ্রন্থ	গ্রন্থকার	খ্রীষ্টাব্দ
কথোপকথন	উইলিয়াম কেরী	১৮০১
রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র	রামরাম বসু	১৮০১
লিপিমালা	ঐ	১৮০২
বত্রিশ সিংহাসন	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	১৮০২
হিতোপদেশ	গোলোকনাথ শর্মা	১৮০২
তোতা ইতিহাস	চণ্ডীচরণ মুন্সী	১৮০৫
মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং	রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়	১৮০৫
রাজাবলি	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	১৮০৮
হিতোপদেশ	রামকিশোর তর্কচূড়ামণি	১৮০৮
ইতিহাস-মালা	উইলিয়াম কেরী	১৮১২
পুরুষ-পরীক্ষা	হরপ্রসাদ রায়	১৮১৫
বেদান্ত-গ্রন্থ	রামমোহন রায়	১৮১৫
বেদান্তসার	ঐ	১৮১৫
ঈশোপনিষৎ	ঐ	১৮১৬
তলবকার উপনিষৎ	ঐ	১৮১৬
বেদান্তচন্দ্রিকা	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	১৮১৭
ভট্টাচার্যের সহিত বিচার	রামমোহন রায়	১৮১৭

গ্রন্থ	গ্রন্থকার	খ্রীষ্টাব্দ
কঠোপনিষৎ	রামমোহন রায়	১৮১৭
মাণ্ডুক্যোপনিষৎ	ঐ	১৮১৭
গোস্বামীর সহিত বিচার	ঐ	১৮১৮
সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সংবাদ	ঐ	১৮১৮
গায়ত্রীর অর্থ	ঐ	১৮১৮
মুণ্ডকোপনিষৎ	ঐ	১৮১৯
সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ	ঐ	১৮১৯
কবিতাকারের সহিত বিচার	ঐ	১৮২০
সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার	ঐ	১৮২০
ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ	ঐ	১৮২৬
কলিকাতা কমলালয়	ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮২৩
হিতোপদেশ	ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮২৩
নববাবুবিলাস	ঐ	১৮২৫
দূতীবিলাস	ঐ	১৮২৫
ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ	রামমোহন রায়	১৮২৬
ব্রহ্মোপাসনা	ঐ	১৮২৮
গৌড়ীয় ব্যাকরণ	ঐ	১৮৩৩

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও বাংলা কাব্যের যুগসন্ধি

(১৮১২—১৮৫৯)

কালজয়ী প্রতিভার অধিকারী না হইলেও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাংলার কাব্যসাহিত্যে একক, সেখানে তাঁহার সমগোত্রীয় কেহ নাই। বাংলার কাব্য-সাহিত্যে যিনি ছিলেন একদিন অপ্রতিদ্বন্দ্বী, মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যে তাঁহার কবি-যশ প্রায় লুপ্ত হইয়াছিল, শ্রীমধুসূদন একটি সনেট বা চতুর্দ্দশপদী কবিতায় সে কথা ক্ষোভের সঙ্গে প্রকাশ করিয়াছেন। গুপ্ত কবির পরলোক-গমনের সাত বৎসর পরে তিনি লিখিয়াছেন—

> 'আছিলে রাখাল-রাজ কাব্য-ব্রজধামে
> জীবে তুমি, নানা খেলা খেলিলা হরষে ;
> যমুনা হয়েছ পার ; তেঁই গোপগ্রামে
> সবে কি ভুলিল তোমা ? স্মরণ-নিকষে
> মন্দ স্বর্ণ-রেখা-সম এবে তব নামে
> নাহি কি হে জ্যোতিঃ ভাল স্বর্ণের পরশে ?'

অথচ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যে দীর্ঘকাল তাঁহার দেশবাসীদের চিত্তে অম্লান হইয়া বিরাজ করেন নাই, ইহাও নিতান্ত অহেতুক নহে। প্রথমতঃ, ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় সে যুগের শিক্ষিত বাঙ্গালীর নব-জাগ্রত আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তি লাভ করে নাই এবং ঈশ্বরচন্দ্রের রুচিও তাঁহাদের মনকে সময়ে সময়ে পীড়া দিয়াছে ; দ্বিতীয়তঃ, ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর কিছু কাল পূর্বে রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' নামক আখ্যান-কাব্য প্রকাশিত হইলে (১৮৫৮) বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায় এমন একখানি কাব্যের সন্ধান পাইয়াছেন যাহার মধ্যে তাঁহাদের সম্মিলিত আশা-আকাঙ্ক্ষা ভাষা পাইয়াছে, তারপর, মেঘনাদ-বধ ও বীরাঙ্গনা কাব্যে মধুসূদন যুগপৎ যে ভেরী-নিনাদ ও

বংশী-ধ্বনি করিয়াছেন, তাহাতে বঙ্গসাহিত্য-দ্বেষী ও প্রতীচ্য সাহিত্যে অনুরাগী পাঠক-সমাজও স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়াছেন, যদিও মধুপ্রতিভার বিরাটত্ব ও অনন্যসাধারণত্ব সম্পর্কে ইঁহাদের অনেকেরই তেমন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবশ্য ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পরও কিছুদিন তাঁহার প্রভাব অক্ষুন্ন ছিল, অন্যান্য লেখকদের কথা ছাড়িয়া দিলেও রঙ্গলালের আখ্যান-কাব্যে ও দীনবন্ধুর রচনায় সে প্রভাব সুস্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করা যায়। তবে একথাও সত্য যে, যাঁহারা কাব্যে প্রাচীন রীতির পক্ষপাতী ছিলেন ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন না, তাঁহারাও দীর্ঘকাল ঈশ্বরচন্দ্রের রচনা হইতে রস আহরণ করিতে পারেন নাই। ইহার প্রথম কারণ,—যে কল্পনাবিলাস, শিল্প-নৈপুণ্য এবং জীবন ও জগৎ সম্পর্কে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী হইলে কোন কবি বা লেখক আমাদের হৃদয়ে অক্ষয় হইয়া বিরাজ করিতে পারেন, ঈশ্বর গুপ্তের তাহা ছিল না। ঈশ্বর গুপ্তের গদ্য-রচনা তো অনুপ্রাস-যমকাদি অলঙ্কারের ভারে ভারাক্রান্ত হওয়ায় প্রায় অপাঠ্যই হইয়াছে কিন্তু তাঁহার কবিতাও যে স্থানে স্থানে অলঙ্কারের অযথা-প্রয়োগের জন্য কৃত্রিমতা-দোষে দুষ্ট হয় নাই, এ কথা বলা চলে না। অবশ্য, যিনি প্রথম জীবনে কবি ও হাফ আখড়াইয়ের দলে গান বাঁধিয়া দিয়াছেন এবং দাশরথি রায় প্রভৃতি পাঁচালিকারদের রচনার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে অলঙ্কার-প্রয়োগের দিকে অতিমাত্রায় ঝোঁক থাকাই স্বাভাবিক, সে যুগের রুচিও অবশ্য এজন্য অনেকটা দায়ী, তথাপি, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় অলঙ্কার-প্রয়োগ সর্বত্র রসের পরিপুষ্টি সাধন করে নাই। দ্বিতীয়তঃ, ঈশ্বর গুপ্ত তাঁহার রচনায় যে বাস্তব রসের সৃষ্টি করিয়াছেন, প্রয়োজনের বস্তু হইতেও প্রয়োজনের অতীত যে কাব্যরস আহরণ করিয়াছেন, উহা সহজে

আস্বাদনযোগ্য বলিয়াই দীর্ঘকাল উপভোগ্য হয় নাই। তাই, ঈশ্বর গুপ্তের এই ধরণের রচনা সহজেই পুরাতন হইয়া গিয়াছে। তৃতীয়তঃ, ঈশ্বরচন্দ্র বহু সংখ্যক পরিমার্থিক ও ভক্তিরসাত্মক কবিতা রচনা করিলেও এবং স্থানে স্থানে দেহের অনিত্যতা ও বৈরাগ্যের মহিমার কথা আমাদের স্মরণ করাইয়া দিলেও সাধকের গভীর অন্তর্দৃষ্টি বা ভক্ত-হৃদয়ের ব্যাকুলতা ও কাতর আকুতি তাঁহার রচনায় আত্মপ্রকাশ করে নাই। 'মনের মানুষ' প্রভৃতি দুই একটি কবিতায় যে বাউল গানের প্রভাব দেখা যায়, তাহাতেও কবির অতীন্দ্রিয় অনুভূতির কোন পরিচয় মিলে না। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন,—ঈশ্বর গুপ্তের ঈশ্বরের প্রতি পিতৃ-ভাব ও রামপ্রসাদের জগজ্জননীর প্রতি মাতৃভাবে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্যকে তাঁহার সাহিত্য-গুরুর উদ্দেশ্যে অতিপ্রশস্তি হিসাবেই গ্রহণ করা চলে।

তথাপি, কয়েকটি কারণে ঈশ্বর গুপ্ত বাংলা সাহিত্যে একক। তাই তিনি চিরকাল আমাদের স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। ঈশ্বর গুপ্তই সর্বপ্রথম বাংলার কাব্যক্ষেত্রে বিষয়-বস্তুর বৈচিত্র্য সম্পাদন করেন, তাঁহার রচনায়ই মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা প্রথম উপযুক্ত মর্যাদা লাভ করে, বিভিন্ন সাময়িক পত্রকে উপলক্ষ্য করিয়া তিনি প্রথম সাহিত্যিক-সৃষ্টির ব্রত গ্রহণ করেন এবং তাঁহার 'প্রভাকর'কে কেন্দ্র করিয়াই এক সময়ে বালক বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু ও স্বল্পজীবী দ্বারকানাথ কবিতাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন ও আত্মশক্তি সম্পর্কে সচেতন হইয়া ওঠেন, আবার তিনিই সর্বপ্রথম সম-সাময়িক যুদ্ধাদি অবলম্বন করিয়া কবিতা রচনা করেন। (এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই সমস্ত কবিতায় ঈশ্বর গুপ্ত শুধু ব্রিটিশ শক্তির মহিমাই কীর্তন করেন নাই, ইংরেজের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার আন্দোলনকেই তীব্র ভাষায় ব্যঙ্গ করিয়াছেন, এবং ঝান্সীর রাণীর ন্যায় বীরাঙ্গনাও

তাঁহার জঘন্য আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হইয়াছেন।) তাঁহার কবিতায়ই জাতীয় চেতনার প্রথম স্ফুরণ ঘটে, তিনিই প্রথম বাঙ্গালীর প্রাণের কথা বাঙ্গালীর প্রাণের ভাষায় ব্যক্ত করেন অথচ তাঁহার রচনায়ই সর্বপ্রথম শুধু ইংরেজী শব্দ নহে, পাশ্চাত্ত্য ভাবধারাও স্বচ্ছন্দে প্রবেশ লাভ করে; (ইহা প্রধানতঃ তত্ত্ববোধিনী সভা', 'নীতি-তরঙ্গিণী সভা' প্রভৃতির সহিত সংশ্রবের ফল) আবার তাঁহার রচনায়ই সর্বপ্রথম বাংলার কাব্য-সাহিত্যের সহিত পল্লীর জন-সাধারণের যোগ-বন্ধন প্রায় ছিন্ন হয়, এবং ইহার ফলে কবিতা-সরস্বতী সত্য সত্যই নগর-বাসিনী হইয়া উঠেন, নূতন ধরণের ব্যঙ্গ-রচনারও তিনিই পথ প্রদর্শন করেন (অবশ্য একথাও সত্য যে, এই সব রচনার মধ্য দিয়া তিনি ক্ষীয়মান রক্ষণশীল সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন, তাই এই সব রচনার সাহিত্যিক মূল্যের চেয়ে ঐতিহাসিক মূল্য অল্প নহে) এবং সর্বোপরি তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যের মূল্যবান উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ভবিষ্যদ্বংশীয়দের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হন। (তাঁহার সম্পাদিত 'কালী-কীর্তন' ও তাঁহার রচিত 'কবিবর ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন-বৃত্তান্ত' প্রভৃতি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।)

মোট কথা, ঈশ্বর গুপ্তের ভিতরেও একটা দ্বৈত সত্তা ছিল। তিনি চাহিয়াছিলেন, বাঙ্গালী ইংরেজের অনুকরণ-মোহ ত্যাগ করিয়া খাঁটি বাঙ্গালীর মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হউক, বাংলার মেয়ে বিবিয়ানার মুখে লাথি মারুক কিন্তু 'উড়ুক ব্রিটিশ ধ্বজা সমুদয় স্থলে', আদি ব্রাহ্ম-সমাজ তাঁহার চিন্তাকে প্রভাবিত করিয়াছিল অথচ কবিওয়ালা-সুলভ রুচি তিনি ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাঁহার 'নিগুর্ণ ঈশ্বর' কবিতাটির ভাষায় কবিওয়ালাদের প্রভাব ও চিন্তা-ধারায় আদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাব নিরপেক্ষ সমালোচকগণ সহজেই লক্ষ্য করিবেন। যেটুকু অভিমানের সুর কবিতাটির মধ্যে ধ্বনিত হইতেছে, তাহাও হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করে না। আবার

তাঁহার মধ্যে যেটুকু জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটিয়াছে, তাহা বাঙ্গালীত্বের প্রতি একটা অন্ধ মোহ বা মমত্ব-বোধ মাত্র হইলে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু তাঁহার সংকীর্ণ স্বদেশ-প্রীতি সময়ে সময়ে উৎকট বিদ্বেষের আকারে প্রকট হইয়াছে, তাই 'দেশের কুকুর ধরি বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া' প্রভৃতি উক্তির মধ্যে ঈশ্বর গুপ্তের সমগ্র সত্তার পরিচয় মিলেনা। এই জন্যই বর্তমান যুগে গুপ্ত কবির রচনাবলীর নূতন করিয়া মূল্য-নির্দ্ধারণের (re-valuation) প্রয়োজন হইয়াছে। গুপ্ত কবির রচনাবলীর সম্পর্কে আমাদের দেশের প্রাক্তন সমালোচকগণ যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা অনেক স্থলে আংশিক সত্য, সুতরাং বিভ্রান্তিকর (misleading)। মনে হয়, ইঁহারা অনেকেই গুপ্ত কবির সমগ্র রচনাবলী ধীর ভাবে পর্যালোচনা করিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার প্রয়াস পান নাই, ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্ব-সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র যাহা লিখিয়াছেন, তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের লোকোত্তর প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা-বোধ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই বলিব, ঈশ্বর গুপ্ত সম্পর্কে তাঁহার উক্তি নির্বিচারে গ্রহণ-যোগ্য নহে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার গুরুর সম্পর্কে অনেক সত্য কথা বলিয়াছেন, কিছু সত্য গোপন করিয়াছেন, কিছু অর্ধ-সত্য উক্তিও করিয়াছেন, সুতরাং ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা-সংগ্রহ উপলক্ষ্যে লিখিত প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচনার নিদর্শন হইলেও ইহাতে গুপ্ত কবির সম্যক পরিচয় মিলেনা।

গুপ্ত কবির সমালোচনা-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র যে কয়েকটি কথা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য।

(ক) "ঈশ্বর গুপ্ত খাঁটি বাঙ্গালী কবি। আর যেই কেলাকা ফুল বলুক, ঈশ্বর গুপ্ত মোচা বলেন—মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ—শিক্ষিত বাঙ্গালীর কবি, ঈশ্বর গুপ্ত বাংলার কবি।

এই দেশী জিনিষগুলি (ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা) মার প্রসাদ। এই খাঁটি বাংলাটি, এই খাঁটি দেশী কথাগুলি মার প্রসাদ।”

(খ) “ঈশ্বর গুপ্ত Realist এবং ঈশ্বর গুপ্ত Satirist. ইহা তাঁহার সাম্রাজ্য, এবং ইহাতে তিনি বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয়। ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গে কিছুমাত্র বিদ্বেষ নাই।* মেকির উপর রাগ আছে বটে, তা ছাড়া সবটাই রঙ্গ, সবটা আনন্দ, কেবল ঘোর ইয়ারকি। পুনশ্চ—অনেক স্থানে তাঁহার রুচি বাস্তবিক কদর্য, যথার্থ অশ্লীল এবং বিরক্তিকর।”

(গ) ঈশ্বর গুপ্তের পরমার্থ-বিষয়ক কবিতা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, ‘তিনি ঈশ্বরকে নিকটে দেখিতেন, যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেন, যেন মুখামুখি হইয়া কথা কহিতেন।* বাংলার দুইজন সাধক আমাদের বড় নিকট।* এক রামপ্রসাদ সেন, আর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।* রামপ্রসাদ ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ মাতৃভাবে দেখিয়া ভক্তি সাধিত করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র পিতৃভাবে। রামপ্রসাদের মাতৃপ্রেমে আর ঈশ্বরচন্দ্রের পিতৃপ্রেমে ভেদ বড় অল্প।

(ঘ) “অশ্লীলতা তাঁহার কবিতার এক প্রধান দোষ। যে কারণে তাঁহার অশ্লীলতা, সেই কারণে যমকানুপ্রাসে অনুরাগ—দেশ, কাল, পাত্র।”

উপসংহারে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, “ঈশ্বরচন্দ্র আপন সময়ের অগ্রগামী ছিলেন।” এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার দেশ-বাৎসল্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং ধর্মে ও রাজনীতিতে তাঁহার উদার দৃষ্টি-ভঙ্গির কথা বলিয়াছেন।

ঈশ্বর গুপ্তকে খাঁটি বাঙ্গালী কবি বলিয়া গ্রহণ করিবার পূর্বে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে—খাঁটি বাঙ্গালী কবি বলিতে আমরা কি বুঝি? যদি আমরা বলি, (ঈশ্বর গুপ্ত খাঁটি বাঙ্গালী কবি, কেননা, তাঁহার রচনা বৈদেশিক সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত

হয় নাই, তবে কথাটি মানিয়া লইতে কাহারও বিশেষ আপত্তি নাই। যদি আমরা বলি, ঈশ্বর গুপ্ত খাঁটি বাঙ্গালী কবি, কেননা, তিনি বাঙ্গালীর প্রাণের কথা বাঙ্গালীর প্রাণের ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, তবে বলিব, ঈশ্বর গুপ্তের কোন কোন কবিতা সম্পর্কে একথা সত্য। কিন্তু যদি আমরা বলি যে, ঈশ্বর গুপ্ত খাঁটি বাঙ্গালী কবি, কেননা, তাঁহার রচনায় বৈদেশিক শব্দ বা বিজাতীয় চিন্তা-ধারার কোন সন্ধান মিলে না, তবে কবির সঙ্গে সম্যকরূপে পরিচিত কোন পাঠকই কথাটি মানিয়া লইবেন না। কবির রচনায় কয়েকটি ইংরেজী শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া এ যুগের একজন সমালোচক বলিয়াছেন, 'ঈশ্বর গুপ্ত খাঁটি বাঙ্গালী কবি, একথা আংশিকভাবে সত্য।' কিন্তু ইংরেজী শব্দের যথাযথ বা বিকৃত প্রয়োগ করিলেই কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যায় না, আসল কথা এই যে, পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা কবির কোন কোন রচনায় তাঁহার অজ্ঞাতসারে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ঈশ্বর গুপ্তের 'নিগুর্ণ ঈশ্বর' কবিতাটির উল্লেখ করিতে পারি। আমাদের বাংলা দেশের কেহ বা কান্তভাবে কেহ বা মাতৃভাবে ঈশ্বরের ভজনা করিয়াছেন। উপনিষদের ঋষি 'ওঁ পিতা নোহসি' বলিয়া প্রার্থনা করিলেও পিতৃভাবে ভগবদুপাসনা বাঙ্গালীর প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ও তাঁহার ঐতিহ্যের সহিত সম্পর্ক-শূন্য। পিতৃভাবে ভগবানের উপাসনা খ্রীষ্ট ধর্মেরই বৈশিষ্ট্য। খ্রীষ্ট ধর্ম দুইটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

(১) প্রতিবেশীদের সঙ্গে আত্মবৎ ব্যবহার করিবে,

এবং, (২) তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার প্রতি ভক্তিমান হইবে (Love thy neighbour as thyself and love thy Father which is in Heaven)। রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা হইলেও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথই ব্রাহ্ম ধর্মকে বিধিবদ্ধ

করেন। তিনি উপনিষদের ঋষির নিম্নোক্ত প্রার্থনা-মন্ত্রটি উপাসনার অঙ্গরূপে গ্রহণ করেন—

'ওঁ পিতা নোহসি
ওঁ পিতা নোবোধি
ওঁ নমস্তেঽস্তু মা মা হিংসী ঃ।'

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের চিন্তাধারা আদি ব্রাহ্ম সমাজের ভাব দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। তাই তিনি নিখিল বিশ্বের জনকরূপে ঈশ্বরের ভজনা করিয়াছেন। সাহিত্য-সাধক চরিতমালায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঈশ্বর গুপ্তের সহিত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত 'তত্ত্ববোধিনী সভার' সম্পর্কের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, 'কলিকাতা ও মফঃস্বলের অনেক সভা-সমিতিতে সম্পাদক পরিচালক ইত্যাদি ভাবে যোগদান করিয়া তিনি কালের গতির সহিত সমানে তাল রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি সুবিখ্যাত 'তত্ত্ববোধিনী সভা', টাকীর 'নীতি-তরঙ্গিণী সভা', দর্জিপাড়ার 'নীতিসভা' প্রভৃতির সভ্য পদে থাকিয়া মধ্যে মধ্যে বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ করিতেন।' [সাহিত্য সাধক-চরিতমালা, ১০, পৃঃ ৮—৯]।

'নিগুর্ণ ঈশ্বর' কবিতায় যে আদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাব আছে, তাহা বোধ হয় অনস্বীকার্য। অবশ্য, কবিতাটির মধ্যে একটা আন্তরিকতার সুর আছে, উহাই আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। এখানে লক্ষণীয় যে ঈশ্বর গুপ্ত 'নিরাকার সগুণ ব্রহ্ম' অর্থেই 'নিগুর্ণ ঈশ্বর' কথাটির ব্যবহার করিয়াছেন,—ভারতীয় দর্শনে 'নিগুর্ণ ব্রহ্ম' আছেন, কিন্তু ভারতীয় দার্শনিকগণ স্বর্গে, মর্ত্তে, পাতালে কোথাও 'নিগুর্ণ ঈশ্বরের' দেখা পান নাই। বেদান্তের 'নিগুর্ণ ব্রহ্ম' কিন্তু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্য ছিল, তাই তিনি মহানির্বাণ তন্ত্রোক্ত ব্রহ্ম-স্তোত্রেরও ভাষাগত পরিবর্তন সাধন

করিয়াছিলেন। যাহা হউক, 'নির্গুণ ঈশ্বর' নামক কবিতার রচয়িতাকে আমরা আর যাহাই বলি, খাঁটি বাঙ্গালী কবি বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করিতে পারি না।

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, 'ঈশ্বর গুপ্ত Realist এবং ঈশ্বর গুপ্ত Satirist, ইহা তাঁহার সাম্রাজ্য এবং ইহাতে তিনি বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয়।' যিনি 'এণ্ডাওয়ালা তপসে মাছ,' 'পাঁটা,' 'আনারস' প্রভৃতি ভোজ্য-দ্রব্যকে অবলম্বন করিয়াও কাব্যরসের সৃষ্টি করিতে পারেন, 'পৌষ-পার্বণ' বর্ণনা করিতে গিয়া যিনি সম-সাময়িক বাঙ্গালী হিন্দুর অন্তঃপুরের চিত্র যথাযথরূপে অঙ্কিত করিতে পারেন, তিনি যে বস্তু-তান্ত্রিক কবি, তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার একথাও সত্য যে, ঈশ্বর গুপ্তই বাংলা সাহিত্যে নূতন ধরণের হাস্য-রসের প্রবর্তন করিয়াছিলেন, কিন্তু 'ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গে কিছুমাত্র বিদ্বেষ নাই', একথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গ অনেক স্থলে উপভোগ্য, সকল স্থলে নহে। অনেক স্থলে তাঁহার ব্যঙ্গ বিদ্বেষ-বর্জিত, আবার কোথাও বা বিদ্বেষ-প্রসূত। আমরা পরে সে কথার আলোচনা করিব। 'নীলকর' কবিতায় যেখানে মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে সম্বোধন করিয়া ঈশ্বর গুপ্ত বলিয়াছেন,—

'তুমি মা কল্পতরু আমরা সব পোষা গরু
শিখিনি শিং বাঁকানো,
কেবল খাবো খোল বিচালি ঘাস॥
যেন রাঙ্গা আমলা তুলে মামলা
গামলা ভাঙ্গে না,
আমরা ভূষি পেলেই খুসী হব—
ঘুষি খেলে বাঁচব না॥'

সেখানে চমৎকার হাস্যরসের সৃষ্টি হইয়াছে। আবার যখন দেশে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার বিস্তার ও স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার দর্শন করিয়া এবং

বাঙ্গালী যুবকগণের পরানুচিকীর্ষা লক্ষ্য করিয়া ঈশ্বর গুপ্ত বলিয়াছেন,—

'যত কালের যুবো যেন স্ববো
ইংরেজী কয় বাঁকা ভাবে।
ধোরে গুরু পুরুত মারে জুতো
ভিখারী কি অন্ন পাবে?
আগে মেয়ে গুলো ছিল ভালো
ব্রত ধর্ম কোর্তো সবে।
একা বেথুন এসে শেষ করেছে
আর কি তাদের তেমন পাবে?
যত ছুঁড়ীগুলো তুড়ী মেরে
কেতাব হাতে নিচ্চে যবে।
তখন এ, বি শিখে বিবি সেজে,
বিলাতী বোল কবেই কবে॥
এখন আর কি তারা সাজি নিয়ে
সাঁজ সেঁজোতির ব্রত গাবে?
সব কাঁটা চামচে ধোর্‌বে শেষে
পিঁড়ি পেতে আর কি খাবে?'

তখন মনে হয় না কি যে ঈশ্বরচন্দ্র পুরাতনের পক্ষপাতী হইলেও নূতনের প্রতি তাঁহার তেমন কোন বিদ্বেষ বা আক্রোশ ছিল না? কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র শুধু এই ধরণের ব্যঙ্গ কবিতাই রচনা করেন নাই। তাঁহার যুদ্ধ-বিষয়ক কবিতায় যে বিদ্বেষ-প্রসূত ব্যঙ্গের নিদর্শন আছে, সেকথাতো ভুলিলে চলিবে না।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, 'রামপ্রসাদের মাতৃপ্রেমে ও ঈশ্বরচন্দ্রের পিতৃপ্রেমে ভেদ বড় অল্প।' বঙ্কিমচন্দ্রের মতে রামপ্রসাদের ন্যায় ঈশ্বর গুপ্তও সাধক, তবে রামপ্রসাদ ঈশ্বরকে মাতৃভাবে ও গুপ্ত কবি

পিতৃভাবে ভজনা করিয়াছেন। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই—ঈশ্বরচন্দ্রের পরমার্থ-বিষয়ক কবিতা কি রামপ্রসাদের গানের মত আমাদের হৃদয়ের তন্ত্রীকে গভীরভাবে স্পর্শ করে? ঈশ্বর গুপ্তের একটি কবিতার সঙ্গে রামপ্রসাদের একটি গানের তুলনা করিলেই আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হইবে।

'নিগুর্ণ ঈশ্বর' কবিতায় ঈশ্বর গুপ্ত জগৎ-পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

'কাতর কিঙ্কর আমি, তোমার সন্তান।
আমার জনক তুমি, সবার প্রধান॥
বার বার ডাকিতেছি, কোথা ভগবান।
একবার তাহে তুমি নাহি দেও কান॥
সর্বদিকে সর্বলোকে কত কথা কয়।
শ্রবণে সে সব রব প্রবেশ না হয়॥
হায় হায়! কব কায়, ঘটিল কি জ্বালা।
জগতের পিতা হোয়ে তুমি হোলে কালা॥

ঈশ্বর গুপ্তের এই কবিতাটিতে অভিমানের সুর আছে বটে, কিন্তু সে অভিমান আমাদের হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করে না। রামপ্রসাদের গানে যে তীব্র ও মর্মস্পর্শী আকুলতা আছে, বিশ্ব-জননীর সঙ্গে যে তদাত্মতাবোধের নিদর্শন আছে, ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় তাহা নাই। রামপ্রসাদের একটি প্রসিদ্ধ সঙ্গীত উদ্ধৃত করিতেছি—

মা মা বলে আর ডাকবনা,
তারা দিয়েছিস দিতেছিস কতই যন্ত্রণা,
বারে বারে ডাকি মা, মা বলিয়ে,
মা বুঝি রয়েছিস চক্ষু কর্ণ খেয়ে,

মাতা বিদ্যমানে এ দুখ সন্তানে
মা বেঁচে তাহার কি ফল বলনা ;
আমি ছিলাম গৃহবাসী করিলি সন্ন্যাসী
আর কি ক্ষমতা রাখিস এলোকেশী
না হয় দ্বারে দ্বারে যাব ভিক্ষা মেগে খাবো
মা মলে কি তার ছেলে বাঁচে না ?

এই গানে সাধকের অন্তর হইতে যে অভিমান উৎসারিত হইতেছে, তাহার মূলে আছে বিশ্ব-জননীর সঙ্গে তাদাত্ম্যানুভূতি এ অনুভূতির নিবিড়তা ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় কোথায় ?

ঈশ্বর গুপ্ত 'শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্ন-দর্শন', 'শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাধিকা', 'সখীর প্রতি রাধিকা' প্রভৃতি যে কয়েকটি কবিতা লিখিয়াছেন, তাহাতে 'মহাজন-পদাবলী' অপেক্ষা কবিগানের প্রভাবই বেশী লক্ষ্য করা যায়। যেখানে সখীর প্রতি রাধিকা বলিতেছেন—

আমি হে গোপের বধূ বচনে নাহিক মধু
রসিক নাগর বঁধু পাছে সই চটে গো।
ফলে এই অনুপম পুরুষ 'পরশ' সম
পরশে হই যে সোনা, বটে কিনা বটে গো ॥

সেখানে কি আমরা মহাজন-পদাবলীর মহাভাবময়ী রাধিকাকে দেখিতে পাই ? ভক্তের হৃদয়-সিংহাসনে শ্রীমতী রাধিকার যে ভাব-মূর্তি প্রতিষ্ঠিত, এই পংক্তিগুলিতে উহা যেন চূর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু যখন শ্রীরাধিকা বলেন—

ভালবাসে যেবা যাকে যতনে গোপনে রাখে
মহাদেব মন্দাকিনী ধরিয়াছে জটে গো।
আর কি শ্যামেরে ভুলি তুলিয়া প্রণয়-তুলি
লিখিয়াছি কাল রূপ মম মন-পটে গো ॥

তখন সত্যই প্রেমময়ী রাধিকার অন্তরের একখানি ছবি আমাদের

মানস-পটে উদ্ঘাটিত হয়। যাহা হউক, বৈষ্ণব মহাজনগণের অথবা শক্তিসাধকগণের অনুভূতির গভীরতা ঈশ্বরচন্দ্রের ছিল না, কেননা, ঈশ্বরচন্দ্র সাধক ছিলেন না, কোনরূপ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা তো দূরের কথা। রামপ্রসাদের মত ঈশ্বর গুপ্তও আগমনীর গান রচনা করিয়াছেন, শুধু ঈশ্বর গুপ্ত কেন,—দাশরথি রায়, রাম বসু, হরু ঠাকুর, শ্রীধর কথক প্রভৃতি কবি ও পাঁচালিওয়ালাগণ, এমন কি, আধুনিক অনেক কবি পর্যন্ত আগমনী ও বিজয়ার গান রচনা করিয়াছেন কিন্তু রামপ্রসাদের আগমনী গানে স্নেহময়ী জননীর স্তন্য হইতে দুগ্ধধারার ন্যায় বাৎসল্য-রস যেমন সহজে ক্ষরিত হইতেছে, ঈশ্বর গুপ্তের বা অন্য কোন কবির গানে তাহা হয় নাই, এমন কি, সাধক কমলাকান্ত পর্যন্ত রামপ্রসাদের সঙ্গে তুলিত হইতে পারেন নাই, ঈশ্বর গুপ্ত তো দূরের কথা।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার অশ্লীলতা-সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্যই গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক। বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মে ও রাজনীতিতে ঈশ্বরচন্দ্রের উদার দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করিয়াছেন। ধর্মে উদারতা কিন্তু একমাত্র ঈশ্বর গুপ্তেরই বৈশিষ্ট্য নয়। যে দেশের সাধক-কবি রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

> 'কালী হলি মা রাসবিহারী নটবর-বেশে বৃন্দাবনে',

যে দেশের ভাবধারায় পুষ্ট হইয়া বিদেশী কবিওয়ালা গাহিয়াছেন—

> 'খ্রীষ্টে আর কৃষ্ণে কিছু ভেদ নাইরে ভাই',

যে দেশের সাধক রামদুলাল গাহিয়াছেন—

> 'জেনেছি জেনেছি তারা তুমি জান ভোজের বাজী,
> যে তোমায় যে ভাবে ডাকে তাতেই তুমি হও মা রাজী'

সে দেশে ঈশ্বরচন্দ্রের উদার ধর্মমত তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বলিয়া মনে হয় না। রাজনীতি-ক্ষেত্রে ঈশ্বর গুপ্ত কোন কোন বিষয়ে সময়ের অগ্রগামী ছিলেন সত্য কিন্তু সকল বিষয়ে তাঁহার

দৃষ্টিভঙ্গি উদার ছিল না। 'মাতৃভাষা' ও 'স্বদেশ' কবিতায় ঈশ্বর গুপ্তের যে পরিচয় পাওয়া যায়, উহাই তাঁহার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের ঋতু-বিষয়ক কবিতার উল্লেখ করেন নাই। এই কবিতাগুলি প্রধানতঃ চিত্রধর্মী, কবি উহাতে প্রচুর ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। 'গ্রীষ্ম', 'বর্ষায় লোকের অবস্থা,' 'শরদের আগমনে লোকের অবস্থা-বর্ণনা,' 'শীত' প্রভৃতি কবিতায় কবির নিপুণ পর্যবেক্ষণশক্তির পরিচয় আছে কিন্তু নিতান্ত আত্মগত আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-ভাবনা কোথাও আত্মপ্রকাশ করে নাই। কিশোর বঙ্কিমচন্দ্র 'সংবাদ-প্রভাকরে' যে সমস্ত ঋতু-বিষয়ক কবিতা (স্বামী-স্ত্রীর আলাপচ্ছলে গ্রথিত) লিখিয়াছেন, তাহাতে ঈশ্বর গুপ্তের সুস্পষ্ট প্রভাব আছে;—এই সব কবিতায় বঙ্কিমচন্দ্র গুপ্ত কবির মতই অনুপ্রাস, যমক প্রভৃতি অলঙ্কারের প্রয়োগ করিয়াছেন, যথা শীত ঋতু-বর্ণনা-উপলক্ষ্যে স্ত্রীর উক্তি—

'হইয়াছে জল বড়ই শীতল
ছুঁইলে বিকল হইতে হয়,
আগে যে জীবন জুড়াত জীবন
সে বন এখন নাহিক সয়'।—ইত্যাদি

পরবর্তী কালে রঙ্গলালের কাব্যে প্রকৃতির বর্ণ-বৈচিত্র্য অতি নিপুণ ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। এ বিষয়ে তিনি ঈশ্বর গুপ্তকে অতিক্রম করিয়াছেন।

আমরা বলিয়াছি, ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গে কিছুমাত্র বিদ্বেষ নাই, এ কথা সর্বত্র সত্য নহে। তাঁহার 'বিধবা-বিবাহ আইন,' 'বিধবা-বিবাহ' প্রভৃতি ব্যঙ্গ-কবিতার কথা বলিতেছি না, আমরা বলিতেছি সম-সাময়িক যুদ্ধ-বিষয়ক কবিতার কথা। এই সব কবিতায় ঈশ্বর গুপ্ত ইংরেজের মহিমা-কীর্তনে পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছেন এবং যাঁহারা ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে শুধু বিদ্রূপের

কশাঘাতই করেন নাই, জঘন্য ভাষায় আক্রমণও করিয়াছেন। 'শিখ যুদ্ধে ইংরেজের জয়,' 'দিল্লীর যুদ্ধ,' 'কাবুলের যুদ্ধ,' 'ব্রহ্মদেশের সংগ্রাম' ও 'যুদ্ধ-শান্তি,'—এই কয়টি কবিতা যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এ কথা কিছুতেই স্বীকার করিবেন না যে, ঈশ্বর গুপ্তের রাজনৈতিক মত বড় উদার ছিল। ঈশ্বর গুপ্ত যেখানে নানা সাহেবকে লইয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন অথবা ঝান্সীর রাণীর চরিত্রের প্রতি কুৎসিত ভাষায় কটাক্ষ করিয়াছেন, সেখানে আমরা কবির বিদ্বেষ-প্রসূত ব্যঙ্গের নিদর্শন পাই। আমরা এবার কবির যুদ্ধ-বিষয়ক কবিতার আলোচনা করিব। শিখযুদ্ধে ইংরেজের জয়লাভে উল্লসিত হইয়া কবি বলিতেছেন—

'কালগুণে বিপরীত বুঝিবার ভ্রম।
এসেছিল শিখ সব করিয়া বিক্রম॥
বামনের অভিলাষ ধরিবারে শশী।
উর্ধ্বভাগে হস্ত তুলে ভূমিতলে বসি॥
তুরঙ্গের খর গতি খর করে সখ।
বাসুকি করিতে বধ বাঞ্ছা করে বক॥
কাকের কোকিল-রবে লজ্জা নাহি হয়।
গেল বিপক্ষের ভয় গেল বিপক্ষের ভয়।
শতলজ পার হ'ল শিখ সমুদয়।
রণে ব্রিটিশের জয় রণে ব্রিটিশের জয়॥
এ দেশের প্রজা সব ঐক্য হ'য়ে সুখে।
রাজার মঙ্গল-গীত গান কর মুখে॥
ধন্য চিফ্ কমাণ্ডার ধন্য দেও গডে॥
গণ্য বটে সৈন্যগণ ধন্য দেও তায়।
লর্ডের রহিল মান গডের কৃপায়॥
সদয় সমরকল্পে বিভু দয়াময়।

গেল বিপক্ষের ভয় গেল বিপক্ষের ভয়।
শতলজ পার হ'ল শত্রু সমুদয়।
জয় ব্রিটিশের জয় রণে ব্রিটিশের জয়॥

দ্বিতীয় যুদ্ধ-সম্পর্কে কবি লিখিয়াছেন—

'পেটে খেলে পিঠে সয় এই বাক্য ধর।
রাজার সাহায্যহেতু রণসজ্জা পর॥'

নানা সাহেবকে লইয়াও কবি ব্যঙ্গ করিতে ছাড়েন নাই।—

'নানা পাপে পটু নানা নাকি গুণে না, না।
অধর্মের অন্ধকারে হইয়াছে কাণা॥
ভাল-দোষে ভাল তুমি ঘটালে প্রমাদ।
আগেতে দেখেছ ঘুঘু, শেষে দেখ ফাঁদ॥'

সিপাহী-বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহীরা জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন কিনা, তাহা লইয়া তর্কের অবকাশ থাকিতে পারে, বিদ্রোহিগণের ব্যর্থতা ও পরাজয়ে যে অন্ততঃ সাময়িক ভাবেও ভারতের মঙ্গল সাধিত হইয়াছে, এ কথাও হয়তো যুক্তি-তর্কের দ্বারা প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে কিন্তু তাই বলিয়া যে কবি নানা সাহেব বা ঝান্সীর রাণীর চরিত্রকে মসীবর্ণে চিত্রিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহাকে আমরা কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারি না। ইহার পরও কি কেহ বলিবেন যে ঈশ্বর গুপ্তের রাজনৈতিক মত বড় উদার ছিল? পরবর্ত্তী কালে চণ্ডীচরণ সেন, রজনীকান্ত গুপ্ত প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ নানা সাহেব বা ঝান্সীর রাণীর প্রতি যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার বিন্দুমাত্রও ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় নাই। 'কানপুরের জয়' কবিতায় ঈশ্বর গুপ্ত ঝান্সীর রাণী সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতো কস্মিন্ কালে ক্ষমার্হ নহে।

'পিঁপীড়া ধরেছে ডানা মরিবার তরে।
হ্যাদে কি শুনি বাণী?

হ্যাদে কি শুনি বাণী ঝান্সির রাণী
ঠোঁটকাটা কাকী ॥
মেয়ে হয়ে সেনা নিয়ে সাজিয়াছে নাকি ?
নানা তার ঘরের ঢেঁকি
নানা তার ঘরের ঢেঁকি মাগী খেঁকী
গোয়ালের দলে ।
এত দিনে ধনে জনে যাবে রসাতলে ॥'

এই সব কবিতায় যদি বিদ্বেষ-প্রসূত ব্যঙ্গের নিদর্শন না মিলে, তবে বিদ্বেষ-প্রসূত ব্যঙ্গ কাহাকে বলে তাহা আমরা জানি না।

ঈশ্বর গুপ্তই বাংলার প্রথম কবি যিনি মুক্ত কণ্ঠে ইংরেজের প্রশস্তি কীর্তন করিয়াছেন। পরবর্তী কালের রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের মত ঈশ্বর গুপ্তের মনেও এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে ভারতবর্ষে ইংরেজের আগমন ও রাজ্য-প্রতিষ্ঠা বিধাতারই মঙ্গলময় বিধান।

ঈশ্বর গুপ্ত বলিয়াছেন—

'পুড়ুক বিপক্ষদল মনের অনলে।
উড়ুক ব্রিটিশ ধ্বজা সমুদয় স্থলে' ॥ (দিল্লীর যুদ্ধ)
'ইংরাজের পরাক্রম রবির প্রকাশ।
অত্যাচার-অন্ধকার হইল বিনাশ' ॥ (দিল্লীর যুদ্ধ)
ব্রিটিশের জয় জয় বল সবে ভাইরে।
এসো সবে নেচে কুঁদে বিভুগুণ গাইরে ॥' (যুদ্ধ-শান্তি)

যদিও ঈশ্বর গুপ্ত 'বুড়ো শিবের স্তুতি' কবিতায় মার্শম্যানকে হিন্দুত্বের বিলোপ-সাধন-প্রচেষ্টার জন্য ব্যঙ্গ করিয়াছেন এবং 'বিধবা বিবাহ আইন' কবিতায় রাজপুরুষগণের ধর্মে হস্তক্ষেপের নিন্দা করিয়াছেন, তথাপি তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করিয়াছেন যে, ইংরেজ কর্তৃক ভারতের শাসন ভারতবাসীর জীবনে বিধাতার অমোঘ

আশীর্বাদ-স্বরূপ। তাই ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যাঁহারা অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে তিনি রাজদ্রোহী ও পাপিষ্ঠ বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন। কবির এই প্রত্যয়ের বিরুদ্ধে অবশ্য আমাদের কিছু বলিবার নাই। কিন্তু যুদ্ধ-বিষয়ক কবিতায় কবি যে সংযম ও শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করিয়াছেন, উহাতে আমাদের মনে তীব্র আঘাত লাগে। আমাদের মনে হয়, ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যেও একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল। ঈশ্বর গুপ্ত হিন্দু ও ঈশ্বর গুপ্ত বাঙালী, তিনি বাঙালীর সাহেবিয়ানার পরম শত্রু, বাঙালীত্ব ও হিন্দুত্বের প্রতি কতকটা অন্ধ মমত্ব-বোধকে তিনি মনোমধ্যে সযত্নে লালন করেন, কিন্তু ইংরেজের বল-বীর্য-পরাক্রমে তিনি মুগ্ধ, ইংরেজের জয়ে তিনি উল্লসিত, ইংরেজের বিরুদ্ধে যাঁহারা রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন তাঁহাদের তিনি পরম শত্রু। সুতরাং কবি ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যে একটা দ্বৈত সত্তা ছিল,—'বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী' প্রভৃতি ছত্রে কবির অবচেতন মনের এই দ্বৈত রূপই প্রকট হইয়াছে। পরবর্তী কালে এই দ্বন্দ্ব প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সংস্কৃতির বিরোধ ও সমন্বয়-প্রয়াসের মধ্য দিয়া আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। তাই প্রতীচ্য অনুশীলন-তত্ত্বের সঙ্গে ভগবদ্গীতা ও বিষ্ণু-পুরাণের, ক্রমবিকাশ-বাদের সঙ্গে দশাবতার ও দশমহাবিদ্যা-তত্ত্বের, অখণ্ড জাতীয়তার আদর্শের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের জীবন-দর্শনের একটা সমন্বয়ের প্রয়াস ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রকট হইয়াছে। এইরূপ প্রয়াসের মূলে আছে পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির প্রতি মোহ। ভারতীয় সংস্কৃতিকেও শ্রদ্ধা করিব আবার উহা যে প্রতীচ্য সংস্কৃতির চেয়ে কম গৌরবান্বিত নয়, এ কথাও তারস্বরে ঘোষণা করিতে হইবে,—এইরূপ মনোবৃত্তি সম্পূর্ণ সুস্থতার পরিচায়ক নয়। ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যেই সর্বপ্রথম বাঙালী-প্রীতি ও ইংরেজ-প্রীতি যুগপৎ আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল। অবশ্য, ঈশ্বরচন্দ্রের স্বদেশ-প্রেম সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ থাকিলেও 'দেশের কুকুর ধরি বিদেশের ঠাকুর

ফেলিয়া' একথা তিনিই সর্ব প্রথম বলিয়াছিলেন, অথচ তাঁহার ইংরেজ-প্রীতি এমন প্রবল ছিল যে তিনি নানা সাহেব বা ঝান্সীর রাণীকেও কদর্য ভাষায় আক্রমণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। গুপ্ত কবির মধ্যে এই দ্বৈত রূপ ছিল বলিয়াই তিনি যথার্থ যুগ-সন্ধির কবি।

অক্ষয়কুমার দত্ত ও বাংলার নব জাগরণ

(১৮২০—১৮৮৬)

উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম স্মরণীয় পুরুষ অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁহার সুবিপুল সাহিত্য-সাধনার মধ্য দিয়া সে যুগের বাঙ্গালীর চিন্তাধারায় যে বিপ্লব আনয়ন করিয়াছিলেন, এ যুগের বাঙ্গালী তাহার বড় একটা সন্ধান রাখে না। বাঙ্গালীর নৈয়ায়িক প্রতিভা ও প্রতীচীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া অক্ষয়কুমার বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং গৌড়ী রীতি আশ্রয় করিয়া বাংলা সাহিত্যকে শ্রীসম্পন্ন করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার সাহিত্য-সাধনার প্রধান লক্ষ্য ছিল স্বদেশীয়গণের কল্যাণ-সাধন। তিনি স্বদেশবাসিগণের চিত্তকে জ্ঞানালোকে প্রদীপ্ত করিতে এবং তাঁহাদের অজ্ঞতা ও কুসংস্কাররূপ অন্ধকার দূর করিতে চাহিয়াছিলেন। সত্যই তাঁহার যুক্তিগর্ভ রচনাবলী সে যুগের বাঙ্গালীর চিত্তে একটা প্রবল আলোড়ন উপস্থিত করিয়াছিল। ফলতঃ, অক্ষয়কুমার যে উনবিংশ শতাব্দীর একজন দিকপাল ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন—"বাংলা গদ্যের পরিপুষ্টি-সাধনে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার' সাহায্যে অক্ষয়কুমার যে বিপুল সাধনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের চিরদিন স্মরণীয়। তিনিই সর্বপ্রথম দর্শন ও বিজ্ঞানকে সাহিত্যিক মর্যাদা দান করিয়াছিলেন।" অবশ্য, অক্ষয়কুমারের পূর্বে স্কুল বুক সোসাইটির উদ্‌যোগে বাংলা ভাষায় বহু বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল কিন্তু সে সকল গ্রন্থ সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করে নাই। অক্ষয়কুমারের সাহিত্য-সাধনার মূল প্রেরণা ছিল,—সে যুগের বাঙ্গালীর সংস্কার-মোহ ও বুদ্ধির জড়তাকে আঘাত করা এবং তাঁহাদিগকে বিশুদ্ধ জ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট করা। বাল্যকাল

হইতেই প্রত্যক্ষবাদ এবং যুক্তিবাদের উপর অক্ষয়কুমারের একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল। ইলিয়ড্ নামক মহাকাব্য, পদার্থবিদ্যা ও ভূগোল অধ্যয়ন করিবার সময়েই প্রচলিত হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস শিথিল হয়। পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং তিনি 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার' শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের সহিত অক্ষয়কুমারের প্রকৃতিগত পার্থক্য ছিল। দেবেন্দ্রনাথের চিত্ত ছিল ভক্তি-প্রবণ আর অক্ষয়কুমারের ছিল জ্ঞানপ্রবণ। পারস্যের সুফি সাধকগণ ও উপনিষদের ঋষিগণ দেবেন্দ্রনাথের ভক্তিপিপাসা চরিতার্থ করিত, আর পাশ্চাত্ত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান অক্ষয়কুমারের জ্ঞান-পিপাসা চরিতার্থ করিত। যে বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্মে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপিত হয়, তাহার প্রতিও অক্ষয়কুমারের আস্থা ছিল না। অক্ষয়কুমারের জ্ঞানস্পৃহা এত প্রবল ছিল যে, তিনি শারীর-বিজ্ঞান শিক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে মেডিকেল কলেজেও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। আবার, ভারতবর্ষীয় পুরাতত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞানলাভের জন্যও তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ অবশ্য এক সময়ে অক্ষয়কুমারকে স্বীয় মতে আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু পরবর্তী কালে অক্ষয়কুমারই দেবেন্দ্রনাথের চিন্তাধারার উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করেন। অক্ষয়কুমার দেবেন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিলে তাঁহাদের মধ্যে প্রায়ই মতের অনৈক্য ঘটিতে থাকে। এ সম্পর্কে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ 'আত্মচরিতে' যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ আমরা উদ্ধৃত করার প্রয়োজন বোধ করি—'তিনি (অক্ষয়বাবু) যাহা লিখিতেন, তাহাতে আমার মতবিরুদ্ধ কথা কাটিয়া দিতাম এবং আমার মতে তাঁহাকে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতাম। কিন্তু তাহা আমার পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। আমি কোথায়

আর তিনি কোথায়! আমি খুঁজিতেছি ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ আর তিনি খুঁজিতেছেন, বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির কি সম্বন্ধ! আকাশ-পাতাল প্রভেদ।' বাস্তবিক, অক্ষয়বাবুর মত যুক্তিবাদী তার্কিকের পক্ষে পরিণামে অজ্ঞেয়বাদী হওয়া অসম্ভব নহে এবং শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বাবুর মতে তিনি পরিণামে অজ্ঞেয়বাদীই হইয়াছিলেন। কিন্তু অক্ষয়কুমারের সান্নিধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চিন্তাধারায় যে বিপুল পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

অক্ষয়কুমার জর্জ্জ কুম্ব রচিত 'কনষ্টিটিউশন অব ম্যান্' (Constitution of Man) অবলম্বনে 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার,' (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ) রচনা করেন, কিন্তু গ্রন্থখানির স্থানে স্থানে তাঁহার স্বকীয় চিন্তাধারার নিদর্শন রহিয়াছে। এই গ্রন্থ সেই যুগের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই গ্রন্থ প্রচারের ফলে এদেশের শিক্ষিত লোকেরা ব্যায়াম-চর্চা ও নিরামিষ-ভোজন করিতে আরম্ভ করে। জর্জ্জ কুম্ব তাঁহার গ্রন্থে আমিষাহারের পক্ষ সমর্থন করেন, কিন্তু অক্ষয়-কুমার আমিষাহারের অনুকূলে যে সকল যুক্তি আছে, তাহার আলোচনা করিলেও নিরামিষাহারের বৈধতা প্রতিপন্ন করেন। অবশ্য, অক্ষয়কুমারের যুক্তি যে অখণ্ডনীয়, এমন কথা আমরা স্বীকার করি না, কিন্তু এ কথা সত্য যে তাঁহার গ্রন্থ প্রকাশের ফলে সে যুগে দেশের বহু কৃতবিদ্য লোক আমিষাহার একেবারে বর্জন করেন। মনীষী রজনীকান্ত লিখিয়াছেন—বাহ্য বস্তুতে আমিষভক্ষণ-বিষয়ক প্রস্তাব পড়িয়া অনেকেই সে সময়ে আমিষভক্ষণের একান্ত বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিলেন। ধর্মনীতি ও বাহ্যবস্তুতে ব্যায়াম প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছিল, তৎসমুদয় অস্মদ্দেশীয় যুবক-সম্প্রদায়ের মধ্যে অকার্যকর হয় নাই। (প্রতিভা,

১৭শ সংস্করণ, পৃঃ ৫২।) শুধু তাহাই নহে, এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া অনেকে প্রতিজ্ঞা করেন যে, জীবনে কখনও হলাহলরূপী সুরা স্পর্শ করিবেন না। অবশ্য এই গ্রন্থ প্রচারের বহু পূর্বেই অক্ষয়কুমার 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' ১৭৬৬ শকের ভাদ্র মাসে এবং ১৭৬৭ শকের শ্রাবণ মাসে সুরাপানের বিষময় ফল সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখেন। পরবর্তীকালে অধ্যাপক প্যারীচরণ সরকার Bengal Temperance Society নামে এক সভা প্রতিষ্ঠিত করেন। আচার্য কেশবচন্দ্রও সুরাপান নিবারণের জন্য Temperance Association, Total Abstinence Society ও Band of Hope নামে কয়েকটি সভা স্থাপন করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যে নব্য হিন্দুধর্ম প্রচার করেন, তাহার মূল কথা শারীরিকী, জ্ঞানার্জনী, কার্যকারিণী ও চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলন এবং সমুদয় বৃত্তির সামঞ্জস্য-বিধান। অক্ষয়কুমারও তাঁহার 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচারে' বৃত্তিনিচয়ের সামঞ্জস্যের আদর্শ স্থাপন করেন। কিন্তু বঙ্কিম-কথিত ধর্মে ভক্তির একটা স্থান আছে, অক্ষয়কুমারের আদর্শে ভক্তির স্থান নাই। তিনি বলিয়াছেন, সংসারে সুখলাভ করিতে হইলে জগদীশ্বরের নিয়ম-প্রণালী অবগত হওয়া এবং সেগুলি যথাযথ ভাবে পালন করা আবশ্যক। শরীর ও মনের যথাযথ চালনার দ্বারা, জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলনের দ্বারা এবং পরিবার ও সমাজের প্রতি কর্তব্য-সম্পাদনের দ্বারা আমরা সুখী হইতে পারি। 'স্বপ্নদর্শন—ন্যায়বিষয়ক' প্রবন্ধে তিনি দেখাইয়াছেন, যাঁহারা বিদ্বান, ধার্মিক এবং কার্যকুশল, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ পুরুষ। অক্ষয়কুমারের মতে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে কার্য করাই ধর্ম এবং তাহা না করাই অধর্ম। পরবর্তীকালে অক্ষয়কুমারের ধর্মের আদর্শ অপেক্ষা বঙ্কিম-কথিত আদর্শই বাঙ্গালীগণের চিত্তে অধিকতর প্রেরণা যোগাইয়াছে, কারণ বঙ্কিম-

চন্দ্র প্রধানতঃ যুক্তিবাদী হইলেও তাঁহার অনুশীলন-তত্ত্ব ভারতীয় ভক্তিধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু, এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, সে যুগের তরুণ সমাজের উপর অক্ষয়কুমারের প্রভাবের আলোচনা করিতে গিয়া কোন কৃতবিদ্য ব্যক্তি লিখিয়াছিলেন—

"বঙ্গীয় যুবকমণ্ডলীর ভাব ও চিন্তার গতি ইনি যে পরিমাণে পরিচালিত করিয়াছেন, আর কোন ব্যক্তি সেরূপ পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ।"

[নব বার্ষিকী :৮৯ পৃঃ ১২৮৪]

অক্ষয়কুমারের 'ধর্মনীতি' প্রকাশিত হইলেও সমাজে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি প্রচলিত দেশাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছেন। তিনি বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহের প্রতিকূলে এবং বিধবা-বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহের অনুকূলে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া অনেকে প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থায় আস্থাহীন হন, কেহ কেহ বা প্রকাশ্যেই ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।

'ধর্মনীতি' গ্রন্থে অক্ষয়কুমার শুধু চরিত্রনীতি বা Ethics-এর আলোচনা করেন নাই, সমাজনীতিরও আলোচনা করিয়াছেন।

'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ) অক্ষয়কুমারের অক্ষয় কীর্তিস্তম্ভ। যদিও উইলসন সাহেবের পুস্তক অক্ষয়কুমারের প্রধান উপজীব্য ছিল, তথাপি ইহাতে তিনি বহু নূতন বিষয় সন্নিবেশিত করিয়াছেন। অক্ষয়কুমারের জীবন-বৃত্তান্ত লেখক মহেন্দ্রনাথ রায় উভয় গ্রন্থের তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, উইলসনের গ্রন্থে পঁয়তাল্লিশটি এবং অক্ষয়কুমারের গ্রন্থে একশত বিরাশিটি উপাসক সম্প্রদায়ের বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, অক্ষয়বাবুর আলোচনা উইলসনের আলোচনা হইতে অধিকতর বিস্তৃত। শ্রদ্ধেয় ব্রজেন্দ্র বাবুর সাহিত্য-সাধক-চরিত-

মালায় এই গ্রন্থের তৃতীয় ভাগের পাণ্ডুলিপি হইতে মুদ্রিত কয়েকটি প্রবন্ধের সন্ধান পাওয়া যায়।

'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের' উপক্রমণিকায় (প্রথম ভাগ, ১০৬ পৃঃ, দ্বিতীয় ভাগ, ২৮২ পৃঃ) অক্ষয়কুমারের বহুমুখী পাণ্ডিত্য, তীক্ষ্ণ বিচার-শক্তি ও গভীর স্বদেশ-প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। এই উপক্রমণিকা হইতে দেখা যায়, অক্ষয়কুমার যে শুধু ষড়্দর্শনে ব্যুৎপন্ন ছিলেন তাহা নহে ; চার্বাক দর্শন, রামানুজ ও মধ্বাচার্যের বেদান্ত ভাষ্য, শৈব রসেশ্বর দর্শন, নকুলীশ পাশুপত দর্শন, প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন, জৈন দর্শন প্রভৃতির সঙ্গেও তাঁহার সুগভীর পরিচয় ছিল। তিনি ভারতীয় ও গ্রীক দর্শনের তুলনামূলক আলোচনাও করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত, রামায়ণ ও মহাভারত, মানবধর্মশাস্ত্র এবং বিবিধ পুরাণও যে তিনি গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ; গ্রন্থের উপক্রমণিকায় তাহার প্রমাণ আছে।

এই উপক্রমণিকার ভাষা স্থানে স্থানে অত্যন্ত আবেগময়ী। 'আর্যগণের ভারতবর্ষে প্রবেশ' শীর্ষক অংশে তাঁহার স্বদেশপ্রেম যেন জ্বালাময় গৈরিক-স্রাবের ন্যায় নিঃসৃত হইয়াছে। হিন্দুজাতির মহিমাকীর্তন করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন,—"এককালে বীরকেশরী গ্রীকেরা ভারতবর্ষীয়দিগের বীরত্ব ও রণপাণ্ডিত্যদর্শনে চমৎকৃত হইয়া মুক্তকণ্ঠে যেরূপ গুণকীর্তন করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে যেরূপ দীর্ঘকায়, পরাক্রমশালী ও রণপণ্ডিত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, এখন তাহা কেবল পুরাবৃত্তের বিষয় ও উপাখ্যানের স্থল হইয়া পড়িয়াছে। সে আকার নাই, প্রকার নাই, বীর্য নাই ও আত্ম-রক্ষারও ক্ষমতা নাই! ভারতভূমি! তোমার মহিমাসূর্য একেবারেই অস্ত গিয়াছে। তোমার কীর্তিচন্দ্র আর সঞ্চরণ করে না। কেবল তোমার ভুবন-বিখ্যাত বহুমূল্য দৃশ্যমান কোহিনুরই অস্তমিত

হইয়াছে, এমন নয়, তাহার বহু পূর্বে চিরসঞ্চিত অমূল্য অন্তরস্থ কোহিনুর একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। দীর্ঘকায় এখন অতি ক্ষীণ হ্রস্বকায়ে পরিণত হইয়াছে। কোথায় সিংহ-শার্দূলের ভয়াবহ গর্জনধ্বনি, আর কোথায় ঝিল্লীগণের মৃদুমন্দ আর্তস্বর। কোথায় বীরগণের বীরদর্প ও স্পর্ধাসহকৃত সাহঙ্কার হুঙ্কার-ধ্বনি, আর কোথায় দীনহীন আশ্রিতজনের কৃতাঞ্জলিপুটে কৃপা-প্রার্থনা! সেই হিন্দু এখন এই হিন্দু! এককালের সিংহশার্দূল-প্রসবিনী ভারতভূমি এখন শশকমূষিক-প্রসবিনী হইয়া কতই লাঞ্ছিত হইতেছেন। তদীয় পূর্বপ্রতাপের চিতাগ্নি হইতে কি সুদীর্ঘ শিখা ও ঘনীভূত ধূমাবলী উত্থিত হইতেছে! তাহার বর্তমান অবস্থা অগ্নিময়; ভবিষ্যৎ গাঢ়তম ধূমে আচ্ছন্ন।"

'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের' দ্বিতীয় ভাগে 'ভারতবর্ষের পুরাতন ও অধুনাতন অবস্থার' আলোচনা করিতে গিয়া অক্ষয়-কুমার নির্ভীকভাবে ইংরেজ রাজত্বেরও দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইংরেজ জাতিকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

'তোমার অধিকারে আমাদের স্বাস্থ্যক্ষয়, বলক্ষয়, আয়ুঃক্ষয় ও ধর্মক্ষয় হইতেছে। তুমি অধিক বিতরণ কি সংহরণ করিতেছ, কে বলিতে পারে?"

এই উপক্রমণিকায় অক্ষয়কুমারের রচনা অনেক স্থানে উচ্ছ্বাসময়। উপক্রমণিকার স্থানে স্থানে সে যুগের একটি বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে, উহা স্বদেশ-প্রেম ও স্বাজাত্যাভিমান। পড়িতে পড়িতে আমাদের হেমচন্দ্রের কবিতা মনে পড়িয়া যায়। কিন্তু মূল গ্রন্থের মধ্যে কোথাও ভবাবেগ বা উচ্ছ্বাসের আতিশয্য দেখা যায় না। অক্ষয়কুমার প্রায় সর্বত্র ধীর, স্থির, শান্ত, সংযত। দুরন্ত রোগশয্যায় শায়িত হইয়াও যিনি 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের' ন্যায় গভীর তথ্যপূর্ণ বিশাল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন,

তিনি যে কত বড় জ্ঞানতাপস ছিলেন, তাহা আমরা আজ হয়তো সম্যক ধারণাও করিতে পারি না। তাঁহার গ্রন্থ-পাঠে সে যুগের শিক্ষিত বাঙ্গালী শুধু বাংলার নয়, ভারতের সাধনা ও সংস্কৃতির সঙ্গেও পরিচিত হইয়াছেন।

মনস্বী অক্ষয়কুমার তাঁহার অসামান্য মনীষাকে স্বদেশের কল্যাণকর্মে নিয়োজিত করিয়া সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় যে অভূতপূর্ব ও বিস্ময়কর নব জাগরণ ঘটিয়াছিল, উহার স্বরূপ সম্যকরূপে প্রণিধান করিতে হইলে আমাদিগকে জ্ঞানতাপস অক্ষয়কুমারের বিরাট দানের কথা শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করিতে হইবে। সত্যই অক্ষয়কুমার ছিলেন একজন যুগমানব বা Representative Man এবং তাঁহার মধ্যে সে যুগের কয়েকটি প্রধান ভাব-ধারা সংহত হইয়াছিল। আগষ্ট কোম্‌তের প্রত্যক্ষবাদ ও মানবতার আদর্শ (Positivism and Humanism), জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের হিতবাদ বা অধিকতম লোকের প্রভূততম সুখবিধানের আদর্শ (Utilitarianism বা Universalistic Hedonism), হার্বার্ট স্পেন্সারের অজ্ঞেয়বাদ (Agnosticism) এবং সে যুগের বাঙ্গালীর নব-জাগ্রত স্বদেশ-প্রেম তাঁহার মধ্যে এক আশ্চর্য সমন্বয় লাভ করিয়াছিল।

আমরা বলিয়াছি—অক্ষয়কুমারের অক্লান্ত সাহিত্য-সাধনার মূলে ছিল স্বদেশ-প্রেম ও স্বজাতির কল্যাণ-সাধনের আকাঙ্ক্ষা। 'ভূগোলের' ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন—স্বদেশবাসীর কল্যাণ-কামনায়ই তিনি গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ডেভিড হেয়ারের স্মরণ-সভায় তিনি যে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়াছিলেন, (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, ১২, পৃঃ ২৯—৩৬) উহাতে হেয়ার সাহেবের প্রশস্তি-উপলক্ষ্যে তিনি এদেশবাসীদের পক্ষে প্রতীচ্যের জ্ঞান-

বিজ্ঞান ও জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার কথা বিবৃত করিয়াছেন। 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' (১ম ও ২য় ভাগ); 'চারুপাঠ' ও 'ধর্মনীতি' রচনা করিয়া তিনি আমাদের মনে বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের উদ্রেক করিতে এবং আমাদিগকে শ্রেয়ের পথ নির্দেশ করিতে চাহিয়াছেন। অধিকন্তু তিনি বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সৃষ্টি করিয়া বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। শেষোক্ত তিনখানি গ্রন্থ সম্পর্কে আমরা রজনীকান্তের ভাষায় বলিতে পারি—'অক্ষয়কুমার বিদেশীয় সাহিত্যভাণ্ডার হইতে বর্ণনীয় বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই বিষয় তাঁহার অনুসন্ধান-গুণে যেন নবীকৃত হইয়া উঠিয়াছে।' 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ে' (১ম ও ২য় ভাগ) যে তাঁহার স্বদেশপ্রেমের নিদর্শন আছে, সে কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই গ্রন্থরচনার জন্য তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ এবং নানা সম্প্রদায়সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই গ্রন্থ হইতে আর একটি অংশ উধৃত হইল, এই অংশে আমরা ভারতের দুর্গতিতে লেখকের মর্মভেদী বিলাপ শুনিতে পাইব—

'ভীমজননী ও অর্জুনমাতা আর কাহার মুখাবলোকন করিয়া আশাপথ অবলম্বন করিবেন? গগনস্পর্শিবৎ হিমালয় ও আর্যাবর্তের বপ্রবিশেষ বিন্ধ্যাচল যাহাদের বল ও বিক্রম, বীর্য ও উৎসাহ এবং ধর্ম ও প্রতিষ্ঠা রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই, সেই মহাপুরুষের বংশে এখন এই অধম পামর-স্বরূপ আমরাই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। তাঁহাদের শোণিতকণা হিন্দুজাতির রক্তশিরা হইতে একেবারেই অন্তর্হিত হইয়াছে। তদীয় চিতাভস্মকণাও বিদ্যমান নাই। সেই সমস্ত পুরাতন মহত্তর পদার্থ একেবারেই অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। তাহার সহিত আর কণামাত্রও সংযোজিত হইল না, কখনও হইবেও না।'

বাংলা গদ্য-সাহিত্যের যখন শৈশবাবস্থা তখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অক্ষয়কুমার দত্তের সযত্ন লালনের ফলে ইহা কৈশোরাবস্থায় উত্তীর্ণ হয়, আর বিদ্যাসাগর মহাশয় উহার অঙ্গে নব যৌবনের লাবণ্য সঞ্চার করেন। অক্ষয়কুমারের জ্ঞানস্পৃহা ছিল দুর্দমনীয়, পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ, সাধনা ছিল অক্লান্ত। বাংলা সাহিত্যে অক্ষয়কুমারের দান সম্পর্কে মনীষী রজনীকান্ত গুপ্ত লিখিয়াছেন :

বিদ্যাসাগর যেমন কোমলতায় বাংলা সাহিত্যের মাধুর্য বৃদ্ধি করিয়াছেন, অক্ষয়কুমার সেইরূপ ওজস্বিতায় উহাকে উদ্দীপনাময় করিয়া তুলিয়াছেন। (প্রতিভা, ১৭শ সংস্করণ, পৃঃ ৪৪) * অক্ষয়কুমার সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু ভাষাকে শ্রুতিকঠোর করেন নাই, দীর্ঘ সমাস প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু ভাষাকে শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় নীরস করিয়া তুলেন নাই, সংস্কৃতের পার্শ্বে প্রচলিত কথার সমাবেশ করিয়াছেন, কিন্তু ভাষার সৌন্দর্য-হানি করেন নাই। (ঐ, পৃঃ ৪৭)* মাতাপিতার সহিত যে ভাষায় কথা কহা যায়; প্রণয়ীজনের সহিত যে ভাষায় আলাপ করা যায়; স্নেহময়ী ধাত্রী বা বিশ্বস্ত পরিজনের সহিত কথোপকথনকালে যে ভাষার ব্যবহার করা যায়; অক্ষয়কুমার সাধারণতঃ সে ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার ভাষা গম্ভীর, তাঁহার ভাষা সংস্কৃতশব্দবহুল, তাঁহার ভাষা সংস্কৃতের নিয়মানুসারে সমাস-সমন্বিত; কিন্তু এই গাম্ভীর্যে, এই সংস্কৃতবাহুল্যে এবং এই সমাসমালায় এরূপ মাধুর্য ও কমনীয়তা আছে যে, পাঠ করিলে পাঠকের হৃদয় মোহিত হয়। যে নির্জীব ও নিশ্চেষ্ট জাতির বেদনাবোধ নাই; যে জাতি মহাপ্রাণতার অধিকারী হয় নাই, জাতীয় জীবনে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে নাই, উদ্দীপনার মর্ম পরিগ্রহ করিতে পারে নাই, বিরহীজনের কাতরতা-প্রকাশক রোদন বা প্রণয়ী জনের অস্ফুট প্রণয়-সম্ভাষণ যে জাতির ভাষার প্রতি স্তরে পরিস্ফুট হয়, অথবা তাণ্ডবমত্ত

অর্ধশিক্ষিত লোকের কর্কশ কথার ন্যায় কতকগুলি অসংবদ্ধ, শ্রুতিকঠোর শব্দাবলী যে জাতির সাহিত্যভাণ্ডারে স্তূপে স্তূপে সজ্জিত থাকে, অক্ষয়কুমার সেই জাতির ভাষায় প্রচণ্ড তাড়িতবেগ সঞ্চারিত করেন এবং সেই জাতির ভাষাকে সুসংবদ্ধ, সুশ্রাব্য শব্দমালায় শোভিত করিয়া তুলেন। [ঐ, পৃঃ ৪৮]।

বাংলা সাহিত্যে অক্ষয়কুমারের দান সম্পর্কে রজনীকান্ত যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অনেকাংশে সত্য। তুঃখের বিষয়, এ যুগে অক্ষয়কুমারের রচনাবলী উপেক্ষিত ; বাংলা সাহিত্যে এবং বাংলার নব জাগরণে অক্ষয়কুমারের দান সম্পর্কে কেহ বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন বলিয়াও মনে হয় না। গুরু গম্ভীর বিষয়ের আলোচনায় আমাদের কেমন অরুচি জন্মিয়াছে, আমাদের পাকস্থলীতে জারকরসের নিতান্ত অভাব হইয়াছে। যাঁহারা অক্ষয়কুমারের রচনার সঙ্গে তেমন পরিচিত নহেন, তাঁহারা মনে করেন যে অক্ষয়কুমার ছিলেন শুষ্ক জ্ঞানতাপস, সাহিত্যিক রসবোধ তাঁহার ছিল না। যাঁহাদের এইরূপ ধারণা, তাঁহারা স্থিরভাবে 'চারুপাঠে'র অন্তর্গত স্বপ্নদর্শন নামক প্রবন্ধত্রয় (বিদ্যাবিষয়ক, কীর্তিবিষয়ক ও ন্যায়-বিষয়ক) পাঠ করিয়া দেখিবেন। Vision of Mirza নামক বিখ্যাত প্রবন্ধ হইতে লেখক এই তিনটি প্রবন্ধ-রচনার প্রেরণা লাভ করিলেও এগুলি একরূপ নূতন সৃষ্টি। 'স্বপ্নদর্শন—ন্যায়বিষয়ক' প্রবন্ধে লেখক যে 'স্যাটায়ার' জাতীয় হাস্যরস পরিবেশন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ভূয়োদর্শন ও সংস্কার-স্পৃহার পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু অক্ষয়কুমার জ্ঞান-তাপস হইলেও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার মোহ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই, তাই তিনি ভারতীয় সাধনার মর্ম-মূলে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারেন নাই। ভারতীর স্মৃতি, দর্শন ও জ্যোতিঃশাস্ত্রের প্রতি তিনি সুবিচার করেন নাই, তন্ত্রশাস্ত্র ও

পুরাণের আলোচনায়ও সমন্বয়ী দৃষ্টির পরিচয় দিতে পারেন নাই। মনীষী রজনীকান্ত যথার্থই লিখিয়াছেন—'অক্ষয়কুমার জনসনের ন্যায় অনেক সময়ে আত্মমতের নির্ধারণ করিতেন। ব্যবহারাজীব যেমন একতর পক্ষকে সর্ববিষয়ে সঙ্গত বলিয়া মনে করেন, সাহিত্য-ক্ষেত্রে তিনিও সেইরূপ একতর বিষয়কে সর্ববিধিসম্মত বলিয়া মনে করিতেন। জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা সমাধান করিবার জন্য কতিপয় স্বীকার্য প্রতিজ্ঞা আছে। এইগুলি কিরূপে স্বীকৃত হইল, জ্যামিতি তাহার কোন কারণ নির্দেশ করে না। অক্ষয়কুমারের অনেকগুলি মত এইরূপ স্বীকৃত বিষয়ের মধ্যে পরিগণিত ছিল। অক্ষয়কুমার বলিতেন, হিন্দুর স্মৃতি ও দর্শনশাস্ত্র অসার এবং হিন্দু দার্শনিকগণ ঘোরতর বিতণ্ডাবাদী। * তাঁহার ধারণা ছিল যে, পুরাণ যখন পৃথিবীকে ত্রিকোণাকার ও অচলা বলিয়া নির্দেশ করে, (?) তখন হিন্দুর জ্যোতিষশাস্ত্রের কোন ভিত্তি নাই। * স্মৃতিশাস্ত্র যে অসামান্য অভিজ্ঞতার ফল; সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্র যে পৃথিবীর যাবতীয় দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে প্রধান; তিনি তাহার অনুধাবন করিতেন না।* তিনি যে ভাবে পাশ্চাত্ত্য শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়াছেন; যদি সেই ভাবে সংস্কৃতের আলোচনা করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহার ধারণা অন্যরূপ হইত।* তাঁহার মস্তিষ্কের যেরূপ ক্ষমতা ছিল, তিনি যদি সেইরূপ সমান মনোযোগের সহিত উভয় দেশের গ্রন্থগুলির আলোচনা করিতেন; জোন্স্ বা উইল্সন, বর্ণুফ বা লাসেন যদি সমুদয় স্থলে তাঁহার পথ-প্রদর্শক না হইতেন, তাহা হইলে তদ্দ্বারা অনেক দুর্জ্ঞেয় ও দুরূহ তত্ত্বের সুমীমাংসা হইত। [প্রতিভা, ১৭শ সংস্করণ, পৃঃ ৬১]

অবশ্য, এ কথা সত্য যে অক্ষয়কুমার ভারতীয় সাধনার যথার্থ প্রতিনিধি না হইলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর ভাবধারার অন্যতম প্রতিনিধি। নানা শাস্ত্রে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ও অপূর্ব মনীষার

কথা যতই চিন্তা করা যায় ততই বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণ-কামনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া যিনি বঙ্গবাণীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, যিনি বাংলা সাহিত্যকে শব্দৈশ্বর্যে পরিপুষ্ট ও ভাব-সম্পদে সমৃদ্ধ করিয়া কৌলীন্যমর্যাদা দান করিয়াছিলেন, তিনি যে বাঙ্গালীমাত্রেরই স্মরণীয় ও বরণীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এ যুগের শিক্ষাভিমানী বাঙ্গালী পূর্বসূরিগণের দানের উপযুক্ত মর্যাদাদানে কুণ্ঠিত, তাই উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম যুগন্ধর পুরুষ অক্ষয়কুমারের কীর্তি-কথা তাহারা আর স্মরণ করে না। বিগত শতাব্দীর মনস্বী চিন্তানায়কদের কীর্তির অনুধ্যানেও বোধ হয় আমাদের আর অধিকার নাই। তাই রামমোহন-অক্ষয়কুমার-ভূদেবের রচনাবলী এ যুগের বাঙ্গালীর নিকট উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত। ইহা কি অগ্রগতির লক্ষণ, না চিন্তার দৈন্য—কে তাহরে উত্তর দিবে ?

বিদ্যাসাগরের অন্তর্জীবন ও সাহিত্য-সাধনা

(১৮২০—১৮৯১)

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম সাক্ষাতের কাহিনী শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম দর্শনেই শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরকে বলিয়াছিলেন—

'আজ সাগরে এসে মিল্‌লাম। এতদিন খাল বিল হ্রদ নদী দেখেছি; এইবার সাগর দেখ্‌ছি'।

ইহা শুনিয়া বিদ্যাসাগর বলিয়াছিলেন—

'তবে লোনা জল খানিকটা নিয়ে নিন'।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—

'না গো? লোনা জল কেন? তুমি ত অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর। তুমি ক্ষীরসমুদ্র।'

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিদ্যাসাগরের এই কথাবার্তার মধ্য দিয়া উভয়েরই পরিহাস- রসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এই রসিকতার অন্তরালে গভীর সত্য রহিয়াছে। রামকৃষ্ণ যখন বিদ্যাসাগরকে সাগরের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন, তখন তিনি তাঁহার বিরাটত্ব, দুর্জ্ঞেয়ত্ব ও অনন্যসাধারণত্বের কথাই বলিয়াছেন। আর যখন তিনি বিদ্যাসাগরকে বিদ্যার সাগর ও ক্ষীরসমুদ্র বলিয়াছেন, তখন তিনি বিদ্যাসাগরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিকেই ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি বলিতে চাহিয়াছেন, বিদ্যাসাগরের অক্লান্ত কর্মসাধনার মূলে ছিল তাঁহার দয়া ও স্বদেশবাসীর কল্যাণ-সাধনের আকাঙ্ক্ষা। এই দয়া ও পরোপচিকীর্ষা সত্ত্বগুণেরই বিশেষ প্রকাশ, সুতরাং ইহা পরিণামে মানুষকে চরম লক্ষ্যের দিকে পৌঁছাইয়া দেয়। বিদ্যাসাগর পরিহাসচ্ছলে শ্রীরামকৃষ্ণকে যে 'লোনা জলের' কথা বলিয়াছেন উহাতে আমরা বিদ্যাসাগরের বুদ্ধির বিদ্যুদ্দীপ্তির প্রকাশ দেখিতে

পাই, কিন্তু হয়তো তাঁহার এই উক্তির মধ্যেও এমন গভীর সত্য রহিয়াছে যে সে সম্পর্কে বিদ্যাসাগর নিজেও সচেতন ছিলেন না। কিন্তু সে সম্পর্কে কিছু বলিবার পূর্বে প্রথমেই বিদ্যাসাগরের অন্তর্জীবন সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনার প্রয়োজন। অক্লান্তকর্মা পুরুষ বিদ্যাসাগরের মধ্যে যে বিরুদ্ধ গুণের সমন্বয় ঘটিয়াছিল, তাহার কারণ নির্ণয় করা তত দুরূহ নহে, কিন্তু তিনি যে বেদান্ত, ন্যায়, জ্যোতিঃশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার চিন্তাধারাকে কতটুকু প্রভাবিত করিয়াছিল এবং তাহার মূলেই বা কি কারণ বিদ্যমান ছিল, তিনি কোন্ জীবন-দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন এবং অধ্যাত্ম জগৎ সম্পর্কে তাঁহার যথার্থ প্রত্যয় কি ছিল—এই সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তত সহজ নয়। বিদ্যাসাগরের এই অন্তর্জীবনের পরিচয় তাঁহার সাহিত্যের মধ্যে কোথাও নাই। ধর্ম-সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের নীরবতাও তাঁহার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁহার কথাবার্তায়ও, 'কিছু বোঝা গেল না' এই ভাবটিই প্রকাশ পাইত। আমরা আজ বিদ্যাসাগরের অন্তর্জীবন-সম্বন্ধে এবং যুগ-মন তাঁহার মধ্যে কতখানি প্রতিফলিত হইয়াছিল, সে সম্পর্কে আলোচনা করিব, বিদ্যাসাগরের সাহিত্য-সাধনার মধ্যে মানুষ বিদ্যাসাগরের কতখানি পরিচয় আছে, সে কথারও মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব।

এক হিসাবে, পৃথিবীর প্রত্যেক লোকোত্তর পুরুষকেই আমরা সাগরের সঙ্গে তুলনা করিতে পারি। কিন্তু বিদ্যাসাগরকে শ্রীরামকৃষ্ণ যে খাল বিল হ্রদ নদী হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিয়াছেন, তাহার বিশেষ তাৎপর্য আছে। যাঁহার মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর বিরুদ্ধ ভাবধারা সংহত হইয়াছিল—যিনি শ্রেষ্ঠ কর্মবীর এবং 'বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী', সমাজ-সংস্কারে ও শিক্ষাবিস্তারে যিনি আপনার শক্তিকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন এবং লোক-কল্যাণের

মধ্যে যিনি জীবনের চরম সার্থকতা খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন—সেই বিদ্যাসাগর আমাদের নিকট সাগরের মতই অতলস্পর্শ রহিয়া গেলেন। বোধ হয়, বিদ্যাসাগরের বিরাট হৃদয়তলে একটা বিক্ষোভের ঘূর্ণ্যাবর্তের সৃষ্টি হইয়াছিল। বিদ্যাসাগরের বিরাট মনীষা যে নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল, তাঁহার পরদুঃখ-বিগলিত হৃদয় তাঁহাকে করুণাময় বলিয়া স্বীকার করিতে পারে নাই; 'স্যার জন লরেন্স' নামক অর্ণবযান জলমগ্ন হইলে তিনি পরম ক্ষোভে ও অভিমানে বলিয়াছিলেন—'দুনিয়ার মালিক কি আমাদের চেয়ে নিষ্ঠুর যে নানা দেশের নানা স্থানের অসংখ্য লোককে একত্র ডুবাইলেন! আমি যাহা পারি না, তিনি পরম কারুণিক মঙ্গলালয় হইয়া কেমন করিয়া এই সাতশত আটশত লোককে একত্র এক সময়ে ডুবাইয়া ঘরে ঘরে শোকের আগুন জ্বালিয়া দিলেন? দুনিয়ার মালিকের কি এই কাজ! এই সকল দেখিলে কেহ মালিক আছে বলিয়া সহসা বোধ হয় না' (৺চণ্ডীচরণ-কৃত বিদ্যাসাগর, পৃঃ ৫৪১)। একদিকে কর্মযোগী বিদ্যাসাগর, গীতার আদর্শকে শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, * অপর দিকে বিদ্রোহী বিদ্যাসাগর অকুণ্ঠ চিত্তে শিক্ষাপরিষদের নিকট লিখিতেছেন—'সাংখ্য ও বেদান্ত যে ভ্রান্ত দর্শন, এ সম্বন্ধে এখন আর মতদ্বৈধ নাই।' কি প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয় একথা লিখিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গে" এবং সাহিত্যসাধক চরিত-মালার অষ্টাদশ সংখ্যক পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে। বিদ্যাসাগরের যে বিদ্রোহী মূর্তি শিক্ষাপরিষদের নিকট লিখিত পত্রে প্রকটিত হইয়া-ছিল, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। বিদ্যাসাগর বলিয়াছিলেন—"আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বিশ্বাস যে আর্যঋষিগণ সর্বজ্ঞ

* রামকৃষ্ণ-কথামৃত দ্রষ্টব্য।

এবং তাহাদের মস্তিষ্ক হইতে যাহা প্রসূত হইয়াছে, তাহাতে বিন্দুমাত্র ভ্রমপ্রমাদ থাকিতে পারে না"। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিভঙ্গি বৈজ্ঞানিক ছিল বলিয়াই তিনি আর্য ঋষিগণকে সর্বজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন—'আমি বার্কলের দর্শন আমার কলেজে শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্গত করি নাই, কারণ, উহাতে ছাত্রগণের কুসংস্কার দূরীভূত না হইয়া বরং আরও বদ্ধমূল হইবে; যেহেতু তাহারা একজন প্রতীচ্য পণ্ডিতের মুখে বেদান্তের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইবে'। বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্র বাবু বলিতেছেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্যবহারিক জীবনে উপযোগিতার দিক্ হইতে সকল বিষয়ের মূল্য নিধারণ করিতেন। এ বিষয়ে রামমোহনের মধ্যে যে উদারতা দেখা যায়, বিদ্যাসাগরে তাহা ছিল না।

তথাপি মনে হয়, বিদ্যাসাগর সম্পূর্ণরূপে সংস্কার-মুক্ত হইতে পারেন নাই, অথবা তিনি অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন বলিয়াই ঈশ্বর, পরকাল প্রভৃতি সম্বন্ধে সকল মতবাদই তাঁহার নিকট সমান ভাবে হেয় বা উপাদেয় ছিল। তাই 'প্রভাবতী-সম্ভাষণ' নামক পুস্তিকার উপসংহারে বিদ্যাসাগর বলিতেছেন—'যদি তুমি পুনরায় নরলোকে আবির্ভূত হও, দোহাই ধর্মের এইটি করিও, যাঁহারা তোমার স্নেহপাশে বদ্ধ হইবেন, যেন তাঁহাদিগকে, আমাদের মত দুঃসহ শোকদহনে দগ্ধ হইয়া যাবজ্জীবন যাতনাভোগ করিতে না হয়'। কিন্তু বিদ্যাসাগর কি সত্যই জন্মান্তরে বিশ্বাসী ছিলেন?

আবার এদিকে যে বিদ্যাসাগর অখিলদ্দিন ফকিরের গান শুনিয়া অবিরল ধারে অশ্রু বিসর্জন করেন, সে বিদ্যাসাগর বিশিষ্টরূপে বাঙালী। ফকির অখিলদ্দিন যখন গান ধরিতেন—

'কোথায় ভুলে রয়েছ ও নিরঞ্জন নিল্লয়
কর্বে রে কে,

তুমি কোন্ খানে খাও কোথায় থাক রে
মন অটল হয়ে
কোথায় ভুলে রয়েছ—
তুমি আপনি নৌকা আপনি নদী,
আপনি দাঁড়ি আপনি মাঝি,
আপনি হওরে চড়নদারজী,
আপনি হওরে নায়ের কাছি
আপনি হও যে হাইল বৈঠা'

তখন বিদ্যাসাগর ভাবের কোন্ অতল সাগরে ডুবিয়া যাইতেন, কোন্ প্রত্নতত্ত্ববিদ তাহার সন্ধান পাইবে ? বিদ্যাসাগরের চরিতকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিদ্যাসাগরের ধর্মমত' সম্পর্কে বলিতেছেন—

'এক অনাদি অনন্ত পুরুষ স্রষ্টারূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র পূর্ণরূপে পরিব্যাপ্ত ও প্রকাশিত রহিয়াছেন, তাঁহারই মঙ্গল নিয়মে বিশ্বরাজ্য নিয়মিত ; জীবসকল তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়া তাঁহাতেই স্থিতি করিতেছে, আবার কাল পূর্ণ হইলে তাঁহাতেই প্রবিষ্ট হইতেছে, মহাভারতকার মহর্ষি ব্যাস কর্তৃক অভিব্যক্ত এই সূক্ষ্মতম ধর্মসূত্রে বিশ্বাস করিতেন। * * * তিনি নিজে আমাদের নিকট বলিয়াছেন যে, 'নানাপ্রকার মতভেদ-নিবন্ধন যখন অপ্রিয় সঙ্ঘটন হইতে লাগিল, তখন আর সেই সকল গোলযোগের মধ্যে থাকিয়া অশান্তি বৃদ্ধি করিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না। ব্যক্তিগত মত-ভিন্নতার অত্যধিক প্রবলতা দেখিয়া আমি আস্তে আস্তে বিদায় লইলাম। এ দুনিয়ার একজন মালিক আছেন তা বেশ বুঝি, তবে ঐ পথে না চলিয়া এ পথে চলিলে নিশ্চয় তাঁহার প্রিয়পাত্র হইব, স্বর্গরাজ্য অধিকার করিব, এ সকল বুঝিও না, আর লোককে তাহা বুঝাইবার চেষ্টাও করি না। লোককে বুঝিয়ে শেষটা কি ফ্যাসাদে পড়ে যাব ? একে তো নিজে কত শত অন্যায় কাজ করিয়া নিজের

পাপের বোঝা ভারী করিয়া রাখিতেছি, আবার অন্যকে পথ দেখাইতে গিয়া তাকে বিপথে চালাইয়া কে শেষটা পরের জন্য বেত খাইয়া মরিবে? নিজের জন্য যাই হোক, পরের জন্য বেত খেতে পারবো না বাপু। এ কার্য আমাকে দিয়ে হবে না। নিজে যেমন বুঝি সেই পথে চলিতে চেষ্টা করি, পীড়াপীড়ি দেখিলে বলিব 'এর বেশী বুঝিতে পারি নাই'।*

বিদ্যাসাগর ও বোধোদয়

'বোধোদয়ে' বিদ্যাসাগর লিখিয়াছেন—'স্বপ্ন সকল অমূলক চিন্তামাত্র'। বিদ্যাসাগরের এই উক্তির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে তিনি প্রাচ্য দর্শন অপেক্ষা প্রতীচ্য দর্শন বা বিজ্ঞানের অধিকতর পক্ষপাতী ছিলেন। আধুনিক মনোবিজ্ঞান একথা স্বীকার করিয়াছেন যে, স্বপ্ন অমূলক চিন্তামাত্র নয়, মানুষের অসংবিদে যে কামনাপুঞ্জ লুক্কায়িত রহিয়াছে নিদ্রিতাবস্থায় সেই কামনাপুঞ্জ সোজাসুজি বা বিকৃতভাবে চেতনার স্তরে ভাসিয়া আসে, তাহাকেই আমরা বলি স্বপ্ন। ফ্রয়েড্ বলিয়াছেন—Dreams are the via regia to the Unconscious. বিদ্যাসাগর যে সময় 'বোধোদয়' রচনা করিয়াছিলেন, সে সময়ে প্রতীচ্য মনোবিজ্ঞানের এই তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু প্রাচীন আর্য ঋষিগণ বহুযুগ পূর্বেই স্বপ্ন সম্বন্ধে যে সকল মীমাংসায় উপনীত হইয়াছিলেন, নব্য মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে তাহার আশ্চর্য সুসঙ্গতি আছে। তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন,—বাসনাময় সূক্ষ্মশরীরই স্বপ্নের কারণ। স্বপ্নাবস্থায় মন সূক্ষ্মশরীরে এবং সুষুপ্তির অবস্থায় কারণশরীরে অবস্থান করে। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে এ সকল তথ্য অবগত ছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে কিন্তু এ সকল সিদ্ধান্তে

*এ প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ-কথামৃত দ্রষ্টব্য।

তাঁহার তেমন আস্থা ছিল না। কেহ কেহ বলিতে পারেন—তিনি শিশুদের জন্য সাহিত্য-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাই জটিল দার্শনিক তত্ত্ব পুস্তকে সন্নিবেশিত করেন নাই। একথা কিন্তু আমরা স্বীকার করি না। বিদ্যাসাগর যদি পাশ্চাত্ত্য মতবাদে স্বয়ং বিশ্বাসী না হইতেন, তবে বোধোদয়ে এরূপ কথা কখনও লিপিবদ্ধ করিতেন না। অথবা হয়ত প্রখর কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন কর্মযোগী বিদ্যাসাগরের নিকট স্বপ্ন সকল অমূলক চিন্তামাত্রই ছিল।

বিদ্যাসাগর ও ঋগ্বেদ-সংহিতা

রাজা রামমোহনই সর্বপ্রথম বিরুদ্ধ দার্শনিক মতসমূহের মধ্যে সমন্বয়সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। এ সমন্বয় মাধুকরী বৃত্তি বা Ecclecticism নয়। ইহা যুক্তিবাদী জিজ্ঞাসুর সমন্বয়; ইহাতে গ্রহণ আছে, বর্জনও আছে, আবার আপাত-বিরোধী বাক্যসমূহের মধ্যে ঐক্যসূত্র আবিষ্কারেরও প্রয়াস আছে। রাজা রামমোহন শুধু উপনিষদের প্রমাণের উপরই তাঁহার সিদ্ধান্তসমূহ স্থাপন করেন নাই, হিন্দুগণের বিরাট শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া রত্ন উদ্ধারের প্রয়াস পাইয়াছেন। তবে তাঁহার দৃষ্টিও কতকটা পক্ষপাতযুক্ত ছিল বলিয়া ভারতীয় সাধনার সমগ্র রূপটি তিনি ধরিতে পারেন নাই। রামমোহন যদি আধুনিক বাংলার সর্বপ্রথম সমন্বয়ের আচার্য, তবে বিদ্যাসাগর ছিলেন বিদ্রোহের তেজোঘন মূর্তি। অনাচার, অত্যাচার, অবিচার, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথা বলিতেছি না, ভণ্ড আর্যামির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথাও বলিতেছি না, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে সর্বপ্রকার বিচার-মূঢ়তার বিরুদ্ধে যুগ-মানসে যে বিদ্রোহের বহ্নি সন্ধুক্ষিত হইয়া উঠিয়াছিল, এ সেই বিদ্রোহ। অথচ, বিদ্যাসাগরের গ্রন্থাবলীর মধ্যে কোথাও এই বিদ্রোহ তেমন প্রকট হইয়া উঠে নাই। যে বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা

এবং বহু বিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছিলেন, সে বিদ্যাসাগর পণ্ডিত কিন্তু বিদ্রোহী নহেন। আমাদের দেশে যে লোকাচারই ধর্মের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং দেশাচারের সম্মুখে যে শাস্ত্রীয় বচন বা প্রবল যুক্তিও অগ্রাহ্য হইয়া যায়, এই প্রত্যক্ষ সত্যটাও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র 'ঠেকিয়া শিখিয়াছিলেন,' এবং সেই সময়ে আমরা বিদ্যাসাগরের তেজোদৃপ্ত মূর্তিখানি দেখিয়াছি, আমরা তাঁহার সেই সিংহগর্জন শুনিয়াছি—'আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি।' কিন্তু যে আর্য বচনের প্রামাণিকতার উপর বিদ্যাসাগর সমাজ-সংস্কারে ব্রতী হইয়াছিলেন, সেই ঋষিবাক্যে তাঁহার কিরূপ শ্রদ্ধা ছিল? বিদ্যাসাগরের সমগ্র জীবন ইহার উত্তর দিবে। বাংলার একজন মনীষী বলিয়াছেন—'রাজা রামমোহনের ন্যায় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও সমাজ-সংস্কারে শাস্ত্র ও যুক্তির সমন্বয়সাধনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজা রামমোহনের নিকট ঋষিবাক্যের যে মূল্য ছিল, বিদ্যাসাগরের নিকট তাহা ছিল না। বিদ্যাসাগরের জীবনী আলোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, বিদ্যাসাগর ছিলেন যথার্থ Pragmatist, তাঁহার দর্শনের নাম জীবনবাদ, পরলোকের অপেক্ষা ব্যবহারিক জীবনকেই তিনি বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন। বালক-পাঠ্য বোধোদয়ে তিনি যে ঈশ্বর-বিষয়ক একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ সংযোজিত করিয়াছিলেন, তাহাও হয়তো স্বতঃ-প্রণোদিত হইয়া নয়, বন্ধুজনের অনুরোধে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরলোকগমনের পর বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় একটি নাতি-দীর্ঘ প্রবন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছেন। [নব্যভারত, ১২৯৮, ভাদ্র]। রমেশচন্দ্র বলিয়াছেন—আমাদের দেশের ধর্ম-ধ্বজী মিথ্যাচারী আচার-সর্বস্ব আর্য্যত্বাভিমানী ব্রাহ্মণ

পণ্ডিতগণের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তুলনা করিলে তাঁহার একটি বিশিষ্টতা চোখে পড়ে। বিদ্যাসাগর মহাশয় যথার্থ ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন, ধর্মধ্বজী ছিলেন না। আমি যখন ঋগ্বেদ-সংহিতার অনুবাদে প্রবৃত্ত, তখন আমি প্রায়ই তাঁহার নিকট গমন করিতাম, তাঁহার মহামূল্য গ্রন্থাগার হইতে সাহায্য গ্রহণ করিতাম। তিনি তখন রোগশয্যায় শয়ান, তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, তথাপি তিনি সর্বদা আমায় উৎসাহ প্রদান করিতেন। তিনি আমায় বলিতেন,—অতি উত্তম কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ, যদি আমার স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিত, তাহা হইলে আমি যথাশক্তি তোমার এই মহৎ কার্যে সহায়তা করিতাম। আমি বেদের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এই সংবাদে যখন ধর্মধ্বজী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের দল তারস্বরে 'ধর্ম গেল' বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে একজন যথার্থ ধার্মিক ব্যক্তি আমায় সর্বদা উৎসাহ-দানে কৃতজ্ঞতা-পাশে বাঁধিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদকে অতি উত্তম কার্য বলিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই উক্তি তাঁহার ধর্ম-বিশ্বাসের উপর কোন আলোকসম্পাত করে কিনা পাঠক তাহার বিচার করিবেন। রামমোহনের প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটি উক্তিও এখানে আমাদের স্মরণ হয়। এই প্রসঙ্গে তিনি বেদ-প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মের উপাসনাকে যথার্থ হিন্দুধর্ম বলিয়াছেন। ঋগ্বেদ-সংহিতায় এই পরব্রহ্মকেই 'অসুর' শব্দে নির্দেশ করা হইয়াছে। 'মহৎ দেবানাম্ অসুরত্বমেকম্'। বাস্তবিক ঋগ্বেদের পুরুষ-সূক্তে যে বিরাট পুরুষের পরিকল্পনা আছে, (যজুর্বেদের রুদ্রাধ্যায়ও' তুলনীয়), সেই বিরাট পুরুষই পরে ঋষিগণের নিকট পরব্রহ্মরূপে প্রতিভাত হইয়াছেন। তিনিই নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ, ঋষিগণ তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

'অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্'।

আমার মনে হয়, মনীষী বিদ্যাসাগর এই মহান্ পুরুষকে স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু দয়ার অবতার বিদ্যাসাগর ঈশ্বর, পরলোক প্রভৃতি দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের আলোচনায় মস্তিষ্কের অপব্যবহার করেন নাই। হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুয়িটি ফণ্ডের সঙ্গে সংশ্রব ত্যাগ করিয়া বিদ্যাসাগর পরিচালক-মণ্ডলীর নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ঈশ্বরের নিকট মানুষের দায়িত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"ফণ্ডের সহিত আর সংযুক্ত থাকিলে ভবিষ্যতে আমাকে দুর্নামের ভাগী হইতে হইবে এবং ঈশ্বরের কাছেও জবাবদিহি করিতে হইবে।

[সাহিত্য-সাধক চরিতমালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৯]

কর্মযোগ, না সাত্ত্বিক কর্ম ?

বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আমরা কর্মযোগী বলিয়াছি, কিন্তু গীতায় শ্রীভগবান যে কর্মযোগের আদর্শে অর্জুনকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, সে আদর্শে বিদ্যাসাগর অনুপ্রাণিত হন নাই। তাঁহার বহুমুখী কর্ম-প্রচেষ্টার মূল উৎস ছিল—মানবতার জন্য বেদনা-বোধ। বিদ্যাসাগরের কর্মযোগের আদর্শ ছিল—দম্যতাম্, দয়স্ব, দদস্ব, (দান্ত হও, দয়ালু হও, দানশীল হও)। বিদ্যাসাগরের দয়া যে শুধু জাতি ও সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র সীমাকে অতিক্রম করিয়াই প্রবাহিত হইত, তাহা নহে, মানবেতর প্রাণীর মূক ব্যথায়ও বিদ্যাসাগরের হৃদয় বিগলিত হইত। বাস্তবিকই—

'His pity gave ere charity began'

সুতরাং বিদ্যাসাগর যথার্থ কর্মযোগের আদর্শ নহেন, সাত্ত্বিক কর্মের আদর্শ। তিনি ত্রিগুণাত্মিকা মায়াকে অতিক্রম করিবার সাধনা করেন নাই। মানুষের দুঃখদৈন্য তাঁহার নিকট চরম সত্য ছিল। দার্শনিক-প্রবর ইম্যানুয়েল ক্যাণ্ট (Immanuel Kant) কর্মের যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, সে আদর্শের দ্বারা বিদ্যাসাগরের জীবনব্যাপী কর্মসাধনার বিচার করিলে চলিবে না। ক্যাণ্টের মতে অনাসক্ত ও ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া, আত্মসুখের বা পরের দুঃখ-মোচনের চিন্তাকে বিসর্জন দিয়া কর্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। কেবল কর্তব্যবুদ্ধিই আমাদের কর্ম-সমূহের নিয়ামক হইবে, হৃদয়বৃত্তি নয়। কিন্তু বিদ্যাসাগরকে এই শুষ্ক চারিত্রনীতির দ্বারা বিচার করা যায় না ; কেন না, তাঁহার নিকট কোন নীতি বা দার্শনিক সিদ্ধান্তই মানুষের চেয়ে বড় হইয়া দেখা দেয় নাই। মনীষী ক্যাণ্ট নিয়মকে বড় করিয়া দেখিয়াছেন আর মহাপ্রাণ ঈশ্বরচন্দ্র মানুষের জীবনটাকে বড় করিয়া দেখিয়াছেন।

আমাদের শাস্ত্রের অভিমত এই—পুণ্যলোভাতুর হইয়া বা স্বর্গলাভের আকাঙ্ক্ষায় মানুষ যে কর্মের অনুষ্ঠান করে তাহা রাজস কর্ম, কিন্তু তাহার হৃদয় যখন পরদুঃখে বিগলিত হয়, তখন সে যে কর্মের অনুষ্ঠান করে, তাহা সাত্ত্বিক কর্ম। বিদ্যাসাগর এই সাত্ত্বিক কর্মেরই অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট স্বর্গ, পরলোক প্রভৃতি কথার বিশেষ কোন মূল্য ছিল না, মানুষের বাস্তব জীবনই তাঁহার নিকট ছিল চরম সত্য।

বিদ্যাসাগর ও হিন্দুধর্মের নব অভ্যুত্থান

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে হিন্দু ধর্মের যে নবজাগরণ দেখা দেয়, বঙ্কিমচন্দ্র যাহার দার্শনিক, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র যাহার কবি, ভূদেব, কালীপ্রসন্ন ও চন্দ্রনাথ যাহার নিবন্ধকার, সেই জাগরণে

বিদ্যাসাগরের স্থান কোথায়? পূর্বে বলিয়াছি, রাজা রামমোহন সর্বপ্রথম উপনিষদ ও বেদান্ত-সূত্রের প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন এবং শাস্ত্রসমূহের মধ্যে সমন্বয়-সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। উত্তর কালে বিবেকানন্দ সমগ্র জগতের সমক্ষে বেদান্তের ভেরীনিনাদ করেন। কিন্তু এই নবজাগরণে বিদ্যাসাগরের যে দান রহিয়াছে, তাহা সহজে চোখে পড়ে না। যে বিদ্যাসাগর 'শকুন্তলা' বা 'সীতার বনবাসের' রচয়িতা, আমরা সে বিদ্যাসাগরের কথা বলিতেছি না, যে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত বিদ্যার মণি-মঞ্জুষা জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত করেন এবং যিনি উপক্রমণিকা, ব্যাকরণ-কৌমুদী প্রভৃতি রচনা করিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণের বিভীষিকা হইতে বাঙ্গালী জাতিকে মুক্ত করেন, আমরা সেই বিদ্যাসাগরের কথা বলিতেছি। বস্তুতঃ, বিদ্যাসাগর যদি সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞানলাভের পথ এমন সুগম না করিতেন, তাহা হইলে হিন্দু শাস্ত্রের আলোচনা আমাদের দেশে এত দ্রুত প্রসার লাভ করিতে পারিত না। সুতরাং, যদিও এই জাগরণে বিদ্যাসাগর পরোক্ষভাবেই সহায়তা করিয়াছেন, প্রত্যক্ষ-ভাবে নয়, তথাপি ইহার পশ্চাতে যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনলস হস্তের দান রহিয়াছে, একথা অস্বীকার করা চলে না।

বিদ্যাসাগর ও বেদান্ত

বাংলা ভাষার মধ্য দিয়া বেদান্তের প্রচার রাজা রামমোহনের জীবনের অন্যতম ব্রত ছিল। অবশ্য, পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষ সমর্থন করিয়া রাজা রামমোহন যে দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, বেদান্তের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা আমাদের জীবনে কোন কল্যাণ সাধন করিবে না। কিন্তু বেদান্ত-সূত্র এবং শাঙ্কর-ভাষ্য রাজা রামমোহনকে যে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। বিদ্যাসাগর কিন্তু বেদান্তকে ভ্রান্ত দর্শন বলিয়াই

মনে করিয়াছেন। অবশ্য বেদান্ত সম্পর্কেও বিদ্যাসাগরের মত পরে পরিবর্তিত হইয়াছিল এরূপ মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। যে বিদ্যাসাগর শিক্ষাপরিষদের নিকট লিখিয়াছিলেন—

"That the Vedanta and Samkhya are false systems of Philosophy is no more a matter of dispute.'*

তিনিই ছোট লাটের নিকট ১৮৫৯ সালের ১৭ই এপ্রিল তারিখে লিখিতেছেন—

'কাওয়েল সাহেব কলেজে স্মৃতি ও বেদান্তের পাঠ বন্ধ করিতে চাহেন। দুঃখের বিষয়, এ বিষয়ে তাঁহার সহিত আমার মত মেলে না। আমার মনে হয়, এই বিষয়গুলিতে আপত্তি থাকে না। ভারতবর্ষে প্রচলিত দর্শনসমূহের মধ্যে বেদান্ত অন্যতম। ইহা অধ্যাত্মতত্ত্ব-সম্বন্ধীয়। কলেজে ইহার অধ্যাপনা বিষয়ে কোন যুক্তি-সঙ্গত আপত্তি থাকিতে পারে, ইহা আমি মনে করি না। * * * আমার বিনীত মত এই যে, এ সকলের অধ্যাপনা বন্ধ করিলে কলেজের পাঠ্য-বিষয় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।' [সাহিত্য-সাধক চরিতমালা, ১৮ সংখ্যা, পৃঃ ৮৯]

কিন্তু রামকৃষ্ণ-কথামৃতের তৃতীয় ভাগে দেখিতে পাই,—বিদ্যাসাগরের মতে ভারতীয় দার্শনিকগণ যাহা বলিতে চাহিতেছেন, তাহা নিজেরাই ভালরূপে বুঝিতে পারেন নাই। 'মানুষের কর্তব্য কি', ইহার উত্তরে তিনি বলিতেছেন—

'আমাদের নিজেদের এরূপ হওয়া উচিত যে সকলে যদি সেরূপ হয়, পৃথিবী স্বর্গ হয়ে পড়বে। প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত, যাহাতে জগতের মঙ্গল হয়।'

এ দৃষ্টিভঙ্গী অবশ্য সম্পূর্ণ ভারতীয় নয়, ইহা মূলতঃ পাশ্চাত্যেরই দৃষ্টিভঙ্গী। বিদ্যাসাগর যে বেদান্তদর্শনের দিকে কোনদিন বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছেন, তাহার কিন্তু প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু

তিনি যে বেদান্তদর্শনের পঠন-পাঠনের প্রায়োজনীয়তা স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করিয়াছেন, ইহাতে মনে হয় বেদান্ত-সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের মতবাদের কথঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটিয়াছিল।

বিদ্যাসাগর ও প্রত্যক্ষবাদ

বিদ্যাসাগর জীবন ও জগৎকে মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন নাই। জগতের পুঞ্জীভূত প্রত্যক্ষ দুঃখ তাঁহার নিকট অপ্রত্যক্ষ আত্মা বা ঈশ্বরের চেয়ে অধিকতর সত্য ছিল। ইহাই বিদ্যাসাগরের প্রত্যক্ষবাদ, ইহার সহিত ভোগবাদের কোন সম্পর্ক নাই। অবশ্য, সংসারের ঘাত-প্রতিঘাত ও মানুষের সীমাহীন অকৃতজ্ঞতা বিদ্যাসাগরকে অনেকটা পরিমাণে নৈরাশ্যবাদী করিয়া তুলিয়াছিল। 'প্রভাবতী-সম্ভাষণে' এই নৈরাশ্যবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। শিশু প্রভাবতীকে সম্বোধন করিয়া বিদ্যাসাগর লিখিতেছেন—

"তুমি স্বল্প কালে নরলোক হইতে অপসৃত হইয়া আমার বোধে অতি সুবোধের কার্য করিয়াছ। অধিক কাল থাকিলে, আর কি অধিক সুখভোগ করিতে; হয়ত, অদৃষ্টবৈগুণ্যবশতঃ, অশেষবিধ যাতনা-ভোগের একশেষ ঘটিত। সংসার যেরূপ বিরুদ্ধ স্থান, তাহাতে, তুমি দীর্ঘজীবিনী হইলে, কখনই সুখে ও স্বচ্ছন্দে জীবন-যাত্রার সমাধান করিতে পারিতে না।"

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগরের এই নৈরাশ্য বৃদ্ধি পাইতেছিল। যদি মানব-চরিত্র সম্পর্কে তাঁহার খুব উচ্চ ধারণা না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার জীবন পরিণামে এমন তিক্ততায় পূর্ণ হইয়া উঠিত না। জগৎ-কর্তার মঙ্গলময় বিধানে প্রত্যয়শীলতার অভাবও বিদ্যাসাগরের চরিত্রের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। কিন্তু বিদ্যাসাগরকে যদি সাগরের সঙ্গে তুলনা দেওয়া যায়, তবে তাঁহার

মধ্যে যে পুঞ্জীভূত বেদনা সঞ্চিত ছিল, উহাই হয়তো সেই লোনা জল, যে লোনা জলের কথা বিদ্যাসাগর শ্রীরামকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগরের পৌরুষকে কবি সত্যেন্দ্রনাথ সাগরগর্ভস্থ অগ্নি বা বাড়বানলের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

'সাগরে যে অগ্নি থাকে, কল্পনা সে নয়,
তোমায় দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয়।'

আর আমরা বলি, বিদ্যাসাগর যে অমূল্য গ্রন্থাবলী আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, উহা সেই সাগরোদ্ভূত মণিমুক্তা।

সাহিত্য-শিল্পী বিদ্যাসাগর ও মানুষ বিদ্যাসাগর

সহজ শিল্পবুদ্ধি লইয়া বিদ্যাসাগর বাংলা সাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার রচনায় আমরা শব্দচয়ন-নৈপুণ্য ও মাত্রাজ্ঞানের পরিচয় পাই কিন্তু যে বিদ্যাসাগর ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রতিনিধি, যাঁহার মনের সংস্কার-মুক্তি এ যুগের প্রগতিবাদী তরুণের চোখেও বিস্ময়কর, সেই বিদ্যাসাগরের কোন পরিচয় তাঁহার সাহিত্যিক রচনাবলীর মধ্যে নাই। অনেকে বলিতে পারেন, মানুষ বিদ্যাসাগরকে যে আমরা তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে পাই না, তাহার কারণ, বিদ্যাসাগরের রচনা মূলত সৃষ্টিধর্মী নহে। এ কথা আংশিকভাবে সত্য;—তিনি সংস্কৃত, ইংরেজি, হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদির অনুসরণে, বাংলায় অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কয়েকটি রচনাকে তো আমরা মৌলিক রচনার পর্যায়ভুক্ত করিতে পারি, যথা,—সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৩), বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৫, ঐ দ্বিতীয় পুস্তক, ১৮৫৫), বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক

বিচার (১৮৭১, ঐ দ্বিতীয় পুস্তক, ১৮৭৩)। অথচ এই সকল রচনা হইতেও বিদ্যাসাগরের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় না। সমাজ-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া বিদ্যাসাগর কখনও শাস্ত্রের প্রতি অমর্যাদা করেন নাই, তিনি বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও বহু বিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। গিরিজা-শঙ্করবাবু সত্যই বলিয়াছেন—রাজা রামমোহনের ন্যায় বিদ্যাসাগরও শাস্ত্র ও যুক্তির সমন্বয়-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু শাস্ত্র-সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত বিশ্বাস কতটা ছিল, তাঁহার রচনাবলী হইতে তাহা জানিবার উপায় নাই।

বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংক্রান্ত রচনাবলীতে তাঁহার মানব-প্রীতি এবং লাঞ্ছিতা নারীর প্রতি সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। বিধবা-বিবাহসম্বন্ধীয় পুস্তকে তাঁহার বাস্তবমুখী দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিচয় মিলে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, বিদ্যাসাগর পণ্ডিত হইলেও তাঁহার মধ্যে কাণ্ডজ্ঞান প্রচুর পরিমাণেই ছিল। নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে বিদ্যাসাগরের বাস্তবমুখী দৃষ্টি ও কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাইবে—

"তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায় ; দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না ; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না, দুর্জয় রিপুবর্গ একেবারে নির্মূল হইয়া যায়। কিন্তু তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক পদে পদে তাহার উদাহরণ পাইতেছ। ভাবিয়া দেখ, এই অনবধানদোষে সংসার-তরুর কি বিষময় ফল ভোগ করিতেছ! হায় কি পরিতাপের বিষয়! যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায়-অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত-বোধ নাই, সদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগ্য অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে।

হা অবলাগণ! তোমার কি পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারি না।"

দেশাচারের অনুগত ভক্তদিগকে বিদ্যাসাগর তীব্র ভাষায় ব্যঙ্গ করিয়াছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের রচনার দুই এক স্থানে তাঁহার বিদ্রোহী মূর্তিটিও যে প্রকট হয় নাই, এমন কথা বলা যায় না।

বিদ্যাসাগরের ভাষার ক্রম-পরিণতি তাঁহার গতিশীল মনের পরিচয় দেয়। বাংলা রচনায় ছেদ-চিহ্নের প্রবর্তনে আমরা তাঁহার শিল্পী মনেরই প্রকাশ দেখিতে পাই।

বিদ্যাসাগরের কলানৈপুণ্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অননুকরণীয় ভাষায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা সর্বজন-পরিচিত, তথাপি এখানে সেই পংক্তিগুলি উধৃত করার প্রয়োজন বোধ করিতেছি—

'বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলায় গদ্য সাহিত্যের সুচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাংলা গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন। ভাষা যে কেবল ভাবের একটা আধারমাত্র নহে, তাহার মধ্যে যেন-তেন-প্রকারেণ কতকগুলি বক্তব্য বিষয় পূরিয়া দিলেই যে কর্তব্য-সমাপন হয় না, বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, যতটুকু বক্তব্য, তা সরল করিয়া, সুন্দর করিয়া এবং সুশৃঙ্খল করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে। আজিকার দিনে এ কাজটিকে তেমন বৃহৎ বলিয়া মনে হইবে না, কিন্তু সমাজ-বন্ধন যেমন মনুষ্যত্ব-বিকাশের পক্ষে অত্যাবশ্যক, তেমনি ভাষাকে কলাবন্ধনের দ্বারা সুন্দর-রূপে সংযমিত না করিলে, সে ভাষা হইতে কদাচ প্রকৃত সাহিত্যের উদ্ভব হইতে পারে না। সৈন্যদলের দ্বারা যুদ্ধ সম্ভব, কেবলমাত্র জনতার দ্বারা নহে;—জনতা নিজেকেই নিজে খণ্ডিত-প্রতিহত করিতে থাকে, তাহাকে চালনা করাই

কঠিন। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন—এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাষাপ্রকাশের কঠিন বাধা-সকল পরাহত করিয়া সাহিত্যের নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন। কিন্তু যিনি এই সেনানীর রচনাকর্তা, যুদ্ধ-জয়ের যশোভাগ সর্বপ্রথমে তাঁহাকেই দিতে হয়।'

বিদ্যাসাগরের রচনাবলীর সঙ্গে যাঁহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, তাঁহারাই তাঁহার ভাষার ক্রম-পরিণতি লক্ষ্য করিয়াছেন। মনীষী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের ভাষায় 'বিরামচিহ্ন-প্রয়োগের ক্রম-বাহুল্যের' দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। যে অলৌকিক প্রতিভার বলে বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের মধ্যে ছন্দ-সুষমা আনয়ন ও শব্দ-ঝঙ্কারের সৃষ্টি করিয়া ভাষায় গাম্ভীর্য ও লালিত্য সঞ্চার করিয়াছেন, উহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই বিস্ময়ের বস্তু হইয়া রহিয়াছে। অবশ্য, বিদ্যাসাগর যদি বাংলা ভাষার 'প্রথম যথার্থ শিল্পী' হন, তবে মৃত্যুঞ্জয়ের মধ্যেই এই শিল্পনৈপুণ্যের প্রথম স্ফুরণ ঘটিয়াছিল, কিন্তু যিনি বিদ্যাসাগরের কলা-নৈপুণ্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের পূর্বোধৃত মন্তব্য মৃত্যুঞ্জয় সম্পর্কে প্রয়োগ করিয়াছেন, তিনি কিছুটা অতিশয়োক্তি করিয়াছেন। অবশ্য পরবর্তী কালে অনেক শক্তিহীন লেখক বিদ্যাসাগরের অনুসরণ করিতে গিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছেন। কেবলমাত্র 'কাদম্বরী' (১৮৫৪), 'রাসেলাস' (১৮৫৭) প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা তারাশঙ্কর তর্করত্ন বিদ্যাসাগরের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া অনেকাংশে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা' ও তারাশঙ্করের 'কাদম্বরী' একই বর্ষে প্রকাশিত হইয়াছিল। এক হিসাবে বিদ্যাসাগরের চেয়েও তারা-শঙ্করের কৃতিত্ব অধিক, কেননা, তিনি কাদম্বরীর ন্যায় দীর্ঘসমাস-

বহুল নানালঙ্কার-সমৃদ্ধ অনুপম গদ্যকারের আখ্যানবস্তুই শুধু বাংলা গদ্যে গ্রথিত করেন নাই ; মূল গ্রন্থের সৌন্দর্যও কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহার রচনার ভিতর সঞ্চারিত করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, স্বল্পজীবী তারাশঙ্কর মাত্র সাত আট বৎসরকাল বাংলা সাহিত্যের সেবা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগরের রচনার এক প্রান্তে 'বোধোদয়' (১৮৫১) ও 'কথামালা' (১৮৫৬), অপর প্রান্তে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭) ও 'সীতার বনবাস' (১৮৬০) ; 'শকুন্তলা'র (১৮৫৪) ভাষা এতদুভয়ের মধ্যবর্তী। মহাভারতের উপক্রমণিকা ভাগের অনুবাদে (১৮৬০) মূলের গাম্ভীর্য যথাসম্ভব রক্ষিত হইয়াছে কিন্তু এরূপ রচনায় প্রাঞ্জলতা বা প্রসাদগুণ আশা করা যায় না। সেক্সপীয়ারের 'Comedy of Errors' অবলম্বনে বিদ্যাসাগর 'ভ্রান্তিবিলাস' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন, ইহাতেই বুঝা যায়, কৌতুককর আখ্যান-বস্তুর দিকেও বিদ্যাসাগরের একটা প্রবণতা ছিল। বিদ্যাসাগরের বেনামী রচনাবলী ক্ষোভপ্রসূত, সুতরাং ইহাতে উচ্চাঙ্গের রসিকতা নাই, কিন্তু বিদ্যাসাগরের রসিকতা যে গ্রাম্যতা-দোষ-বর্জিত, মনীষী কৃষ্ণকমলের এ কথাটি আমরা স্বীকার করি। যাহা হউক, বিদ্যাসাগরের রচনা নানা দিক দিয়াই আলোচনা করা চলে। সমালোচনা-সাহিত্যে, স্মৃতিশাস্ত্রের বিশ্লেষণে ও হাস্যরসের অবতারণায় বিদ্যাসাগর যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, সে সম্পর্কে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন আছে।

'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস' প্রভৃতি গ্রন্থের স্থানবিশেষে বিদ্যাসাগর মূল গ্রন্থের অংশবিশেষের অনুবাদ সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এইরূপ অনুবাদেও তিনি ভাষার লালিত্য ও সংগীত-ঝঙ্কারের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছেন, কখনও সমাসবদ্ধ দীর্ঘ পদের ভূরি প্রয়োগের দ্বারা ভাষাকে অযথা ভারাক্রান্ত করেন নাই। বাংলা গদ্যের

ছন্দ-সুষমা ও সৌন্দর্য তিনি সর্বত্র অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। আমরা 'উত্তরচরিত' হইতে দুই একটি দৃষ্টান্ত দিব।

'উত্তররামচবিতের' প্রথম অঙ্কে লক্ষ্মণ বলিতেছেন—

'অয়মবিরলানোকহনিবহনিরন্তরস্নিগ্ধনীলপরিসরারণ্য-
পরিণদ্ধগোদাবরীমুখরকন্দরঃ সন্ততমভিষ্যন্দমানমেঘমেদুরিত-
নীলিমা জনস্থানমধ্যগো গিরিঃ প্রস্রবণো নাম।'

'সীতার বনবাসে' বিদ্যাসাগর লিখিয়াছেন—

লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য! এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণগিরি। এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত সঞ্চরমাণ জলধরমণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত; অধিত্যকাপ্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে, সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবল বেগে গমন করিতেছে।

বিদ্যাসাগর যদি স্বল্পশক্তিশালী লেখক হইতেন, তবে এই অংশের অনুবাদটি শব্দের ভারে ভারাক্রান্ত ও নিতান্ত দুর্বোধ্য হইয়া পড়িত, সন্দেহ নাই। কিন্তু উধৃত অংশটির সঙ্গীত-ঝঙ্কার এ কালের পাঠকদের কর্ণেও যেন মধুবর্ষণ করে।

অন্যত্র, উত্তররামচরিতে লক্ষ্মণ বলিতেছেন—

অথেদং রক্ষোভিঃ কনকহরিণচ্ছদ্মবিধিনা
তথা বৃত্তং পাপৈর্ব্যথয়তি যথা ক্ষালিতমপি।
জনস্থানে শূন্যে বিকলকরণৈরার্য্যচরিতৈ
রপি গ্রাবা রোদিত্যপি দলতি বজ্রস্য হৃদয়ম্॥

বিদ্যাসাগর এই অংশের যে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উধৃত হইল—

'দুরাচার মারীচ হিরণ্ময় মৃগের আকৃতি ধারণ করিয়া যে অতি বিষম অনর্থ ঘটাইয়াছিল, যদিও সম্পূর্ণ বৈরনির্যাতন দ্বারা তাহার

যথোচিত প্রতিবিধান হইয়াছে, তথাপি স্মৃতিপথে আরূঢ় হইলে মর্মবেদনা প্রদান করে। এই ঘটনার পর, আর্য মানবসমাগমশূন্য জনস্থান-ভূভাগে বিকলচিত্ত হইয়া যেরূপ কাতরভাবাপন্ন হইয়াছিলেন, তাহা অবলোকিত হইলে, পাষাণও দ্রবীভূত হয়, বজ্রেরও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।'

বাংলা গদ্যে যিনি একদিকে এই স্নিগ্ধ গম্ভীর ধ্বনি সঞ্চার করিয়াছিলেন এবং অপর দিকে ভাষার প্রাঞ্জলতা ও মসৃণতা বিধান করিয়া বাংলা ভাষাকে সুকুমারমতি বালকগণেরও পাঠের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছিলেন, তিনি যে কিরূপ অসাধারণ শক্তির অধিকারী ছিলেন, তাহা আমরা এ যুগে সম্যক ধারণা করিতে পারি না। সাহিত্য-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার লিখিয়াছেন—

'ভাষার সঙ্গীতগুণই যে সাহিত্যসৃষ্টির আদি প্রেরণা, তাহা যাঁহারা বুঝিয়াছেন তাঁহারাই জানেন, বাংলা গদ্যের রূপটি উদ্ধার করিতে কোন্ নিগূঢ় শক্তির প্রয়োজন হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাংলা গদ্যের ছন্দ-ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহারই উপরে বঙ্কিম ও পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের কারুকীর্তির অশেষ নিদর্শন নির্মাণ করিয়াছেন। [সাহিত্য-বিতান, পৃঃ ৩২]।

রামমোহন বা অক্ষয়কুমারের মত বিদ্যাসাগর কিন্তু কখনও সাহিত্যের মধ্য দিয়া উপদেষ্টা বা আচার্যের আসন গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার রচনায় যে কলা-নৈপুণ্যের নিদর্শন রহিয়াছে, উহা আমাদিগকে মুগ্ধ করে কিন্তু তাঁহার গ্রন্থাবলী হইতে আমরা শোকে-দুঃখে কতটা সান্ত্বনা পাই বা মহত্ত্বের কতখানি প্রেরণা লাভ করি, তাহা বলা যায় না।

পূর্বেই বলিয়াছি, বিদ্যাসাগরের বেনামী রচনায় ব্যঙ্গকুশলতার পরিচয় আছে কিন্তু উচ্চাঙ্গের হাস্যরস নাই। বাস্তবিক, বিদ্যাসাগর এই শ্রেণীর রচনায় সংযমের পরিচয় দিতে পারেন নাই। সমাজ-

সংস্কার-প্রচেষ্টায় যাঁহারা তাঁহাকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতিবাদ করিতে গিয়া তিনি শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ও সংযম রক্ষা করিতে পারেন নাই। গভীর ক্ষোভে তিনি বলিয়াছেন—

'এদেশে উপহাস ও কটূক্তি যে ধর্মশাস্ত্র-বিচারের এক প্রধান অঙ্গ, ইহার পূর্বে আমি অবগত ছিলাম না।'

ইহতে বুঝা যায়, তাঁহার স্বদেশবাসিগণের হীন সংকীর্ণতা ও মিথ্যাচার সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের বিশেষ কোন ধারণা ছিল না। বাঙ্গালী-চরিত্র সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের মনে যে একটি আদর্শ ছিল, তাহা যখন একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছিল, তখন তাঁহার পক্ষে চিত্তের স্থৈর্য রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই।

যাহা হউক, বিদ্যাসাগরের রচনাবলীতে শিল্পী বিদ্যাসাগরের পরিচয় পাওয়া গেলেও মানুষ বিদ্যাসাগরের তেমন পরিচয় মিলে না, কিন্তু শিল্পী ঈশ্বরচন্দ্রের চেয়ে যে মানুষ ঈশ্বরচন্দ্র অনেক বড় ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

এই যে মানুষ বিদ্যাসাগর, যিনি সকলের নিকট দয়ার সাগর নামে পরিচিত ছিলেন, তাঁহার অন্তরে ছিল পুঞ্জীভূত বেদনা। স্বদেশবাসীর কৃতঘ্নতা ও হীন আক্রমণে সেই বেদনাকে যেন শতগুণ বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। সমুদ্রের অন্তর মথিত করিয়া যে ক্রন্দন-ধ্বনি উত্থিত হয়, আমরা উহার গভীরতা উপলব্ধি করিতে পারি না। বিদ্যাসাগরের অন্তর-বেদনাও সাগরের মতই গভীর ও সীমাহীন ছিল। বাড়বানলের সঙ্গে যদি তাঁহার পৌরুষকে তুলনা করা যায়, তবে তাঁহার হৃদয়ের অন্তহীন বেদনা যাহা অনেক সময়ে অশ্রুরূপে বিগলিত হইয়াছে, উহাকে কি আমরা সাগরের অশ্রান্ত ক্রন্দনের সঙ্গে তুলনা করিতে পারি না?

গ্রন্থপঞ্জী অর্থাৎ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের তালিকা

[১৮৩৪ খৃঃ হইতে ১৮৫৮ খৃঃ পর্যন্ত]

গ্রন্থ		গ্রন্থকার	প্রকাশকাল
বাসবদত্তা	...	মদনমোহন তর্কালঙ্কার	১৮৩৬
ভূগোল	...	অক্ষয়কুমার দত্ত	১৮৪১
বিদ্যাকল্পদ্রুম	...	কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়	১৮৪৬-৫১
বেতাল পঞ্চবিংশতি	...	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	১৮৪৭
বাঙ্গালার ইতিহাস	...	—ঐ—	১৮৪৮
জীবন-চরিত	...	—ঐ—	১৮৪৯
বোধোদয়	...	—ঐ—	১৮৫১
বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার	...	অক্ষয়কুমার দত্ত	১৮৫১
পশ্বাবলী	...	তারাশঙ্কর তর্করত্ন	১৮৫২
ভদ্রার্জুন (নাটক)	...	তারাচরণ শিকদার	১৮৫২
চারু পাঠ (প্রথম ভাগ)	...	অক্ষয়কুমার দত্ত	১৮৫৩
বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার (দ্বিতীয় ভাগ)		—ঐ—	১৮৫৩
সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব	...	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	১৮৫৩
বাবু নাটক	...	কালীপ্রসন্ন সিংহ	১৮৫৪
কুলীনকুলসর্বস্ব নাটক	...	রামনারায়ণ তর্করত্ন	১৮৫৪
চারু পাঠ (দ্বিতীয় ভাগ)	...	অক্ষয়কুমার দত্ত	১৮৫৪
শকুন্তলা	...	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	১৮৫৪
কাদম্বরী	...	তারাশঙ্কর তর্করত্ন	১৮৫৪

গ্রন্থ		গ্রন্থকার	প্রকাশকাল
বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব	…	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	১৮৫৫
—ঐ দ্বিতীয় পুস্তক	…	—ঐ—	১৮৫৫
কথামালা	…	—ঐ—	১৮৫৬
চরিতাবলী	…	—ঐ—	১৮৫৬
বেণীসংহার নাটক	…	রামনারায়ণ তর্করত্ন	১৮৫৬
ধর্মনীতি	…	অক্ষয়কুমার দত্ত	১৮৫৬
পদার্থবিদ্যা	…	—ঐ—	১৮৫৬
বিক্রমোর্বশী নাটক	…	কালীপ্রসন্ন সিংহ	১৮৫৭
রাসেলাস	…	তারাশঙ্কর তর্করত্ন	১৮৫৭
সাবিত্রী-সত্যবান নাটক	…	কালীপ্রসন্ন সিংহ	১৮৫৮
দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ	…	কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য	১৮৫৮ (?)
রত্নাবলী	…	রামনারায়ণ তর্করত্ন	১৮৫৮
প্রবোধ-প্রভাকর	…	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	১৮৫৮
আলালের ঘরের দুলাল	…	প্যারীচাঁদ মিত্র	১৮৫৮
পদ্মিনী উপাখ্যান	…	রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৫৮
শর্মিষ্ঠা নাটক	…	মধুসূদন দত্ত	১৮৫৮
টেলিমেকাস	…	রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৫৮

প্যারীচাঁদ মিত্র ও বাংলা গদ্যে পরীক্ষার যুগ

(১৮১৪-৮৩)

পাশ্চাত্ত্য দেশে দার্শনিক বেন্থাম ও তাঁহার শিষ্য জন্ স্টুয়ার্ট মিল হিতবাদের অথবা অধিকতম লোকের প্রভূততম কল্যাণের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। মনে হয়, সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্রে প্যারীচাঁদ মিত্র সেই আদর্শের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। যে সময়ে অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগরের সাহিত্যিক যশ সুপ্রতিষ্ঠিত, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বেতালপঞ্চবিংশতি' ও 'শকুন্তলা'র সুমধুর শব্দঝঙ্কারে এবং অক্ষয়কুমারের 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধবিচার' ও 'চারুপাঠ' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের ভাষার গাম্ভীর্য ও ওজস্বিতায় বাঙ্গালী পাঠকগণ মুগ্ধ ও চমৎকৃত, সেই সময়েই বাংলা গদ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে দুঃসাহসী পারীচাঁদের আবির্ভাব ঘটে। প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' নামক আখ্যানটি যখন 'মাসিক পত্রে' প্রতি সংখ্যায় প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে, তখন আমাদের দেশের কেহই তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন নাই, বাংলা গদ্য-সাহিত্যের যে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সূচিত হইল, সে কথাও কেহ অনুমান করিতে পারেন নাই। * 'মাসিক পত্রের' উদ্দেশ্যই ছিল বাংলা ভাষাকে সর্বজনের বোধগম্য করিয়া তোলা। এই পত্রিকাখানি বাংলা দেশের দুইজন দুঃসাহসী অথচ মনস্বী সন্তান প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদারের অক্ষয় কীর্তি। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের ভাষা সংস্কৃতানুগামিনী, তাই এই ভাষার রস-আস্বাদনে আমাদের দেশের অধিকাংশ

---

* বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাংলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান' নামক প্রবন্ধটি ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

লোকই বঞ্চিত। তাই তাঁহারা এমন ভাষার সৃষ্টি করিয়াছিলেন যে ভাষার সঙ্গে আমাদের দেশের পুরনারীগণও পরিচিত। এই মহান উদ্দেশ্য লইয়াই প্যারীচাঁদ বাঙ্গালীর ঘরোয়া ভাষায় বাঙ্গালীর ঘরের কথা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বাংলা ভাষায় প্রথম উপন্যাস-রচনার প্রচেষ্টা এবং চলতি ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টির প্রথম প্রয়াস হিসাবে 'আলালের ঘরের দুলালের' নাম চিরকাল আমাদের স্মরণীয়। যে সমস্ত গ্রন্থে প্যারীচাঁদ সাধুরীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, সেখানেও দুরূহ ও অপ্রচলিত শব্দ বর্জন করিয়া এবং দীর্ঘ 'সমস্ত' পদসমূহ পরিহার করিয়া বাংলা ভাষাকে সহজবোধ্য করিয়া তুলিয়াছেন। ফলত, লোক-কল্যাণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই প্যারীচাঁদ সাহিত্য-সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রায় সর্ববিধ সাহিত্যিক প্রচেষ্টারই মূলে ছিল ডিরোজিওর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব।

হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর প্রখর ব্যক্তিত্ব ও অসামান্য মনীষা সে যুগের হিন্দু কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে যে বিপ্লব ও উন্মাদনা আনয়ন করিয়াছিল, তাহা আমাদের মনে আজও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। অতি অল্প বয়সেই ডিরোজিওর মধ্যে কবিত্ব-শক্তির উন্মেষ ঘটে এবং ইনিই সর্বপ্রথম তাঁহার কাব্যে ভারতভূমিকে 'জননী' বলিয়া সম্বোধন করেন। ফরাসী বিপ্লবের আদর্শে ইনি অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন এবং স্বয়ং প্রচুর প্রাণশক্তির অধিকারী ছিলেন বলিয়াই ইনি বাংলার তরুণগণের প্রাণে বিপ্লবের বহ্নিশিখা জ্বালাইয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই স্বল্পজীবী মনস্বী শিক্ষক কোন দিন আত্মস্থ হইবার অবকাশ পান নাই এবং তাঁহার শিক্ষার তাৎপর্যও তরুণ শিষ্যবৃন্দ যথাযথ ভবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তথাপি এই শিষ্যবৃন্দের অনেকেই উত্তরকালে দেশের সেবায় আপনাদের স্বল্প অথবা বৃহৎ শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন এবং

ইঁহাদের কেহ কেহ ভারতীয় সাধনা ও সংস্কৃতির দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ইঁহারা অনেকেই জীবনের নানা ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। হিন্দু কলেজের তরুণ ছাত্রগণের মনে ডিরোজিও কি বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, সে সম্পর্কে আচার্য মোক্ষমূলর লিখিয়াছেন—

'Derozio, though branded by the clergy as an infidel and a devil of the Thomas Paine School, was worshipped by his pupils as the incarnation of goodness and kindness.,

প্যারীচাঁদ মিত্র ছিলেন বিচিত্রকর্মা পুরুষ। যেমন কর্ম-সাধনায় তেমনি সাহিত্য-সাধনায় তিনি লোকশ্রেয়ের আদর্শের দ্বারাই পরিচালিত হইয়াছিলেন। অবশ্য, সাহিত্যিক প্যারীচাঁদের ভিতরে যতখানি সম্ভাবনা ছিল, তিনি ততখানি সার্থকতা লাভ করিতে পারেন সাই। ইহার কারণ, লোক-কল্যাণের আদর্শ তাঁহার মনে সর্বদা জাগরূক ছিল। হাস্যরস-সৃষ্টিতে তাঁহার দক্ষতা ছিল, মানব-চরিত্র সম্পর্কেও তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল, কিন্তু তিনি একটি আখ্যানবস্তুকে উপলক্ষ্যমাত্র করিয়া আমাদিগকে নীতি শিক্ষা দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন বলিয়াই তাঁহার উপন্যাস-রচনার প্রয়াস অনেকাংশে ব্যর্থ হইয়াছে, নতুবা যিনি ঠকচাচার মত জীবন্ত চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তিনি অন্যান্য চরিত্র-সৃষ্টিতেও অধিকতর নৈপুণ্য দেখাইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার সৃষ্ট প্রায় প্রত্যেকটি চরিত্রই রক্তমাংসের মানুষ না হইয়া এক একটি ভাবের বাহন বা প্রতিনিধি হইয়া উঠিয়াছে। প্যারীচাঁদ তাঁহার প্রত্যেকটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন লোকশিক্ষার উদ্দেশ্য লইয়া। 'আলালের ঘরের দুলাল' রচনার অন্যতম উদ্দেশ্যসম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন—
'The work has been written in a simple style and

to foreigners desirous of acquiring an idiomatic knowledge of the Bengali language and an acquaintance with Hindu domestic life, it will parhaps be found useful. 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত রাখার কি উপায়' গ্রন্থে (১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ) তিনি মদ্যপান, জাত্যভিমান প্রভৃতি দোষসমূহের উপর কশাঘাত করিয়াছেন, 'রামারঞ্জিকায়' (১৮৬০) পুরনারীদের প্রতি 'সাংসারিক বিষয়ে' উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, 'যৎকিঞ্চিতে' (১৮৬৫) ঈশ্বর, আত্মা, উপাসনা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, 'অভেদী'তে একটি নায়ক ও নায়িকাকে উপলক্ষ্যমাত্র করিয়া আমাদিগকে অধ্যাত্ম তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন, 'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা'য় (১৮৭৯) প্রাচীনকালের মহীয়সী নারীগণের কাহিনীর মধ্য দিয়া ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন; আবার নারী-কল্যাণের উদ্দেশ্য লইয়াই তিনি 'আধ্যাত্মিকা' নামক 'উপন্যাস' রচনা করিয়াছেন (১৮৮০) এবং 'বামাতোষিণী'তে (১৮৮১) নীতিমূলক গল্পের সাহায্যে নারীগণকে বিবিধ গার্হস্থ্য বিষয় শিক্ষা দিয়াছেন। প্যারীচাঁদ ইংরেজিতেও নানা বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কৃষিবিদ্যা, আইনশাস্ত্র, জীবনচরিত, অধ্যাত্মবিদ্যা, প্রেততত্ত্ব প্রভৃতি নানা বিষয়ের তিনি আলোচনা করিয়াছেন। এখানেও তিনি যে একই মহৎ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্যারীচাঁদের হাস্যরসের নিদর্শন পাওয়া যায় তাঁহার রচিত প্রথম দুইখানি গ্রন্থে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'নির্মল শুভ্র সংযত হাস্য বঙ্কিমই প্রথম বাংলা সাহিত্যে আনয়ন করেন।' বঙ্কিমচন্দ্রের মত উচ্চাঙ্গের হাস্যরস-সৃষ্টিতে বা হাস্যরসের বৈচিত্র্য-সম্পাদনে প্যারীচাঁদের দক্ষতা ছিল না, কিন্তু লঘু অথচ সংযত হাস্যরস হয়তো প্যারীচাঁদই প্রথম বাংলা-সাহিত্যে আনয়ন করেন। প্যারীচাঁদের

পূর্বে ব্যঙ্গকবিতা রচনায় ঈশ্বর গুপ্ত, ও ব্যঙ্গ-চিত্র-অঙ্কনে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে (দীনবন্ধুর প্রথম নাটক প্রকাশিত হইবাব পূর্বেই প্যারীচাঁদের প্রথম দুইখানি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল) নাটক ও প্রহসনে দীনবন্ধু হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহারা সময়ে সময়ে সংযম ও সুরুচির সীমা লঙ্ঘন করিতে দ্বিধা করেন নাই। প্যারীচাঁদের অনুবর্তী কালীপ্রসন্ন সিংহও 'হুতোম প্যাঁচার নক্সায়' কথ্যভাষা ও উপভাষার প্রয়োগে এবং সম-সাময়িক সমাজের চিত্র-অঙ্কনে অসামান্য কুশলতা প্রদর্শন করিয়াছেন কিন্তু তিনিও স্থানে স্থানে শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করিয়াছেন। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে প্যারীচাঁদের কৃতিত্ব অল্প নহে।

অনেকে প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলালে' ভবানীচরণের 'নববাবু-বিলাসের' ও সমাচার-দর্পণে প্রকাশিত 'বাবু' উপাখ্যানের প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছেন, আবার তাঁহার রূপক-কাহিনী 'অভেদী'তেও হয়তো জন বেনিয়ানের 'Pilgrim's Progress' এর কিছু প্রভাব রহিয়াছে, কিন্তু প্যারীচাঁদের মর্যাদা বা মৌলিকতা কোথাও বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র সত্যই বলিয়াছেন—যে সময়ে বাংলা দেশের দুইজন প্রতিভাশালী লেখক সংস্কৃত বা ইংরেজী-সাহিত্য হইতে গ্রন্থের বিষয়বস্তু আহরণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে প্যারীচাঁদ নিজ কল্পনা হইতে আখ্যানবস্তু আহরণ করিয়া বাংলা-সাহিত্যে বৈচিত্র্য-সম্পাদন করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে প্যারীচাঁদ দ্বিবিধ কীর্তির অধিকারী। প্রথমতঃ, প্যারীচাঁদ খাঁটি বাংলা শব্দ ও চলতি বুলির শক্তি আবিষ্কার করিয়া বাংলা ভাষাকে সর্বজনের বোধগম্য করিয়া তুলিয়াছেন, দ্বিতীয়তঃ, যখন বাঙ্গালী লেখকগণ সাহিত্যের বিষয়বস্তুর জন্য অপরের দ্বারস্থ হইতেছিলেন, সেই সময়ে প্যারীচাঁদ আপন কল্পনার ভাণ্ডার হইতে

গল্পের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। চল্‌তি শব্দ ও চল্‌তি বুলির মধ্যে যে ভাব-প্রকাশের অপূর্ব শক্তি নিহিত আছে এবং খাঁটি বাংলা ভাষায় যে যথার্থ সাহিত্য-রচনা করা চলে, এই সত্য আবিষ্কারের প্রতিভা প্যারীচাঁদের ছিল। অবশ্য, প্যারীচাঁদের রচনায় স্থানে স্থানে সাধু ও চল্‌তি ক্রিয়াপদের মিশ্রণ অসতর্ক পাঠকেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কিন্তু চলতি ভাষায় যিনি সর্বপ্রথম উপন্যাস-রচনার প্রয়াস করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে এরূপ ত্রুটি মার্জনীয়। বাংলা গদ্যসাহিত্যে যেমন প্যারীচাঁদ, কাব্যে তেমনি বিহারীলাল প্রমাণ করিয়াছেন—অনেক স্থলে তদ্ভব, দেশী বা বিদেশী শব্দের মধ্যে যেমন ভাব-প্রকাশের শক্তি নিহিত রহিয়াছে, তৎসম শব্দে তাহা নাই। কাব্যে প্রচুর ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও বিশিষ্টার্থক চলতি শব্দের প্রয়োগ করিয়া বিহারীলালও অনেকাংশে প্যারীচাঁদের মতই দুঃসাহসের পরিচয় দিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র প্যারীচাঁদ মিত্রের গদ্যভঙ্গির দোষগুণ-সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন। প্রাচীনপন্থী পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন আলালী ভাষার নিন্দা করিয়াছেন, কিন্তু মনীষী রাজনারায়ণ বসু ও কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত গ্রন্থখানির প্রশংসা করিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত জন বীম্‌স্ ও প্যারীচাঁদের গ্রন্থখানির বহু গুণের উল্লেখ করিয়াছেন। [বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত আলালের ঘরের দুলালের ভূমিকা দ্রষ্টব্য]।

বাস্তবিক প্যারীচাঁদ তাঁহার গ্রন্থে প্রচুর ফারসী ও আরবী শব্দ, ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও প্রবাদ বাক্যের প্রয়োগ করিয়া চল্‌তি ভাষার শক্তিকে প্রমাণিত করিয়াছেন। যেমন—

'ক্রমে ক্রমে পাড়ার যত হতভাগ্য লক্ষ্মীছাড়া উনপাঁজুরে বরাখুরে ছোঁড়ারা জুটিতে আরম্ভ হইল।' [বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ, পৃঃ ১৩]।

'আলালের ঘরের দুলাল' হইতে আরও কয়েকটি বিশিষ্টার্থক শব্দ বা শব্দসমষ্টি ও প্রবাদবাক্য উদ্ধৃত করিতেছি, যথা—অরণ্যে রোদন করা, গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল, গোকুলের ষাঁড়, কাঁচা কড়ি, চাড় পড়িলেই ফিকির বেরোয়, পাকা ধানে মই, পেতনীর শ্রাদ্ধে আলেয়া অধ্যক্ষ, পরের মুখে ঝাল খাওয়া, দেঁতোর হাসি, তেলা মাথায় তেল, তীর্থের কাক, ঢেঁকির কচকচি, ঝোপ বুঝে কোপ, জল উঁচু নীচু, মাণিকজোড়, মরার উপর খাঁড়ার ঘা, যেমন দেবা তেমনি দেবী, ভিজে বেরাল, বিড়াল তপস্বী, বুদ্ধির ঢেঁকি, বুড়িতে চতুর কিন্তু কাহনে কাণা, বালির বাঁধ, বাটিতে ঘুঘু চরা, বাঘে গরুতে জল খাওয়া, হাড়ে ভেল্কি হওয়া, সরষের ভিতর ভূত, শিবরাত্রির সলিতা, শাঁকের করাত, চণ্ডীচরণ ঘুটে কুড়ায় রামা চড়ে ঘোড়া প্রভৃতি।

'আলালের ঘরের দুলালের' পাঠকমাত্রেই জানেন, মানব-চরিত্র সম্বন্ধে প্যারীচাঁদের অভিজ্ঞতা ছিল প্রচুর। সংসারে যে শুধু বরদাবাবুর মত আদর্শ পুরুষই নাই, ঠকচাচা, বাহুল্য ও বাঞ্ছারামের মত সয়তানও আছে, এবং বক্রেশ্বরের মত স্বার্থান্বেষী ও তোষামোদ-কারী শিক্ষকও আছে, এ কথা ভূয়োদর্শী প্যারীচাঁদ উত্তমরূপে জানিতেন কিন্তু তথাপি চরিত্র-সৃষ্টিতে তিনি সার্থকতা লাভ করিতে পারেন নাই। ভণ্ড, ধর্মধ্বজী, স্বার্থান্বেষী ঠকচাচার চরিত্রও তিনি পাপের পরিণতি-প্রদর্শনের জন্যই অঙ্কিত করিয়াছেন। প্রাকৃতিক দৃশ্যাদির বর্ণনায় এবং স্থানে স্থানে উপমার প্রয়োগেও প্যারীচাঁদ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। উপন্যাস-রচনার কারণ-সম্পর্কে প্যারীচাঁদ ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

অন্যান্য পুস্তক অপেক্ষা উপন্যাসাদি পাঠ করিতে প্রায় সকল লোকেরই মনে স্বভাবত অনুরাগ জন্মিয়া থাকে এবং যে স্থলে এতদ্দেশীয় অধিকাংশ লোক কোন পুস্তকাদি পাঠ করিয়া সময়

ক্ষেপণ করিতে রত নহে সে স্থলে উক্ত প্রকার গ্রন্থের অধিক আবশ্যক, এতদ্বিবেচনায় এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি রচিত হইল।'

এই কয়েকটি কথা হইতে বুঝা যায়, অধিকসংখ্যক পাঠকের যাহাতে কল্যাণ হয়, এই উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়াই প্যারীচাঁদ গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

আমরা প্যারীচাঁদের ভাষার একটু নমুনা উধৃত করিতেছি।

(ক) রবিবারে কুঠীওয়ালারা বড় ঢিলে দেন—হচ্ছে হবে—খাচ্ছি খাব—বলিয়া অনেক বেলায় স্নান আহার করেন। তাহার পরে কেহ বা বড়ে টেপেন—কেহ বা তাস পেটেন—কেহ বা মাছ ধরেন—কেহ বা তবলায় চাটি দেন—কেহ বা সেতার লইয়া পিড়িং পিড়িং করেন—কেহ বা শয়নে পদ্মনাভ ভাল বুঝেন—কেহ বা বেড়াতে যান—কেহ বা বহি পড়েন।

(খ) বাবুরামবাবুর শ্রাদ্ধে লোকের বড় শ্রদ্ধা জন্মিল না, যেমন গর্জন হইয়াছিল তেমন বর্ষণ হয় নাই। অনেক তেলা মাথায় তেল পড়িল—কিন্তু শুকনা মাথা বিনা তৈলে ফেটে গেল। অধ্যাপকদিগের তর্ক করাই সার, ইয়ার গোচের বামুনদিগের চৌচাপটে জিত। অধ্যাপকদিগের নানা প্রকার কঠোর অভ্যাস থাকাতে একরোকা স্বভাব জন্মে—তাঁহারা আপন অভিপ্রায় অনুসারে চলেন—সাটে হাঁ না বলেন না। ইয়ার গোচের ব্রাহ্মণেরা সহরঘেঁসা—বাবুদিগের মন যোগাইয়া কথাবার্তা কহেন—ঝোপ বুঝে কোপ মারেন, তাঁহারা সকল কর্মেই বাওয়াজিকে বাওয়াজি তরকারিকে তরকারি। অতএব তাঁহাদিগের যে সর্ব স্থানে উচ্চ বিদায় হয় তাহাতে আশ্চর্য কি!

সাহিত্যক্ষেত্রে যে সকল লেখক প্যারীচাঁদের গদ্যভঙ্গীর অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কালীপ্রসন্ন সিংহের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি উপন্যাস রচনা করেন নাই কিন্তু নক্সা-অঙ্কনে অদ্ভুত দক্ষতা দেখাইয়াছেন। কালীপ্রসন্ন প্যারীচাঁদের মত সাধু

ও চল্‌তি ক্রিয়াপদের মিশ্রণ ঘটান নাই এবং উপভাষার প্রয়োগে অধিকতর কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

প্যারীচাঁদের সব চেয়ে বড় কৃতিত্ব এই যে, তিনি চল্‌তি ভাষায় উপন্যাস-রচনায় প্রবৃত্ত না হইলে বঙ্কিমচন্দ্র এত সহজে গদ্যরীতির আদর্শটি আবিষ্কার করিতে পারিতেন না। এ স্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে বঙ্কিমচন্দ্র সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় যে উপন্যাসখানি রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে প্যারীচাঁদের প্রভাব সুস্পষ্ট। কিন্তু প্রতিভাশালী লেখক স্বল্পকালের মধ্যেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, প্যারীচাঁদের ভাষা সর্ববিধ ভাব-প্রকাশের পক্ষে অনুপযোগী, সুতরাং তিনি এ পথে বেশী দূর অগ্রসর হন নাই। *

---

* বঙ্কিম-স্মৃতিতে শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের উন্মেষ-পর্ব

নাটকসম্পর্কে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিভঙ্গির একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। আমাদের দেশের প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের মতে নাটক হইতেছে দৃশ্যকাব্য, অর্থাৎ ইহা শুধু রঙ্গমঞ্চে অভিনেয় নয়, ইহা রসাত্মক বাক্যও বটে, আর পাশ্চাত্ত্য সমালোচকের দৃষ্টিতে নাটক হইতেছে মানুষের চলমান জীবনের প্রতিচ্ছবি ; বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির তাড়নায় বা অবস্থার প্রভাবে মানুষের মনে যে দ্বন্দ্ব ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়, নাট্যকার পাত্র-পাত্রীর সংলাপের মধ্য দিয়া উহাকেই রূপায়িত করিয়া তোলেন। নাটক-সম্পর্কে প্রাচী ও প্রতীচীর দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে এই যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, ইহার মূলে রহিয়াছে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে উভয় দেশের ভাবদৃষ্টির পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, আমরা জীবনটাকে দেখিয়াছি লীলারূপে, আর য়ুরোপীয় জাতি দেখিয়াছেন একটা বিরামবিহীন সংগ্রামরূপে। তাই আমরা নাটকেও প্রধানতঃ চাহিয়াছি কাব্যরস আস্বাদন করিতে আর পাশ্চাত্ত্য জাতি চাহিয়াছেন গতিশীল মানব-জীবনের দ্বন্দ্ব ও বিক্ষোভের প্রতিরূপ দর্শন করিতে। আমাদের দেশের আলঙ্কারিকগণ যে কাব্যে করুণরসকে স্বীকৃতি দান করিলেও বিষাদান্ত নাটকের রচনা প্রতিষিদ্ধ করিয়াছেন উহারও মূলে রহিয়াছে জীবন ও জগৎ-সম্পর্কে আমাদের বিশিষ্ট ধ্যানধারণা। আমরা ত্রিবিধ দুঃখকে স্বীকার করিয়াছি কিন্তু চরম সত্য বলিয়া গ্রহণ করি নাই। আমরা গ্রীকদের মত অন্ধ নিয়তিকে স্বীকার করি নাই, প্রাক্তন কর্মকেই আমরা কখনও বলিয়াছি দৈব, কখনও বলিয়াছি নিয়তি, কখনও বা অদৃষ্ট ; নিয়তির কাছে মানবাত্মার পরাভবকে আমরা কোন দিন চরম

বলিয়া স্বীকার করি নাই। আমরা কর্মফলে বিশ্বাসী, তাই আমাদের দৃষ্টিতে প্রত্যেক মানুষ নিজ ভাগ্যের নির্মাতা। আমাদের দেশের দার্শনিকের ভাষায় কৃতকর্মের প্রণাশ বা ধ্বংস নাই, আবার অকৃত কর্মেরও অভ্যুপগম নাই। পাশ্চাত্ত্য জাতিসমূহ কিন্তু জীবনবাদী; তাহাদের দৃষ্টিতে মানুষের এই দ্বন্দ্ব-কোলাহলময় জীবনই চরম সত্য। মানুষের জীবনে নির্মম নিয়তি-লীলাকে অবলম্বন করিয়া গ্রীক ট্র্যাজেডি রচিত হইয়াছে, আবার মানব-চরিত্রের যে তুচ্ছ বা বৃহৎ দোষত্রুটি-দুর্বলতা তাহার জীবনকে অনিবার্যভাবে শোচনীয় পরিণতির দিকে লইয়া যায় উহাকে ভিত্তি করিয়াই সেক্সপীয়ার তাঁহার অনুপম ট্র্যাজেডিগুলি রচনা করিয়াছেন। মানব-জীবনের যে শোচনীয় পরিণতি বিষাদান্ত নাটকের বিষয়-বস্তু উহার মূল কখনও বা থাকে মানুষের চরিত্রে, কখনও বা থাকে দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তির মধ্যে। দার্শনিক এরিস্টটল বলেন, বিয়োগান্ত নাটক আমাদের অন্তরে ভয় ও সমবেদনার উদ্রেক করিয়া পরে উহাদিগকে প্রশমিত করে,—সুতরাং ট্রাজেডি মনের পক্ষে বিরেচনের কার্য করে।

আমাদের দেশে নাটক যে কিছু পরিমাণে কৃত্রিম বিধি-নিষেধের দ্বারা শৃঙ্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই জন্য মধুসূদন রাজনারায়ণকে এক পত্র লিখিয়াছেন—

'যদি আমাকে নাটক লিখিতে হয়, তবে তুমি নিশ্চিত জানিও যে, আমি সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথের বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিব না। য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারগণের নিকট হইতেই আমি নাটক-রচনার আদর্শ গ্রহণ করিব।'

ভারতীয় নাট্যকারের ন্যায় গ্রীক নাট্যকারগণকেও কতকগুলি বাহিরের নির্দেশ মানিয়া চলিতে হইত। মনীষী এরিস্টটলের মতে প্রত্যেক নাট্যকারকে ত্রিবিধ ঐক্যনীতির—কালগত ঐক্য, স্থানগত ঐক্য ও বিষয়গত ঐক্য—অনুসরণ করিতে হইবে। ইউরোপের

রোমাণ্টিক নাট্যকারগণ নাটক-রচনায় গতানুগতিকত্তাকে বর্জন ও কৃত্রিম বিধি-নিষেধকে অতিক্রম করিয়াছিলেন বলিয়াই সেদেশে নাট্য-সাহিত্য এতদূর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। অবশ্য, সেদেশে প্রতিভাশালী নাট্যকারের অভ্যুদয় না হইলে এরূপ ব্যাপার কিছুতেই সম্ভবপর হইত না। উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশে যাঁহারা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষার সংস্পর্শে আসিয়া সেদেশের শ্রেষ্ঠ নাটকসমূহের রস আস্বাদন করিয়াছিলেন, বাংলা দেশের প্রথম যুগের নাট্যকারগণ তাঁহাদের রস-পিপাসা চরিতার্থ করিতে পারেন নাই। বাংলা নাট্য-সাহিত্যের আদিপর্বে আমরা তারাচরণ-রামনারায়ণ-কালীপ্রসন্নের নাম উল্লেখ করিতে পারি। ইঁহাদের কাহারও নাটক-রচনার প্রতিভা ছিল না, সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যের দ্বারা ইঁহারা সকলেই প্রভাবিত হইয়াছিলেন, তথাপি রামনারায়ণের সহজ রসিকতা-বোধ এবং নাটকের ভিতর দিয়া সমাজ-সংস্কারের প্রয়াস সে কালের বাঙ্গালীসমাজে বেশ একটু আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল। সে যুগের অন্যতম নাট্যকার হরচন্দ্র ঘোষ সেক্সপীয়ারের একখানি কমেডি ও একখানি ট্রাজেডির অনুসরণে দুইখানি, মহাভারতের কাহিনী অনুসরণে একখানি ও ব্রহ্মদেশীয় কাহিনী অবলম্বনে একখানি নাটক রচনা করিয়া কিঞ্চিৎ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' নাটকে (১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ) সংস্কৃত নাটকের প্রভাব থাকিলেও ইনিই সর্ব-প্রথম ইংরেজি নাটকের অনুসরণে প্রতি অঙ্কে 'scene' বা সংযোগস্থলের প্রবর্তন করেন। কিন্তু নাটকখানি প্রধানতঃ পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দে গ্রথিত হওয়ায় অভিনয়ের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইয়াছে। 'নাটুকে রামনারায়ণ' দেশের মধ্যে একটা প্রবল আলোড়ন উপস্থিত করিলেও যথার্থ নাটক-রচনা করিতে পারেন নাই। তিনি ইংরেজি ভাষায় অনভিজ্ঞ ছিলেন এবং পাশ্চাত্ত্য

নাটক-সম্পর্কে তাঁহার কোন ধারণাই ছিল না। তথাপি তিনি যে প্রতিভার অধিকারী এবং হাস্য, করুণ প্রভৃতি রসের সৃষ্টিতে দক্ষ ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নাই। 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে'র প্রতিষ্ঠাতা কালীপ্রসন্ন সিংহ কিন্তু অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী হইয়াও মৌলিক নাটক-রচনায় (বাবু নাটক, ১৮৫৪) বিশেষ কোন কৃতিত্ব দেখাইতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক, বাংলার নাট্য-সাহিত্যের আদি পর্বের এই লেখকগণের প্রচেষ্টায় বাংলা নাট্য-সাহিত্যের উন্মেষ হইয়াছিল কিন্তু ইহার বিকাশ ঘটিয়াছিল মধুসূদন ও দীনবন্ধুর সাধনায়। এই সঙ্গে আমরা মনোমোহন বসুর কৃতিত্বের কথাও স্মরণ করি। তারপর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভায় বাংলার নাট্যসাহিত্য পরিপুষ্ট হইয়াছিল।

তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' শুধু বাংলার প্রথম মুদ্রিত নাটক নয়, এই নাটকেই প্রথম ইংরেজি নাটকের অনুসরণে 'দৃশ্য' বা 'সংযোগস্থলের' অবতারণা করা হইয়াছে। ঈশ্বর গুপ্ত যেমন যুগ-সন্ধির কবি, তেমনই এক হিসাবে তারাচরণও যুগ-সন্ধির নাট্যকার। প্রধানতঃ কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' হইতেই তারাচরণ তাঁহার নাটকের বিষয়বস্তু গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি যদি নাট্য-রচনায় পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দের আশ্রয় না লইতেন, তাহা হইলে তাঁহার নাট্য-রচনার প্রয়াস এমন ব্যর্থ হইত না। তারাচরণের রচনায় কোথাও অশ্লীলতা বা গ্রাম্যতা নাই। চরিত্র-সৃষ্টিতেও তারাচরণ অন্ততঃ কথঞ্চিৎ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। কিন্তু 'ভদ্রার্জুনে' নাটকীয় অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্র তেমন পরিস্ফুট হয় নাই। তথাপি, নাটকখানিতে লেখকের প্রতিভার পরিচয় আছে। অবশ্য তারাচরণ যেখানে ঈশ্বর গুপ্তের অনুসরণে অনুপ্রাস, যমক ইত্যাদি অলঙ্কার-সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন, সেখানে

তিনি হাস্যাস্পদ হইয়াছেন। 'ভদ্রার্জুনে' সুভদ্রা সত্যভামাকে বলিতেছেন—

অর্জুনের মুখ সুধাকর সুধাকর।
যেই সুধাপানে হৈল অমর অমর॥
সেই সুধা মম প্রাণী যদি পান পান।
তা নহিলে কভু নাহি পাবে প্রাণ প্রাণ॥
তাহার হৃদয় জলাশয় জলাশয়।
এ হৃদি-মরাল পক্ষে সেই পয় পয়॥
মম হৃদে লগ্ন তার যদি পাই পাই।
এ নয়ন উন্মীলনে তবে চাই চাই॥
নহিলে না হবে স্নিগ্ধ জ্বলন জ্বলন।
কেমনে করিবে গৃহে চরণ চরণ॥
নয়নের আসার হইল ধারা ধারা।
এখনি হইবে মম অঙ্গ সারা সারা॥
[তৃতীয় অঙ্ক, ষষ্ঠ সংযোগস্থল]

তৃতীয় অঙ্কের অষ্টম দৃশ্যে সত্যভামা ও কৃষ্ণের কথোপকথন এইরূপ—

সত্য। ভদ্রার সৌভাগ্যে আর নাহি দেখি ভদ্র।
গ্রহলগ্ন তার পক্ষে সকলি অভদ্র॥
বাল্যকালাবধি সবে জানে ভদ্রা ভদ্র।
তুমি এর বিবেচনা কর ভদ্রাভদ্র॥
কৃষ্ণ। সুভদ্রার ভাগ্যে কি সে অভদ্র ঘটিবে।
করিতে আমার ভদ্র বিশেষ কহিবে॥

আবার পঞ্চম অঙ্কের চতুর্থ সংযোগস্থলে সত্যভামার প্রতি সুভদ্রার উক্তি—

কালসম কাল রাত্রি মম পক্ষে কাল।
চাহি কাল নাহি ইচ্ছা দেখিতে সকাল॥
জ্ঞানে নাহি পাপ-ক্রিয়া করি কোন কাল।
দাদা বলদেব কেন হইলেন কাল॥
মম প্রাণ প্রিয় ধনঞ্জয় কাল রূপ।
তাহার বিপক্ষে দাদা হইল বিরূপ॥

রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ-কাহিনীর সহিত যে তারাচরণের নিবিড় পরিচয় ছিল, 'ভদ্রার্জুনের' অনেক স্থলে তাহার প্রমাণ আছে, যথা, সত্যভামার প্রতি সুভদ্রার উক্তি—

হরনেত্রানলে ভস্ম অতনু যেমন।
এখনি আমার তনু হইবে তেমন॥

অথবা— হংসমুখে দময়ন্তী শুনি নলরূপ।
না হেরি হইয়াছিল অত্যন্ত বিরূপ॥
তব সত্য রুক্মিনী শুনিয়া কৃষ্ণনাম।
পাইব কৃষ্ণেরে বলি এই মনস্কাম॥

[তৃতীয় অঙ্ক, ষষ্ঠ সংযোগস্থল]

'ভদ্রার্জুনে' তারাচরণ হাস্যরস-সৃষ্টির জন্য একটি দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছেন। অবশ্য, কাশীরাম দাসের মহাভারত অবলম্বনেই দৃশ্যটি পরিকল্পিত হইয়াছে। এই দৃশ্যে আমরা এক মণ্ডপ, এক বাতুল, পথিকগণ এবং রথারূঢ় কৃষ্ণ ও অর্জুনকে দেখিতে পাই। অর্জুন ও কৃষ্ণের আকৃতি-সাদৃশ্যে পথিকগণ হতবুদ্ধি হইয়াছেন, তাই বেশ কৌতুকরসের সৃষ্টি হইয়াছে। এই দৃশ্যের কিয়দংশ উধৃত করিতেছি ঃ—

প্রথম পথিক। উদ্ধবও নয়, তোমার অর্জুনও নয়।

অন্যান্য পথিক। হুঁ—ভাল বলিলে, তুমিই সর্বাপেক্ষা পণ্ডিত, 'উদ্ধবও নয়, অর্জুন ও নয়, তবে কে, তুই কৃষ্ণ বুঝি বলিবে।

১ পথি। ওরে মূঢ়গণ, কৃষ্ণের চরিত্র তোরা কি বুঝিবি। কৃষ্ণ যে একাকৃতি দুই দেহ ধারণ করিবেন, ইহাতে আশ্চর্য কি ? তোমরা কৃষ্ণকে চেন না, এই কারণ উপহাস করিতেছ।

অন্যান্য পথি। তুমিই চিনিয়াছ, তাই একটাকে দুইটা দেখিতেছ।

৩ পথি। বল দেখি কয়টা অঙ্গুলি নড়িতেছে।

[আপনার অঙ্গুলি নাড়িয়া দেখাইতেছে]।

অন্যান্য পথি। না না উহাকে দেখাইও না, ও একটার পরিবর্তে দুইটা বলিয়া বসিবে।

১ পথি। রহস্য করিও না। যিনি ষোড়শ শত গোপিকার গৃহে ষোড়শ শত রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, তিনি যে দুই দেহ ধারণ করিবেন তাহার আশ্চর্য কি ? তোরা অতি মূর্খ, এ জন্য রহস্য করিতেছিস্।

[তৃতীয় অঙ্ক, ৫ম সংযোগস্থল]

এই অংশে লঘু-চপল কৌতুক গাম্ভীর্যের মধ্যে পর্যবসান লাভ করিয়াছে।

'ভদ্রার্জুন'-রচয়িতা তারাচরণ নাট্যকার হিসাবে খ্যাতি অর্জন করিতে পারেন নাই। কিন্তু বাংলা নাট্য-সাহিত্যের আদিযুগেই রামনারায়ণ কমেডি বা মিলনান্ত নাটক রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। নাট্য-রচনায় তাঁহার প্রতিভা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত এবং হাস্যরসের পরিবেশনেও তাঁহার দক্ষতা ছিল প্রচুর। প্রতীচ্য শিক্ষায় শিক্ষিত না হইলেও তিনি অনেক বিষয়ে ছিলেন যুগের অগ্রগামী; তাঁহার রচনার মধ্যে আমরা তাঁহার সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হই। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার যেমন অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল, ইংরেজি ভাষায় যদি তাঁহার তেমন অধিকার থাকিত, তাহা হইলে সম্ভবতঃ তিনি বাংলার নাট্য-সাহিত্যকে অধিকতর

শ্রীমণ্ডিত করিতে পারিতেন। তাঁহার রচনাবলীকে প্রধানতঃ চারি ভাগে বিভক্ত করা যায়। (১) মৌলিক সামাজিক নাটক যেমন —কুলীনকুলসর্বস্ব (১৮৫৪), নবনাটক (১৮৬৬); (২) মৌলিক পৌরাণিক নাটক, যথা—রুক্মিণীহরণ নাটক (১৮৭১), ধর্মবিজয় নাটক (১৮৭৫), কংসবধ নাটক (১৮৭৫), (৩) সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ, যথা—বেণীসংহার নাটক (১৮৫৬), রত্নাবলী নাটক (১৮৫৮), অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটক (১৮৬০), মালতীমাধব নাটক (১৮৬৮), (৪) প্রহসন, যথা—(১) যেমন কর্ম তেমন ফল, উভয় সঙ্কট (১৮৬৯), চক্ষুদান (১৮৬৯)। এতদ্ব্যতীত, তিনি সংস্কৃত ভাষায়ও 'দক্ষযজ্ঞ' নামে কাব্য এবং 'মহাবিদ্যারাধন' ও 'আর্যাশতকম্' নামে দুইখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। যদিও রামনারায়ণের সাহিত্য-সাধনা ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তথাপি তাঁহাকে আদি পর্বের নাট্যকার বলিয়াই গণনা করিতে হইবে। বাংলার নাট্য-সাহিত্যে রামনায়ণের আবির্ভাবের চার বৎসর পরে মধুসূদন ও ছয় বৎসর পরে দীনবন্ধুর আবির্ভাব হয়, ফলে, বাংলা নাটক শৈশবকাল অতিক্রম করিয়া কৈশোরে পদার্পণ করে ও উহার অঙ্গে লাবণ্য ও কমনীয়তার সঞ্চার হয়। বস্তুতঃ মধুসূদনের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা নাটকের দ্বিতীয় পর্বের সূত্রপাত হয়। বেলগাছিয়ায় পাইকপাড়ার রাজাদের রঙ্গমঞ্চে রামনারায়ণের 'রত্নাবলী' অভিনয়-দর্শনই যে মধুসূদনের মনে নাটক-রচনার প্রেরণা জাগায়, সে কথা সকলেই জানেন।

রামনারায়ণ সংস্কৃত হইতে অনূদিত নাটকসমূহে চলতি ভাষার প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে সংলাপ অনেকাংশে অভিনয়ের উপযোগী হইয়াছে। 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকের স্থানে স্থানে পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দে রচিত পদ্য পাঠ করিয়া মনে হয়, তিনি পূর্বগামীদের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। মনীষী

রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'বিবিধার্থ-সংগ্রহে' ও কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তাঁহার 'স্মৃতিকথায়' কুলীনকুলসর্বস্বের প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাতে নাটকীয় ঐক্য রক্ষিত হয় নাই, ইহা কতকগুলি বিচ্ছিন্ন দৃশ্যের সমষ্টি মাত্র। অবশ্য দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' সম্পর্কেও এরূপ মন্তব্য আংশিক ভাবে সত্য। রামনারায়ণ এই নাটকখানিতে এবং 'নবনাটকে' সমাজের নানারূপ কুপ্রথার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি-না এতদ্বিষয়ক বিচার' প্রকাশিত হয় এবং ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে এই সামাজিক নিবন্ধের দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশিত হয়। রামনারায়ণ ইহারও কয়েক বৎসর পূর্বে 'নবনাটকে (১৮৬৬) বহু বিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথার দোষ প্রদর্শন করেন।

তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' যেমন প্রথম মুদ্রিত বাংলা নাটক, রামনারায়ণের 'কুলীন-কুল সর্বস্ব' তেমনই সম্ভবত প্রথম অভিনীত নাটক। জয়রাম বসাকের বাটীতে ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে বাংলার বহু শিক্ষিত দর্শকের সম্মুখে নাটকখানির অভিনয় হয়। শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখিয়াছেন—'কুলীনদের কুরীতি-সম্বন্ধে সত্য কথা প্রচার করায় অভিনয় দেখিয়া কুলীনেরা বড়ই চটিয়া যাইতেন। একদিন কয়েকজন পণ্ডিত ক্রোধে রামনারায়ণের সামনেই পৈতা ছিঁড়িয়া তাহাকে অভিশাপ দিয়া যান। নাটকের অভিনয়ে কিন্তু সামাজিক গ্লানি বিদূরিত হইতে থাকে'। [সাহিত্যের কথা, পৃঃ ২৭৩।]

নাটক-রচনায় রামনারায়ণ কখনও ভণ্ডামির আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। তিনি অনেক বিষয়ে যুগের অগ্রগামী ছিলেন। কোন কোন বিষয়ে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অপেক্ষা তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি উদারতর ছিল। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আমাদিগকে শুধু মাতৃভাষার চর্চায় উৎসাহিত করিয়াছেন, রামনারায়ণ শুধু মাতৃভাষার চর্চায় উৎসাহিত করেন নাই, পাশ্চাত্ত্য ভাষায় লিখিত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থরাজি

মাতৃভাষায় অনূদিত করিয়া উহাকে সম্পদ্‌শালিনী করিয়া তুলিবার জন্যও তরুণগণের নিকট আহ্বান জানাইয়াছেন। মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও তারাশঙ্কর তর্করত্নের ন্যায় তিনিও যে স্ত্রীশিক্ষার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহার প্রথম রচিত পুস্তক পতিব্রতোপাখ্যানে উহার প্রমাণ আছে। [সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ৫, পৃঃ ১৭—১৮ দ্রষ্টব্য]। হিন্দু মেট্রোপোলিটান বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিকট বক্তৃতা-প্রদান কালে তিনি বলিয়াছেন—

'প্রাচীন পণ্ডিতেরা জন্মভূমিকে জননীর তুল্য বলিয়াছেন, সুতরাং সেই জন্মভূমিকে দুরবস্থা হইতে মোচন না করা আর ব্যাধি-পীড়িতা জননীকে ঔষধ প্রদান ও শুশ্রূষা-বিধানাদি দ্বারা সুস্থা না করা তুল্য কথা।'

নিম্নের পংক্তিগুলি ঈশ্বর গুপ্তের একটি সুবিখ্যাত কবিতার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়—

'যে ব্যক্তি দেশান্তরে অবস্থান করে সেই ব্যক্তিই জন্মভূমির মর্মস্নেহ অবগত থাকে, জন্মভূমি তাহারই আনন্দভূমি বোধ হয়, অতএব সেই আনন্দভূমির প্রতি যাহার স্নেহ নাই, সে কি মনুষ্য ?'

এই বক্তৃতাতেই তিনি বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদের দ্বারা বঙ্গভারতীকে শ্রীসম্পন্ন করিবার জন্য যুবকদের নিকট অনুরোধ জানাইয়াছেন। সুতরাং রামনারায়ণের দৃষ্টিভঙ্গি যে অতি উদার ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। রামনারায়ণের ন্যায় প্রতিভাশালী পণ্ডিত যদি প্রতীচ্যের নাট্য-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হইতেন, তবে বোধ হয় তিনি বাংলা নাটকে কৈশোরোচিত লাবণ্যের সঞ্চার করিতে পারিতেন। রামনারায়ণ শুধু প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না ; তিনি ছিলেন স্বদেশ-প্রেমিক, স্বজাতি-বৎসল ও অনেক বিষয়ে যুগের অগ্রগামী। তাই তিনি প্রত্যেক বাঙ্গালীর, বিশেষতঃ বাংলার প্রত্যেক সাহিত্য-রসিকের স্মরণীয়।

আমার মনে হয়, রামনারায়ণের সামাজিক নাটকসমূহের সাফল্যের অন্যতম কারণ এই যে মানুষ রামনারায়ণ ও নাট্যকার রামনারায়ণে কোন বিরোধ ছিল না। হয়তো বা মানুষ রামনারায়ণই নাট্যকার রামনারায়ণের চেয়ে বড় ছিলেন। রামনারায়ণের সংস্কার-মুক্ত মন ও চিন্তার অগ্রগতির সহিত পরিচিত না হইলে তাঁহার নাটকগুলির সম্যক মূল্য বিচার করা সম্ভবপর নহে।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলার প্রবন্ধ-সাহিত্য

[১৮২৫—১৮৯৪]

বাংলাদেশের যে তিনজন স্মরণীয় ও বরণীয় পুরুষ একদিন আত্ম-চেতনাহীন স্বধর্মভ্রষ্ট বাঙ্গালী জাতিকে আত্মপ্রবুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র ভূদেবের বুদ্ধিই পরিপূর্ণভাবে মোহনির্মুক্ত ছিল।

আমরা বলিতেছি দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ ও ভূদেবের কথা। ইঁহারা তিনজনেই হিন্দু কলেজের ছাত্র। দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন ভক্ত, তাঁহার মধ্যে যে সহজাত কবি-দৃষ্টি ও কবি-প্রকৃতি ছিল, তাঁহার রচনাবলীতেও উহা পরিস্ফুট। উপনিষদের ঋষিগণ ও সুফী সাধকগণের ভাবধারার উত্তরাধিকারী ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ, পৌরাণিক ভক্তিধর্মও তাঁহার চিত্তে কিয়ৎ পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, কিন্তু তিনি আমাদের সনাতন সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তনের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না, এ বিষয়ে তিনি ছিলেন অনেকটা 'রক্ষণশীল'। এদিকে রাজনারায়ণ সকল বিষয়ে 'অগ্রগতিতে' বিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু কোন বিষয়েই উগ্রতা বা আতিশয্যের প্রশ্রয় দিতেন না। আবার ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য বা মহিমা কোথায়, তত্ত্বদর্শী ভূদেবের স্বচ্ছ নির্মল বুদ্ধিতে উহা ধরা দিয়াছিল অথচ অন্যান্য সমাজের গৌরব-সম্পর্কেও তিনি কদাচ উদাসীন ছিলেন না। বাস্তবিক, রক্ষণশীলতার সঙ্গে যুক্তিবাদ ও উদার দৃষ্টিভঙ্গির এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল ভূদেবের মধ্যে।

ভূদেবের বাল্য-জীবনেই এমন একটি অভাবনীয় ঘটনা ঘটে যাহা তাঁহার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করিয়াছিল। সেই ঘটনা

হইতে আমরা বুঝিতে পারি, কেন তাঁহার বুদ্ধি একদিনের জন্যও মোহগ্রস্ত হয় নাই। এই স্বচ্ছ নির্মল বুদ্ধি ও সূক্ষ্মদৃষ্টিই ভূদেবের রচনাবলীকে এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে।

চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক বিশ্বনাথ তর্কভূষণের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি অল্প ছিল না, তথাপি তিনি পুত্র ভূদেবকে যুগোপযোগী শিক্ষা-লাভের জন্য হিন্দু কলেজে প্রেরণ করিয়াছিলেন। যেদিন ভূদেব কলেজে প্রবিষ্ট হন, সেই দিনই একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটে।

কলেজে ভূগোলের অধ্যাপক ভূদেবের পিতার কথা জানিতেন। অধ্যাপক বলিলেন—পৃথিবীর আকার গোল কিন্তু ভূদেব, তোমার বাবা এ কথা মানিবেন না। শিক্ষকের কথায় বালক ভূদেবের হৃদয় ক্ষুব্ধ হইল, কিন্তু তিনি কোন উত্তর করিলেন না। গৃহে গিয়া তিনি পিতার নিকট অকপটে সকল কথা নিবেদন করিলেন। তখন তাঁহার পিতা তাঁহাকে একখানি সুবিখ্যাত প্রাচীন গ্রন্থ হইতে দেখাইয়া দিলেন, পৃথিবী যে গোল, ভারতীয় পণ্ডিতগণ এ তত্ত্ব অবগত ছিলেন। পিতার নির্দেশমত ভূদেব গ্রন্থ খুলিয়া দেখিলেন, উহাতে লিখিত আছে—'করতলাকলিতামলকবৎ বদন্তি যে গোলম্।' গ্রন্থ-মধ্যে এই উক্তিটি দেখিতে পাইয়া এবং পিতার মুখে পৃথিবীর গোলত্বের প্রমাণ শুনিয়া তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। পরদিন তিনি বিনীতভাবে অথচ দৃঢ়কণ্ঠে শিক্ষককে বুঝাইয়া দিলেন, ম্যাগেলান ও ড্রেকের বহু পূর্বেই আর্য মনীষিগণ পৃথিবীর গোলত্ব সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন।

বিধাতার অনুগ্রহে ও অনুকূল পারিবারিক পরিবেশের প্রভাবে ভূদেবের মধ্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব কোন দিনই প্রকট হয় নাই। ভারতীয় আদর্শের মধ্যে যাহা শুভ, যাহা ধ্রুব, যাহা শাশ্বত, যাহা সনাতন তাহার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাকে ভূদেব আপনার কর্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তিনি এই সত্য

উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে আমাদের শাস্ত্রকারগণ আমাদিগকে শুধু পারলৌকিক কল্যাণের পন্থাই নির্দেশ করেন নাই,—যে পথে চলিলে আমাদের ইহলোকে সুখ ও পরলোকে কল্যাণ হয়, তাঁহারা আমাদিগকে সেই পথে চলিতে উপদেশ দিয়াছেন। ভূদেব সুস্পষ্ট কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে, আমাদের শাস্ত্রকারগণ যেমন ইহলোক-সর্বস্ব ছিলেন না, তেমনই ইহকালের প্রতি উদাসীনও ছিলেন না। সে যুগে আমাদের দেশে এ কথা প্রচারের প্রয়োজন ছিল, কারণ, আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, আমাদের পূর্বপুরুষগণ শুধু অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের আলোচনায়ই সময়ক্ষেপ করিয়াছেন, জীবনকে তাঁহারা শুধু নলিনীদলগত জলের ন্যায় তরল বলিয়া মনে করিয়াছেন, কমলাকে তাঁহারা 'চঞ্চলা' এই বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন, জগৎকে তাঁহারা স্বপ্নের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন, আর বিষয়-সুখকে মৃগ-তৃষ্ণিকার মত দুঃখদায়ক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের এই সকল পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিগণ ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না; এমন কি, আমাদের জাতীয় মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতের তাৎপর্যও তাঁহারা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করেন নাই। ফলতঃ, ভারতের অদ্বিতীয় মহাকবি বাল্মীকি ও ব্যাস এবং মনু প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ যে জীবনদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বিস্ময়কর। আমরা ভূদেবের রচনাবলীতেও এই সামগ্রিক দৃষ্টির পরিচয় পাই।

প্রত্যেক জাতির জীবনেই ধর্ম ও আচার ওতপ্রোতভাবে জড়িত, অবশ্য 'ধর্ম' কথাটিকে যদি আমরা 'Religion' অর্থে প্রয়োগ করি, তবেই এ কথা বলা বলে। আমাদের শাস্ত্রকারেরা কিন্তু প্রধানত 'ধর্ম' কথাটিকে 'আচার' অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহাদের

মতে আমাদের জীবনের লক্ষ্য হইতেছে—ধর্ম বা আচারকে অবলম্বন করিয়াই ধর্মকে অতিক্রম করা। বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু তাঁহার 'ধর্ম-ব্যাখ্যায়' আচারের কোন স্থানই নির্দেশ করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে সমস্ত বৃত্তির অনুশীলনের নাম 'ধর্ম'। ভূদেব ব্যক্তিগত জীবনে আচার-নিষ্ঠ ছিলেন বলিয়াই আচারের উপযোগিতা সম্যক বুঝিতে পারিয়াছিলেন। যে যুগের শিক্ষাভিমানী তরুণগণ আর্য ঋষিগণের প্রবর্তিত আচারসমূহকে 'কুসংস্কার' বলিয়া বর্জন করিয়াছিলেন, সেই যুগে স্বাজাত্যাভিমানী ভূদেব সদাচারের মহিমা কীর্তন করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। তাঁহার মতে আচার বলিতে চারি শ্রেণীর কর্ম বুঝা যায়, যথা—(ক) নিত্য কর্ম, (খ) উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি নৈমিত্তিক কর্ম, (গ) শ্রাদ্ধ, (ঘ) ব্রত ও পূজা। নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে সকলেই ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে আচারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিবেন। ('বর্তমান', ১৩৫৫, শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায়ের 'হিন্দুর আচারবাদ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।) 'সদাচারের' প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ভূদেব বলিয়াছেন—

'মনুষ্যে পশুধর্ম এবং জড়ধর্ম দুই-ই আছে। পশুধর্ম হইতে স্বেচ্ছাচার জন্মে। যখন যাহা করিতে ইচ্ছা হইল, তখনই তাহা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া, তাহার ফলাফল বিচার না করা পশুর ধর্ম। ঐ পশুভাবের ন্যূনতা-সাধন আমাদিগের শাস্ত্রের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য। শাস্ত্রের অভিপ্রায়, মানুষ আপন উদ্দেশ্যের স্থিরতা, চিত্তের প্রশস্ততা এবং শরীরের পটুতা সম্বর্ধন সহকারে সকল কাজ করেন। খাবার সামগ্রী দেখিলেই খাইলাম, শয়নের ইচ্ছা হইলেই শুইলাম, ক্রোধাদির প্রবৃত্তি হইলেই তদনুযায়ী কার্য করিলাম, এইরূপ যথেচ্ছ ব্যবহার আর্যশাস্ত্রের বিগর্হিত। এগুলির নিবারণ শাস্ত্রাচারের সুপালন ভিন্ন আর কোন প্রকারেই সুন্দররূপে সিদ্ধ হয়

না। শাস্ত্রাচারের পালনেই সত্ত্বগুণের সম্বর্ধন হইয়া ঐ সকল রজোগুণসম্ভূত দোষের পরিহার হইতে পারে।'

'সামাজিক প্রবন্ধে' ভূদেব গভীর মননশীলতা ও সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। ভূদেব এই গ্রন্থে দেখাইয়াছেন, জাতিভেদে যেমন সামাজিক গঠনের ভিন্নতা হয়, তেমনই ইতিহাস-রচনার পদ্ধতিও স্বতন্ত্র হইয়া থাকে। এই গ্রন্থে তিনি শুধু আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যই প্রদর্শন করেন নাই—যে সমাজে যে যে গুণ লক্ষণীয়, তাহার দিকেও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। ভূদেব লিখিয়াছেন—

'প্রত্যেক বিষয়ে ইংরেজের অযথা অনুকরণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইংরেজের প্রকৃতির সহিত হিন্দুর প্রকৃতির একতা নাই। ইংরেজ কার্যকুশল, অহঙ্কারী ও লোভী। হিন্দু শ্রমশীল, সুবোধ, নম্রস্বভাব এবং সন্তুষ্টচিত্ত। ইংরেজ আত্মসর্বস্ব, হিন্দু পরার্থপর। ইংরেজের নিকট হিন্দুকে কেবল কার্যকুশলতা শিখিতে হয়। আর কিছু শিখিবার প্রয়োজন হয় না।'

'সামাজিক প্রবন্ধে' ভূদেব যে স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা আজও আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে। অবশ্য, তাঁহার সকল সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বা সর্বজনের গ্রাহ্য নয়, কিন্তু একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, তাঁহার ন্যায় মনস্বী ব্যক্তি আমাদের দেশে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। স্যার চার্লস এল্‌ফ্রেড ইলিয়ট 'সামাজিক প্রবন্ধ' সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সকলেরই প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন—

'No single volume in India contains so much wisdom and none shows such extensive reading. It is the result of the lifelong study and observation of a Brahmin of the old class in the formation of whose

mind Eastern and Western Philosophy has had an equal share.'

বাস্তবিক, 'সামাজিক প্রবন্ধে' এক দিকে যেমন ভূদেবের ভূয়োদর্শন ও দূরদর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়, অপরদিকে তেমনই তাঁহার নিপুণ বিশ্লেষণশক্তিরও নিদর্শন মিলে। 'ভারতবর্ষে মুসলমান' শীর্ষক প্রবন্ধে ভূদেব মুসলমান জাতির সম্মেলন-প্রবণতা বা সঙ্ঘ-চেতনা, ভারতের বহিঃস্থিত মুসলমানগণের প্রতি ভারতীয় মুসলমানের সহজ প্রীতি, মুসলমানের উপর হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব, ভারতে মুসলমান শাসনের ফল, হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের বাধা, ইংরেজের ভেদনীতি ও উহার পরিণাম প্রভৃতি বহু বিষয় নিরপেক্ষ-ভাবে অথচ গভীর সহানুভূতির সহিত আলোচনা করিয়াছেন। 'ভারতবর্ষে খৃষ্টানাদি' প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন—'ইংরেজ জাতির ভাষা শিখিলেই বা কি, আর তাহার ধর্ম গ্রহণ করিলেই বা কি, ইংরাজ কিছুতেই পরকে আপনার করিতে পারেন না।' ইংরেজের স্বার্থপরতা, উন্নতিশীলতা, সাম্য, ঐহিকতা, স্বাতন্ত্রিকতা, বৈজ্ঞানিকতা ও রাজ্যের সমাজ-প্রতিভূত্ব এবং ইংরেজের বণিকভাব, রাজভাব, বৈদেশিকভাব প্রভৃতি বিষয় তিনি নিপুণভাবে আলোচনা করিয়াছেন। 'সামাজিক প্রবন্ধে' ভূদেবের দৃষ্টি শুধু অতীত ও বর্তমানের দিকে নিবদ্ধ নয়, ভবিষ্যতের দিকেও তিনি দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করিয়াছেন কিন্তু তিনি কোথাও আবেগ-প্রবণতা বা কল্পনা-বিলাসের পরিচয় দেন নাই। ভারতবাসীর জীবনের কত বিভিন্ন সমস্যা-সম্পর্কে তিনি চিন্তা করিয়াছেন, 'সামাজিক প্রবন্ধের' পাঠকমাত্রেই তাহা জানেন। ভারতীয় আদিবাসীদিগের সমস্যাও তাঁহার সর্বতোমুখী দৃষ্টিকে অতিক্রম করে নাই। 'নেতৃ-পরীক্ষা'র প্রসঙ্গে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা এ যুগেও আমাদের স্মরণীয়। তিনি বলিয়াছেন—'স্বজাতীয়ের নিন্দা করা, স্বজাতীয়ের দোষ ধরা,

স্বজাতীয়ের অনুবর্তন না করা ইহাই আমাদিগের মর্মগত মহাপাপ এবং আমাদিগের বর্তমান দুরবস্থা এবং অধঃপাত ঐ পাপের অবশ্যম্ভাবী ফল এবং তাহার প্রায়শ্চিত্ত। যখন আমাদের প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হইবে, তখনই আমরা স্বদেশীয় মহাত্মাদিগের গুণগরিমা দেখিতে পাইব।'

ভূদেবের অন্যান্য গ্রন্থ অপেক্ষা 'পারিবারিক প্রবন্ধ'ই আমাদের দেশে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। আমাদের দেশে ভগবান মনু চতুরাশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রমেরই সমধিক উৎকর্ষ স্থাপন করিয়াছেন। ভূদেব স্বয়ং মিতাহারী, মিতাচারী, নিষ্ঠাবান, কর্তব্যপরায়ণ আদর্শ গৃহস্থ ছিলেন; আমরাও যাহাতে কল্যাণের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপ্রমত্ত ভাবে গার্হস্থ্যধর্মের আচরণ করিতে পারি, সেই উদ্দেশ্যেই তিনি 'পারিবারিক প্রবন্ধ' রচনা করিয়াছেন। প্রবন্ধগুলিতে ভূদেবের ভূয়োদর্শন, সূক্ষ্মদর্শিতা ও ব্যবহারিক জ্ঞানের পরিচয় রহিয়াছে।

'পুষ্পাঞ্জলি'তে ভূদেবের কবিদৃষ্টির ও ঋষিদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি যে ভারতীয় তীর্থস্থানসমূহের গৌরব নূতন ভাব-দৃষ্টির দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এই গ্রন্থে তাহার পরিচয় আছে। তিনি এই গ্রন্থে রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সনাতন ভারতেরই মর্ম-বাণী প্রচার করিয়াছেন। একজন পরম জ্ঞানী ব্যক্তির মুখে তিনি নিম্নোক্ত কথাগুলি সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন:—

'আমরা পরমযোগী মহাদেবের সেবক। সহ্য আমাদিগের ব্যসস্থান, তপস্যা আমাদিগের কর্ম, যোগ আমাদিগের অবলম্বন। সহ্য, তপস্যা এবং যোগাভ্যাস তিনেই এক পদার্থ। সহ্যবাসী হইয়া চঞ্চল হইব না; তপশ্চারী হইরা বিলাসকামী হইব না; যোগাবলম্বী হইয়া যোগভ্রষ্ট হইব না।

'কষ্টস্বীকার সর্ব ধর্মের মূল কর্ম। সহিষ্ণুতা সকল শক্তির প্রধান শক্তি। যে ক্লেশ স্বীকার করিতে পারে, তাহার অসাধ্য

কিছুই থাকে না। ভূতনাথ দেবাদিদেব চিরতপস্বী; এইজন্য মহাশক্তি ভগবতী তাঁহার চিরসঙ্গিনী'।

'বিবিধ প্রবন্ধে'র প্রত্যেকটি প্রবন্ধেই ভূদেবের মনস্বিতার পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্র-সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনাও এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্র-সম্পর্কে তাঁহার বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই।

'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে' ভূদেবের ঐতিহাসিক কল্পনা ও স্বাধীনতাস্পৃহার পরিচয় পাওয়া যায়। ভূদেব যে শুধু তথ্যদর্শী ছিলেন, তাহা নয়, তাঁহার মধ্যে যে ভাবুকের ধ্যানদৃষ্টিও ছিল, গ্রন্থখানিতে তাহারও প্রমাণ রহিয়াছে।

ভূদেবের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র তিন বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ-প্রণয়নে ভূদেবের উদ্দেশ্য ছিল গল্পচ্ছলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রকৃত বিবরণ এবং হিতোপদেশ শিক্ষা দেওয়া। ভূদেব স্বয়ং বলিয়াছেন, এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রথম উপন্যাস 'সফল স্বপ্ন' ও দ্বিতীয় উপন্যাস 'অঙ্গুরী বিনিময়ের' কিয়দংশ ইংরেজি গ্রন্থ Romance of History হইতে গৃহীত হইয়াছে।

ভূদেবের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' দুইটি কারণে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। প্রথমতঃ, এই গ্রন্থের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' নামক উপন্যাসটি হইতেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিক প্রণয়কাহিনী-মূলক উপন্যাসের সূত্রপাত হয়; দ্বিতীয়তঃ, দুর্গেশনন্দিনীর আখ্যান-বস্তুর পরিকল্পনায় এই উপন্যাসটির প্রভাব রহিয়াছে। ভূদেব যদি শিল্পিজনোচিত নৈপুণ্যের অধিকারী হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' সে যুগের পাঠকগণের অধিকতর মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইত, সন্দেহ নাই।

সমালোচনা-সাহিত্যেও ভূদেবের দান স্মরণীয়। তাঁহার 'উত্তর-রামচরিত,' 'মৃচ্ছকটিক' প্রভৃতি গ্রন্থের সমালোচনা সে যুগে ভারতীয় সংস্কৃতির উপর নূতন আলোকপাত করিয়াছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ভূদেব প্রাচীন সাহিত্যের রসগ্রাহী সমালোচনার পথে অগ্রসর হন নাই; পুরাতন সাহিত্যের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষের যে মহিমময় ও গৌরবোজ্জ্বল রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেই দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এ বিষয়ে আর একজন মনস্বী লেখকও ভূদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন—তিনি ভূদেবের ভাবধারার উত্তরাধিকারী চন্দ্রনাথ বসু। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেরণায়ই চন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার 'সাবিত্রী-তত্ত্ব', 'শকুন্তলা-তত্ত্ব' প্রভৃতি গ্রন্থসমূহও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বাস্তবিক, ভূদেব ও চন্দ্রনাথ উভয়েই সমালোচনার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক পদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছেন।

ভূদেবের প্রবন্ধাবলীর বৈশিষ্ট্য চিন্তার স্বচ্ছতা ও প্রকাশ-ভঙ্গির স্পষ্টতা (clarity of thought and expression) এবং নাতি-দীর্ঘতা। সেণ্টস্ বেরী যে ধরণের নিবন্ধকে 'গদ্যের আশ্রয়ে শিল্পকৃতি' বলিয়াছেন, ভূদেব সে ধরণের নিবন্ধ রচনা করেন নাই, জ্ঞানগর্ভ উক্তিসমূহ লঘু হাস্যরসের ছটায় স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল করিয়া তিনি পাঠকগণকে পরিবেশন করেন নাই, গুরুর আসনে উপবিষ্ট হইয়াই তিনি আমাদিগকে শ্রেয়ের পথ নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার উপদেশে কোথাও অহমিকা প্রকাশ পায় নাই, কারণ, তিনি তাঁহার স্বদেশবাসীকে অন্তরের সহিত ভালবাসিয়াছেন এবং তাহাদিগের বুদ্ধি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-দীক্ষায় মোহগ্রস্ত হইতেছে দেখিয়া বেদনা অনুভব করিয়াছেন।

ভূদেবের রচনার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে উচ্ছ্বাসরাহিত্য। ভূদেব যে জাতীয়তার আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, পরবর্তী কালে

দুইজন বাঙালী সন্ন্যাসীও সেই আদর্শেরই মহিমা কীর্তন করিয়াছেন। ইঁহাদের একজন কৃষ্ণানন্দ স্বামী আর একজন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। কিন্তু ইঁহাদের উভয়েরই রচনায় বা বক্তৃতায় হৃদয়াবেগের প্রাবল্য দেখা যায় আর ভূদেবের রচনায় যুক্তিবাদই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই দিক দিয়া ভূদেবের রচনা অনেকাংশে বেকনের সন্দর্ভের সহিত তুলনীয়।

ভূদেবের রচনার আর একটি মহৎ গুণ এই যে উহা আমাদের চিন্তাকে জাগাইয়া তোলে (thought-provoking)। ভূদেবের সিদ্ধান্ত হয়তো আমরা সকল স্থলে মানিয়া লইতে পারি না, কিন্তু তাঁহার কোন কথাই যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া উড়াইয়া দিতেও পারি না।

ভূদেব যে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ-লেখক, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইংরেজিতে যে ধরণের দীর্ঘ প্রবন্ধকে dissertation বলে, সেই ধরণের কোন দীর্ঘায়ত প্রবন্ধ ভূদেব রচনা করেন নাই। রাজা রামমোহনের 'সহমরণবিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তক সংবাদ', বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ ও বহুবিবাহ-সম্পর্কিত গ্রন্থ অথবা অক্ষয়কুমারের 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার' প্রভৃতি এই ধরণের প্রস্তাব বা dissertation। বাংলায় নাতিদীর্ঘ, যুক্তিগর্ভ অথচ সাহিত্যগুণে মণ্ডিত প্রবন্ধ রচনা করিয়া যাঁহারা বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অক্ষয়কুমার ও ভূদেবের নামই সর্বাগ্রে স্মরণীয়। বাস্তবিক, অক্ষয়কুমারের 'চারুপাঠ' ও ভূদেবের 'আচার প্রবন্ধ', 'সামাজিক প্রবন্ধ', 'পারিবারিক প্রবন্ধ' ও 'বিবিধ প্রবন্ধ' উৎকৃষ্ট সাহিত্যিক রচনার নিদর্শন হিসাবে চিরদিন মর্যাদা লাভের যোগ্য। কিন্তু বাংলাদেশের এই দুইজন মনীষীর মধ্যে একমাত্র ভূদেবের বুদ্ধিই কোন দিন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার মোহে আচ্ছন্ন হয় নাই। এই দিক দিয়া ভূদেব বাংলার প্রবন্ধ-সাহিত্যে চিরদিন একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকিবেন।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঐতিহাসিক আখ্যান-কাব্য

(১৮২৭—১৮৮৭)

কোন কোন সমালোচক রঙ্গলালকে 'যুগসন্ধির কবি' বলিয়াছেন। কিন্তু যে অর্থে ঈশ্বর গুপ্তকে যুগসন্ধির কবি বলা হইয়া থাকে, রঙ্গলালের প্রতি সে অর্থে ইহা প্রযোজ্য নহে। ঈশ্বর গুপ্ত প্রাচীন ভাবধারার শেষ কবিও বটেন, আবার আধুনিক চিন্তাধারার প্রথম কবিও বটেন, তাই প্রাচীন ভাবধারার উত্তরাধিকারী এবং খাঁটি বাঙ্গালী কবি হইয়াও তিনি সাময়িক চিন্তাধারার প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারেন নাই। কিন্তু রঙ্গলাল চিন্তাধারায় সম্পূর্ণ আধুনিক, তাঁহার কাব্যেই সর্বপ্রথম প্রতীচ্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গলীর আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হইয়াছে, এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, স্বাজাত্যবোধ ও ঐতিহাসিক চেতনা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাই দার্শনিক পণ্ডিত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহাকে 'স্বাজাত্য-বোধের আদ্যাচার্য্য' বলিয়াছেন। তথাপি এ কথা সত্য, যে কবি-প্রতিভার বলে মানুষ বর্ণনীয় বিষয়ের উপযোগী নব-নব ছন্দের আবিষ্কার করিতে বা দেশ-বিদেশের কাব্য-সাহিত্য হইতে নব-নব ছন্দ আহরণ করিয়া বঙ্গবাণীকে সম্পন্ন করিতে পারেন, সে প্রাতিভা রঙ্গলালের ছিল না বলিয়াই তিনি ছন্দের দিক দিয়া প্রাচীন-পন্থী ও বৈশিষ্ট্য-বর্জিত ;— রঙ্গলালের চিন্তা যতই আধুনিক হউক, ছন্দের প্রয়োগে তিনি প্রাচীনের অনুগামী, আর এই অর্থেই কোন কোন সমালোচক রঙ্গলালকে যুগসন্ধির কবি বলিয়াছেন।

রঙ্গলালের দৃষ্টি ঈশ্বর গুপ্তের মত শুধু বাংলাদেশে সীমাবদ্ধ ছিল না, ভারতের অতীত ইতিহাসের গৌরবময় কাহিনীর দিকেও

তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। তাই রঙ্গলালই বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক আখ্যান-কাব্য বা গাথা-কাব্যের প্রবর্তক, তাঁহার 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮), 'কর্ম্মদেবী' (১৮৬১), 'শূরসুন্দরী' (১৮৬৮) ও 'কাঞ্চীকাবেরী' (১৮৭৯) ইতিহাস ও জনশ্রুতি অবলম্বনে রচিত। রঙ্গলাল ইংরেজি ও সংস্কৃত সাহিত্যের রসগ্রাহী ছিলেন এবং সংস্কৃত কাব্যসমূহ হইতে প্রচুর শব্দ আহরণ করিয়া বঙ্গবাণীকে পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন। এ কথাও সত্য যে তাঁহার কবিতায় কষ্ট-কল্পনা ছিল না, উহা নির্ঝরের প্রবাহের মত স্বত-উৎসারিত হইত। কিন্তু যাহাকে নব-নব-উন্মেষশালিনী বুদ্ধি বলে, রঙ্গলাল তাহার অধিকারী ছিলেন না এবং তাঁহার কবি-মানসেরও কোন ক্রম-পরিণতি লক্ষ্য করা যায় না।

রঙ্গলাল কেন পৌরাণিক কাহিনী বর্জন করিয়া অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে কাব্যের আখ্যান-বস্তু গ্রহণ করিয়াছেন, স্বয়ং তাহার কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, পুরাণে বর্ণিত অলৌকিক কাহিনীসমূহ 'অধুনাতন কৃতবিদ্য যুবকদিগের শ্রদ্ধার্হ' নহে, তাই তাঁহাকে ইতিহাসের শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে। টড্ সাহেব-বিরচিত Annals of Rajsthan গ্রন্থে রাজপুতগণের শৌর্য ও পরাক্রমের যে সকল কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে, উহার মধ্যে রঙ্গলাল স্বদেশপ্রেম ও স্বাজাত্য-বোধের নিদর্শন দেখিতে পাইয়াছেন। 'পদ্মিনী উপাখ্যানের' ভূমিকায় রঙ্গলাল বলিয়াছেন—

'বীরত্ব, ধীরত্ব, ধার্মিকত্ব প্রভৃতি নানা সদ্‌গুণালঙ্কারে রাজপুতেরা যেরূপ বিমণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাদিগের পত্নীগণও সেইরূপ সতীত্ব, সুধীত্ব এবং সাহসিকতাগুণে প্রসিদ্ধ ছিলেন। অতএব স্বদেশীয় লোকর গরিমা-প্রতিপাদ্য পদ্যপাঠে লোকের আশু চিত্তাকর্ষণ এবং তদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণে প্রবৃত্তি-প্রধাবন হয়, এই বিবেচনায় আমি

উপস্থিত উপাখ্যান রাজপুত্রেতিহাস অবলম্বনপূর্ব্বক রচিত করিলাম'। সুতরাং দেখা যাইতেছে, স্বদেশ-প্রেম ও স্বাজাত্যা-ভিমানই রঙ্গলালের কাব্যসাধনার মূল উৎস ছিল।

বাংলা কাব্যসাহিত্যের অশ্লীলতা প্রতীচ্য শিক্ষায় শিক্ষিত রঙ্গলালের অন্তরকে ক্ষুব্ধ করিয়াছিল। এইজন্য, ভারতচন্দ্র বা ঈশ্বর গুপ্তের রচনা কিংবা কবির লড়াই প্রভৃতি তাঁহাকে তৃপ্তি দান করিতে পারে নাই। তাই তিনি অশ্লীলতা বা গ্রাম্যতা দোষ পরিহার করিয়া মার্জিতরুচি পাঠকদের জন্য কাব্য-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সম্মুখে মহৎ আদর্শ স্থাপন করাই তাঁহার কাব্যরচনার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। তিনি যে পাশ্চাত্যের কাব্যকানন হইতে বহু ভাবকুসুম আহরণ করিয়া বাঙ্গালী পাঠককে পরিবেশন করিয়াছেন, তাহা স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। তাই, রঙ্গলালের কাব্যেই সর্বপ্রথম প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাবধারা গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমের মত মিলিত হইয়াছে। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য ভাবধারায় অভিষিক্ত রঙ্গলাল ইংরেজি বিদ্যায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রতি সুবিচার করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন, 'বর্ত্তমান সময়ে যে সকল ব্যক্তি ইংলণ্ডীয় বিদ্যায় সুশিক্ষিত নহে, তাহারা মানসিক শক্তিসমূহের পরিচালনা-জনিত সুখসম্ভোগে বঞ্চিত বিধায় তুচ্ছতর ইতর আমোদে অবকাশকাল অতিপাত করিয়া থাকে।'

ইহা যে অতিশয়োক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই।

রঙ্গলাল প্রধানত স্কটের গাথাকাব্য পাঠ করিয়া বাংলা ভাষায় ঐতিহাসিক আখ্যান-কাব্য রচনার প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সম্ভবত স্কটের Lay of the Last Minstrel, Lady of the Lake ও Marmion এবং বায়রণের Child Harold's Pilgrimage প্রভৃতি কাব্য গভীর ভাবে পাঠ করিয়াছিলেন এবং প্রতীচ্য কবিদের স্বদেশ-প্রেম ও স্বাজাত্যবোধ তাঁহাকে আকৃষ্ট

করিয়াছিল। গ্রের (Grey) Elegyর সঙ্গেও তাঁহার পরিচয় ছিল। রঙ্গলালের—

'পরিপূর্ণ খনি কত শত মণি,
কে তার সন্ধান লয় ?
ধনিকণ্ঠহারে, নিরখি তাহারে
চোরের লালসা হয়' ॥

এই পংক্তি কয়টি পড়িতে পড়িতে Elegy র একটি স্তবক মনে পড়িয়া যায়।

'Full many a gem of purest ray serene
The dark unfathomed caves of ocean bear ;
Full many a flower is born to blush unseen
And waste its sweetness on the desert air'.

বায়রণ তাঁহার প্রসিদ্ধ কাব্য Child Harold's Pilgrimageএ কোন দেশ, জাতি বা রাষ্ট্রের ভাগ্যবিপর্যয়ের কথা বর্ণনা করিতে গিয়া জগতের অনিত্যতার কথা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। কবি তাঁহার কাব্যের এক স্থানে বলিয়াছেন—

'The world is at our feet as fragile as our clay'

এই বিষয়ে রঙ্গলাল ও হেমচন্দ্র উভয়েই বায়রণের অনুসরণ করিয়াছেন কিন্তু তাঁহারা কেহই ইংরেজ কবির ন্যায় সংযম রক্ষা করিতে পারেন নাই। চিতোরের ধ্বংসলীলাকে উপলক্ষ্য করিয়া রঙ্গলাল কালের সর্বগ্রাসিত্বের যে দীর্ঘ বর্ণনা দিয়াছেন, উহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করি ঃ—

'করাল কালের কাণ্ড যেন সদা ক্রীড়াভাণ্ড
এ ব্রহ্মাণ্ড আয়ত্ত তাহার।
কি মহৎ কিবা ক্ষুদ্র, কি ব্রাহ্মণ কিবা শূদ্র
তার কাছে সব একাকার ॥

* * * *

যে পথে মান্ধাতা গত, কোটি কোটি শত শত.
সেই পথে যায় দীনগণ।
মান্ধাতা, মনুর জন্য, নাহি আর পথ অন্য,
এক পথ আছে চিরন্তন' ॥

রঙ্গলালের কাব্যেই আমরা সর্বপ্রথম বীররসব্যঞ্জক সমর-সংগীত শুনিতে পাই, কিন্তু তানপ্রধান ছন্দে গ্রথিত হওয়াতে উহা যেন বৈচিত্র্যহীন বা একঘেয়ে হইয়া উঠিয়াছে। ক্ষত্রিয়দের প্রতি ভীমসিংহের উৎসাহবাক্যে বাঙ্গালীর নবজাগ্রত স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হইয়াছে এবং বাঙ্গালী কবির মুখে প্রতীচ্য কবির কথার প্রতিধ্বনি শুনিয়া শিক্ষিত পাঠকগণ বাংলা কাব্যের ভবিষ্যৎ-সম্পর্কে আশ্বস্ত হইয়াছেন। রাজা ক্ষত্রিয়গণকে বলিতেছেন —

'স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায় ?
কোটিকল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ তায় হে,
স্বর্গসুখ তায় ॥

* * * *

সার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে
বাহুবল তার।
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে
দেশের উদ্ধার ॥

অতএব রণভূমে চল ত্বরা যাই হে,
চল ত্বরা যাই।
দেশহিতে মরে যেই, তুল্য তার নাই হে
তুল্য তার নাই'॥

উপরি-উদ্ধৃত পংক্তিগুলির ভাব যে একজন প্রসিদ্ধ ইংরেজ কবির রচনা হইতে গৃহীত হইয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। সত্যই রঙ্গলাল একদিকে বিরাট সংস্কৃত সাহিত্য হইতে শব্দসম্পদ ও অপর দিকে প্রতীচ্য সাহিত্য হইতে ভাবসম্পদ আহরণ করিয়া বাংলা সাহিত্যকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করিয়া গিয়াছেন।

রঙ্গলাল পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে সুপণ্ডিত হইলেও ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। তিনি বিচিত্র ছন্দে কুমার-সম্ভবের প্রথম সাত সর্গের অনুবাদ করেন এবং সংস্কৃত সাহিত্য হইতে সুভাষিতাবলী চয়ন করিয়া 'নীতিকুসুমাঞ্জলি' নামে তাহার অনুবাদ প্রকাশ করেন। রঙ্গলাল শুধু কবি ছিলেন না, সমালোচকও ছিলেন। সমালোচনা-সাহিত্যের শৈশবাস্থাতেই রঙ্গলালের 'বাঙ্গালা কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধ' প্রকাশিত হয়।

রঙ্গলাল যুগস্রষ্টা কবি নহেন কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী এবং যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। রাজপুতদের বীরত্বের কাহিনী তাঁহাকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তিনি রাজস্থানের সতীবিশেষের চরিত্র-অবলম্বনে 'কর্ম্মদেবী' ও বীরাঙ্গনার চরিত্র-অবলম্বনে 'শূরসুন্দরী' রচনা করেন। উড়িষ্যার বীররসাত্মক কাহিনীকে ভিত্তি করিয়া তিনি 'কাঞ্চীকাবেরী' নামে আখ্যান-কাব্য রচনা করেন। রঙ্গলালের রচনার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সহজেই আমাদের চোখে পড়ে।

রঙ্গলালের চিত্রাঙ্কন-নৈপুণ্য ও শব্দচয়নে দক্ষতা ছিল অসাধারণ,—বাস্তবিকই তিনি ছিলেন একজন চিত্রকর। 'কাঞ্চী-

কাবেরীতে' অরণ্যের যে বর্ণনা আছে, তাহা চিত্রধর্ম্মিত্বে বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয়। প্রকৃতির বর্ণ-বৈচিত্র্য এবং একই বর্ণের মধ্যে সূক্ষ্ম প্রকার-ভেদ সম্পর্কে রঙ্গলালের দৃষ্টি সর্বদা সজাগ ছিল। তাঁহার রূপ-বর্ণনায় সংস্কৃত কবিগণের প্রভাব লক্ষণীয়! উপমাদি অলঙ্কারের প্রয়োগেও রঙ্গলালের চাতুর্য ছিল। 'পদ্মিনী উপাখ্যানে' পর্বতের বর্ণনা-প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন—

'তরুণ অরুণ ভাতি জ্বলে কোন স্থলে।
প্রবালের বৃষ্টি যেন হয়েছে অচলে॥
কোথাও তটিনীকুল কুল কুল স্বরে।
শেখরের শ্যাম অঙ্গে চারু শোভা করে॥
যেন রঘুপতি-হৃদে হীরকের হার।
ঝলমল ভানু-করে করে অনিবার'॥

দ্বিতীয়ত, যুদ্ধ-সজ্জা ও যুদ্ধের বর্ণনায় এবং উৎসাহ-ব্যঞ্জক বীর-রসের সৃষ্টিতে রঙ্গলালের পূর্ববর্ত্তী কোন কবি তাঁহার ন্যায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন নাই। পতি-উদ্ধারের জন্য পদ্মিনী যেখানে সমর-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া কারাগারে প্রবেশ করিতেছেন, তাহার বর্ণনা—

'এখানে পদ্মিনী সতী অন্তরে বিচারি।
ধরিলেক সামরিক বেশ মনোহারী॥
দুই স্কন্ধে প্রলম্বিত যুগ্ম শরাসন।
কটিতটে খর করবাল সুশোভন॥
করে ধরিলেন শূল অতি খরশাণ।
পৃষ্ঠে বাঁধা অসি চর্ম্ম, বর্ম্ম পরিধান॥
ধরণী-চুম্বিত চারু বেণী চিকণিয়া।
বিচিত্র কিরীটে বদ্ধ করে বিনাইয়া॥
হইল অপূর্ব্ব শোভা কি কব বিশেষ।
যেন জগদ্ধাত্রী দেবী সমরে প্রবেশ'॥

মেঘনাদবধের তৃতীয় সর্গ-রচনায় মধুসূদন নিঃসন্দেহে রঙ্গলালের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন কিন্তু মধুসূদনের অলোকসামান্য প্রতিভার স্পর্শে প্রমীলার লঙ্কাপ্রবেশের বর্ণনাটি অসামান্য চমৎকারিত্ব লাভ করিয়াছে।

তৃতীয়ত, রাঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান,' 'কাঞ্চীকাবেরী' প্রভৃতি আখ্যান-কাব্যে অতিপ্রাকৃতের অবতারণা দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাতে তাঁহার কাব্যগুলি অনেকটা মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা বলিয়াছি, রঙ্গলালের কাব্যেই সর্বপ্রথম স্বদেশপ্রেম ও স্বাজাত্যবোধ আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু নবযুগের আর একটি বিশিষ্ট লক্ষণ মানবমহিমার স্বীকৃতি, ইহা তাঁহার কাব্যে প্রায় অনুপস্থিত। মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের কাব্যে কিন্তু মানবাত্মার মহিমা বিশেষ ভাবে উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে। অবশ্য ইঁহাদের মধ্যেও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ছিল এবং মধুসূদনের ন্যায় অনন্যদুর্লভ প্রতিভার অধিকারী হেমচন্দ্র বা নবীনচন্দ্র ছিলেন না। তথাপি রসরাজ অমৃতলাল বসুর সহিত আমরা একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব যে রঙ্গলালই প্রথম 'নব্যবঙ্গের হৃদয়ক্ষেত্র উদ্দীপনার রসে সিঞ্চিত করিয়া দেশহিতৈষণার বীজ বপন করিয়াছিলেন'। [সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ৩৭, পৃঃ ৭]

শ্রীমধুসূদন ও বাংলার কাব্যসাহিত্যে নবযুগ

[১৮২৪—১৮৭৩]

ব্যক্তিসত্তায় দ্বৈতধারা

যে অদৃশ্য দেবতা কাব্য, পুরাণ ও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় নিত্যকাল আপনাকে অভিব্যক্ত করিতেছেন, ব্যক্তি ও জাতির জীবনের রঙ্গমঞ্চে সর্বদেশে ও সর্বকালে যিনি সূত্রধর, সেই দেবতাকে প্রবন্ধের প্রারম্ভে নমস্কার করি। কেননা, বিপুলা পৃথ্বী যাঁহার বিলাস-ভূমি, নিরবধি কাল যাঁহার পাদ-পীঠ, শ্রীমধুসূদন প্রধানতঃ সেই দেবতারই উপাসনা করিয়াছেন। সেই বিচিত্রকর্মা দেবতার ভীমকান্ত রূপের মধ্যে ভক্তগণ শ্রীভগবানের লীলা-বৈচিত্র্য দেখিয়াছেন, বৈদান্তিক অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ার খেলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কবি ও রসিকগণ অনাসক্ত অথচ মুগ্ধ দৃষ্টিতে নিখিল রসের উৎস সন্ধান করিয়াছেন। আদি কবি মহর্ষি বাল্মীকির অমর মহাকাব্য এই অদৃষ্ট দেবতারই জয়গান করিয়াছে,—মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস যিনি আপন সাধনার প্রভাবে ভারতকে মহাভারতে পরিণত করিয়াছিলেন, তিনিও লোকক্ষয়কৃৎ কালরূপী শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে এই দেবতার ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করিয়া অর্জুনের মতই ভীত-ভীত ভাবে প্রণাম করিয়াছেন।

যে লোকোত্তর পুরুষ ও জগদ্বন্দ্যা নরীকে কেন্দ্র করিয়া মহর্ষি বাল্মীকি ভূতলে অতুল মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন, মহত্তম দুঃখের গুরুভার শিরে বহন করিয়াই তাঁহাদিগকে জীবনের মহাব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইয়াছিল। বাল্মীকির রামচন্দ্র পুণ্য চরিত্রের প্রভাবে নিখিল জগতের বন্দনীয় বটেন, কিন্তু তিনি পৃথিবীর মানুষের মতই

সুখদুঃখের অধীন। রামচন্দ্র ও জানকী সাধারণ মানুষের মত দুঃখে অশ্রুবিসর্জন করিয়াছেন, বিয়োগের দুঃসহ ব্যথায় মুহ্যমান হইয়াছেন; রাগ, দ্বেষ, অভিমান প্রভৃতি মানুষ-ভাবের অধীন হইয়াছেন। তাঁহারা যদি শুধুই দেবতা হইতেন, তবে রামায়ণী কথা মানুষের সমবেদনার উদ্রেক করিয়া চিরদিন তাঁহাদিগকে অশ্রুসিক্ত করিয়া তুলিত না। তথাপি, যে অদৃষ্টবাদ সমগ্র রামায়ণে অনুস্যূত রহিয়াছে, উহাকে অন্ধ নিয়তি বলা চলে না;—কেননা, এই অদৃষ্ট দেবতা রামচন্দ্র ও জানকীকে দুঃখের দাবদহনে দগ্ধ করিয়াই পৃথিবীর নরনারীকে দেবতায় ও পৃথিবীকে দেবপীঠস্থানে পরিণত করিতে চাহিয়াছেন।

আবার কুরুক্ষেত্রের সমর-প্রাঙ্গণে যখন ভ্রাতৃবিরোধ ও জ্ঞাতি-বিরোধের ভীষণ অনল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং অষ্টাদশ দিবসে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা কালের করাল গ্রাসে পতিত হইল, তখন আমরা এই অদৃষ্ট দেবতারই লীলা দেখিতে পাই। শুধু তাই নয়, আদি পর্ব হইতে মহাপ্রস্থান পর্যন্ত সমগ্র মহাভারতখানিতে যেন দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তিরই ইঙ্গিত সূচিত হইতেছে। ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবদিগের যে জয়লাভ, তাহা 'পরাজয়ের চেয়েও ভয়াবহ।' এই অদৃষ্টবাদের দার্শনিক কবি মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস। এখানে বিচিত্র নরনারীর চরিত্র কীর্তিত হইয়াছে এবং সমগ্র কাব্যখানিতে মানুষ-ভাবেরই প্রাধান্য রহিয়াছে বলিয়া চিরদিন ইহা মানুষের সহানুভূতির উদ্রেক করিতেছে।

কিন্তু প্রাচীন হিন্দুগণের অদৃষ্টবাদে জগৎকর্তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ বা অভিমান নাই। রামায়ণে ও মহাভরতে যে অদৃষ্টকে 'দুরতিক্রম' বলা হইয়াছে, সে কেবল লোক-শিক্ষার জন্য। এই জন্যই আমাদের মহাকাব্য শুধু ইতিহাস নয়, ধর্মগ্রন্থও বটে। ভগবানের বিধান মানুষের কাছে দুর্জ্ঞেয় হইলেও ইহা পরম মঙ্গলেরই নিধান।

প্রাচীন হিন্দুগণের মতে প্রাক্তন কর্মের নাম দৈব, আর ইহলৌকিক কর্মের নাম পুরুষকার ;—সুতরাং প্রকৃত পক্ষে অদৃষ্ট বা দৈব বলিয়া কোন বস্তু নাই। যোগবাশিষ্ঠে মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিয়াছেন—সকলেরই তীব্র পুরুষকারের আশ্রয় গ্রহণ করা কর্তব্য। তবে, যেখানে অদৃষ্ট প্রবল ও পুরুষকার দুর্বল, সেখানে অদৃষ্ট জয়লাভ করিবে, আর যেখানে পুরুষকার প্রবল ও অদৃষ্ট দুর্বল, সেখানে অদৃষ্ট পরাভূত হইবে।

ভগবান বুদ্ধদেব অদৃষ্টকে স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে প্রত্যেক মানুষই আপন ভাগ্যের নিয়ন্তা। মানুষ যদি স্বয়ং শ্রেয়ের পথ পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে কোন দেবতা বা মহাপুরুষ তাঁহার মুক্তি বিধান করিতে পারেন না। এই জন্য তথাগত বলিয়াছেন—'আত্মদীপা বিহরথ, অনন্যশরণা বিহরথ' ; আত্মদীপ হইয়া বিহার কর, অনন্যশরণ হইয়া বিহার কর।

কিন্তু প্রাচীন গ্রীকগণের মতে নিয়তি অন্ধ, ইহার পশ্চাতে কোন মঙ্গলময় পুরুষের মঙ্গলময় বিধান নাই। যে প্রমিথিউস্ জগতের মঙ্গলের জন্য অগ্নি আহরণ করিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহাকে শৈলশৃঙ্গে বন্ধনাবস্থায় ভীষণ আর্তনাদ করিতে হইয়াছিল। ইডিপাস যে মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন, তাহার মূলে প্রমাদ বা মোহ নাই, উহা সম্পূর্ণ অজ্ঞানকৃত অপরাধ। অবার দেখা যায়, ক্রূর নিয়তি পিতার বা পিতৃপুরুষের মহাপাতকের প্রতিশোধ লইতেছে পুত্র-পৌত্রাদির উপর। কখনও বা দেখি, কেহ পরম নির্ভয়ে দীর্ঘকাল সুখসম্পদ ভোগ করিতেছে,—সহসা অন্ধ নিয়তির রথচক্র তাঁহাকে দলিত, মথিত, পিষ্ট করিয়া চলিয়া গেল, রাজা পথের ভিখারী বনিল। ইহাকেই বলা হয়, মানবজীবনের 'নেমেসিস'।

আমরা বাংলার অমর কবি শ্রীমধুসূদনের কাব্যে হিন্দু ও গ্রীক অদৃষ্টবাদ উভয়েরই প্রভাব লক্ষ্য করি। কিন্তু মধুসূদনের অলৌকিক

প্রতিভা তাঁহাকে এমন একটি স্বাধীন ব্যক্তি-সত্তা ও অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করিয়াছিল যে, এই অদৃষ্টবাদ তাঁহার নিকট এক জীবন্ত শক্তিসাধনার রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল।

মধুসূদন প্রতীচ্যের সাহিত্য-সিন্ধু মন্থন করিয়া উহা হইতে উদ্ভূত অমৃত ও গরল উভয়ই নিঃশেষে পান করিয়াছিলেন। ইহাতে তরুণ বয়সে তাঁহার দেহে বিষক্রিয়ার কিঞ্চিৎ লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও তিনি কালে অমৃত-পানে অমর এবং হলাহল-পানে নীলকণ্ঠ হইয়াছিলেন। এইখানেই আমরা তাঁহার বলিষ্ঠ পৌরুষের পরিচয় পাই।

মধুসূদনের নিরঙ্কুশ কবি-প্রকৃতি তাঁহার চিন্তাধারায় এমন একটি বৈশিষ্ট্য, এমন একটি স্বাতন্ত্র্য প্রদান করিয়াছিল যে, গতানুগতিকার নির্দিষ্ট গণ্ডীতে তিনি আপনাকে আবদ্ধ রাখিতে পারেন নাই। প্রতিভার নাম যদি নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি হয়, তবে এই বুদ্ধি বিধাতা তাঁহাকে ভূয়িষ্ঠরূপে দান করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে ছিল একটা সক্রিয় আগ্নেয়গিরির প্রচণ্ড বিক্ষোভ; তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্য এই আগ্নেয়গিরিরই গৈরিক নিঃস্রাব। পিতৃপিতামহের অনুসৃত পথের অনুবর্তন যদি সনাতন ধর্ম হয়, তবে এই সনাতন ধর্মের বিরুদ্ধে তাঁহার চিত্ত বিদ্রোহী হইয়াছিল এবং এই বিদ্রোহের 'আত্মবিদারণকারী মহান নিঃশ্বাস' তাঁহার কাব্যে এক অশ্রুতপূর্ব ছন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। যদিও শ্রীমধুসূদন মহর্ষি বাল্মীকিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—

'নমি আমি, কবিগুরু, তব পদাম্বুজে,
বাল্মীকি! হে ভারতের শিরশ্চূড়ামণি,
তব অনুগামী দাস, রাজেন্দ্র-সঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ-দরশনে'।

তথাপি বাল্মীকির মহামানবের আদর্শ তাঁহার চক্ষে ম্লান হইয়া

গিয়াছিল। মনীষী নিট্শের ন্যায় কবি মধুসূদনও এমন এক অতি-মানবের (Superman) স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, যিনি ক্ষুদ্র জনসমাজে উত্তুঙ্গ শৈলের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকেন, যিনি রাজশাসন, লোকশাসন বা ধর্মশাসন দ্বারা আপনার স্বাধীন ব্যক্তিসত্তাকে খর্বীকৃত করেন না। কিন্তু নিট্শের Superman ও মধুসূদনের grand fellowর মধ্যে পার্থক্যও যথেষ্ট। মধুসূদনের এই অতিমানব একান্তভাবে অদৃষ্টের অধীন, তাঁহার অলৌকিক শৌর্য, দুর্জয় সাহস, অতুল ঐশ্বর্য, বিপুল সম্পদ তাঁহাকে নির্মম নিয়তির হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। এই অতি-মানবে আমরা বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশ দেখিতে পাই। বাহিরে তিনি বজ্রের ন্যায় সুকঠিন, কিন্তু পুত্রের নিধনবার্তা শ্রবণে সেই কঠিন পাষাণ ভেদ করিয়া অশ্রু নির্গত হয়, আবার পরক্ষণেই পুত্রের অপূর্ব শৌর্যের কথা স্মরণ করিয়া তিনি বিজয়-গর্বে স্ফীত হইয়া উঠেন। এই অতি-মানবের নিকট কাঞ্চন-সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কা স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি, এই জন্মভূমির রক্ষার জন্য বীরপুত্র বীরবাহু সম্মুখ-সমরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, আর লঙ্কা তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া ধন্য হইয়াছে। এ সংসার যে মায়াময়, জীবন যে জলবুদ্বুদের ন্যায় চঞ্চল, পরম জ্ঞানী রাবণ তাহা জানেন, তথাপি স্নেহপরায়ণ পিতৃহৃদয় পুত্রশোকে বিকল হয়। মানুষ ক্রূর নিয়তির হস্তে ক্রীড়নকমাত্র; তাই মকরালয় সেতুরূপ শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হইয়া দাসত্বের লাঞ্ছনে গর্ব অনুভব করে, জলে শিলা ভাসমান হয়, কৃতান্ত স্ব-ধর্ম বিস্মৃত হয় এবং শক্তিমান পুরুষসিংহের মহাসাম্রাজ্য নিমেষে ধূলিসাৎ হয়। শ্রীমধুসূদন বঙ্গজননীর বিদ্রোহী সন্তান; তাই তাঁহার চিত্ত দৈবী সম্পদকে ঘৃণা করে, আসুরী সম্পদকে বরণ করে। আমরা মহাকাব্যে ও পুরাণে ভারতীয় সভ্যতার দ্বয়ী মূর্তি দেখিতে পাই;—উহাকেই আমরা দৈবী ও আসুরী সভ্যতা বলিতে পারি। শ্রীরামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি দৈবী

সভ্যতার ও রাবণ, হিরণ্যকশিপু, কংস প্রভৃতি আসুরী সভ্যতার প্রতীক। আসুরী সম্পদ সম্বন্ধে গীতায় শ্রীভগবান বলিতেছেন—

"ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোহমহং ভোগী সিদ্ধোহহং বলবান্ সুখী॥
আঢ্যোহভিজনবানস্মি কোহন্যোহস্তি সদৃশো ময়া॥
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ।
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥"

১৬ অধ্যায়, ১৩-১৬

অদ্য আমার এই বস্তু লাভ হইল, আবার আমি এই অভীষ্ট বা কাম্য বস্তু লাভ করিব, আমি এই ধনের অধিকারী, এই ধনও আমি প্রাপ্ত হইব, আমি এই শত্রুকে বিনাশ করিয়াছি, অন্য শত্রুকেও বিনাশ করিব, আমি সর্বশক্তিমান্, আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ, আমি বলবান, আমি সুখী, আমি ধনশালী, আমি অভিজাত, আমার তুল্য এসংসারে আর কে আছে? আমি যজ্ঞ করিব, আমি দান করিব, আমি হর্ষপ্রাপ্ত হইব, এইরূপে তাঁহারা অজ্ঞানে বিমোহিত হয়, নানাবিধ বিষয়-চিন্তায় তাহাদের চিত্ত বিভ্রান্ত হয়, মোহময় জালে তাহারা আচ্ছন্ন হয় এবং কামভোগে তাহাদের চিত্ত আসক্ত হওয়াতে তাহারা দুঃখময় নরকে পতিত হয়।

শ্রীভগবান্ আসুরী প্রকৃতির লোকের জন্য যে পরিণতি নির্দেশ করিয়াছেন, বিদ্রোহী মধুসূদন উহাকে কর্মফল বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না; গ্রীক নাট্যকারের শিষ্য শ্রীমধুসূদন উহাকে অন্ধ নিয়তির নির্মম পরিহাস বলিয়া বিশ্বাস করেন, আর ভারতের মধুসূদন, বাংলার মধুসূদন বোধ হয় উহাকে সাঙ্খ্যের প্রকৃতির বা

তন্ত্রের মহাশক্তিরূপিণী জগজ্জননীর লাস্যলীলা (Magical cosmic dance) বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাই, বিশ্বের যিনি স্রষ্টা, পালয়িতা ও সংহর্তা, তাঁহার বিরুদ্ধে শ্রীমধুসূদনের দুর্জয় অভিমান। এ অভিমান বাঙ্গালী মধুসূদনের বৈশিষ্ট্য; যে অভিমানে একদিন রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন—

'মা মা বলে আর ডাক্‌ব না'

সেই অভিমান বিদ্রোহী সন্তান মধুসূদনের মধ্যেও ভিন্নরূপে প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল। মধুসূদনের অভিমান যেন ক্ষুব্ধ সাগরের গম্ভীর গর্জন, যেন মত্ত ঝঞ্চার প্রচণ্ড আবেগ—বাঙ্গালীর অশ্রুতপূর্ব ছন্দে উত্থিত হইয়া তাহাদের হৃদয়ের তলদেশ পর্যন্ত স্পর্শ করিতেছে। 'অভিমানে মহামানী বীরকুলর্ষভ রাবণ' যখন সমুদ্রের সেতুবন্ধনের মধ্যে নির্মম নিয়তির পরিহাস দেখিতে পাইতেছেন অথচ সাগরকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইতে মিনতি জানাইতেছেন, তখন আমরা মধুসূদনের প্রাণ-সমুদ্রের মর্মভেদী বিক্ষোভ-ধ্বনি শুনিতে পাই।

শ্রীমধুসূদনে আসুরী সম্পদের প্রাচুর্য ছিল, লঙ্কার অধিপতি দশাননেও তাহাই ছিল। মহীয়সী নারী বিদুলা বলিয়াছেন—

'শ্রুতেন তপসা বাপি শ্রিয়া বা বিক্রমেণ বা।
জনান্ যোঽভিভবত্যন্যান্ কর্মণা হি স বৈ পুমান্॥

'যিনি বিদ্যার দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, ঐশ্বর্যের দ্বারা বা বিক্রমের দ্বারা অপর সকলকে অতিক্রম করেন তিনিই যথার্থ পুরুষ'। এইরূপ যথার্থ পৌরুষের উপাদান ভূয়িষ্ঠরূপেই শ্রীমধুসূদনে ছিল;—অসাধারণ ধীশক্তি, বহুশ্রুতত্ব, নব-নবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি, ঐশ্বর্য, পুরুষোচিত বীর্য, প্রবল আত্মবিশ্বাস, বলিষ্ঠ আত্মসম্ভ্রমবোধ, অপরিমেয়া ভোগাকাঙ্ক্ষা তাঁহার চরিত্রকে এক অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য প্রদান

করিয়াছিল। যে রাক্ষসকুলপতি রাবণ আপন মহিমায় তুঙ্গশৃঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতেন, তিনি অন্ধ ক্রূর নিয়তির করাঘাতে সামান্য ক্রীড়নকের ন্যায় চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার অন্তরের দুর্জয় পৌরুষ তাঁহাকে কখনও নিয়তির কাছে পরাভব স্বীকার করিতে দেয় নাই ;—'অ-রাবণ, অ-রাম বা হবে ভব আজি'। 'Paradise Lost' এর Satan-এর মত এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা লইয়া তিনি রাক্ষস-কুলের মর্যাদা রক্ষা করিতে ব্রতী হইয়াছিলেন। মধুসূদনের লোকোত্তর প্রতিভাও তাঁহাকে জীবন-সংগ্রামে ব্যর্থতা হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই, তাঁহার হৃদয়ের মর্মন্তুদ ক্রন্দনই রাবণের বিলাপের মধ্যে ভাষা পাইয়াছে। সাগরের গর্জনের মধ্যে যে কত বড় সীমাহীন রিক্ত হাহাকার ধ্বনিত হইতে পারে, রাবণের বিলাপে আমরা তাহারই পরিচয় পাইয়াছি। কিন্তু আপনার অলৌকিক প্রতিভা সম্বন্ধে মধুসূদনের যে আত্ম-সচেতনতা, উহাই তাঁহাকে রাবণের ন্যায় অমোঘ বীর্য প্রদান করিয়াছিল,—তাঁহার হৃদয়ে যে দুর্জয় অভিমানের অগ্নি জ্বলিতেছিল, উহাই তাঁহাকে আগ্নেয়গিরির প্রচণ্ড বেগ দান করিয়াছিল, প্রকৃতির এই চির দুরন্ত দুর্মদ শিশুর মনের মধ্যে যে আলোড়ন, যে বিক্ষোভ, যে গর্জন, যে ক্রন্দন অহরহ ধ্বনিত হইতেছিল, তাহা কখনও ভেরীনিনাদে, কখনও বংশীধ্বনিতে, কখনও বা রবাব, বীণা, মুরজ ও মুরলীর সম্মিলিত ধ্বনিপ্রবাহে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। কবি যে আপনাকে বেদনার অগ্নিতে তিলে তিলে দগ্ধ করিয়া জগতে সঙ্গীত-সুধা বিতরণ করেন, শ্যামা-পক্ষীকে উপলক্ষ্য করিয়া কবি সেই মর্মকথা ব্যক্ত করিতেছেন—

'আঁধার পিঞ্জরে তুই, রে কুঞ্জবিহারি
বিহঙ্গ, কি রঙ্গে গীত গাইস্ সুস্বরে ?
ক' মোরে, পূর্বের সুখ কেমনে বিস্মরে
মন তোর ? বুঝারে, যা বুঝিতে না পারি।

সঙ্গীত-তরঙ্গ-সঙ্গে মিশি কি রে ঝরে,
অদৃশ্যে ও কারাগারে নয়নের বারি ?
রোদন-নিনাদ কি রে লোকে মনে করে
মধুমাখা গীতধ্বনি, অজ্ঞানে বিচারি ?
কে ভাবে, হৃদয়ে তোর কি ভাব উথলে,
কবির কু-ভাগ্য তোর, আমি ভাবি মনে।
দুঃখের আঁধারে মজি গাইস্ বিরলে
তুই, পাখী, মজায়ে রে মধু-বরিষণে,
কে জানে যাতনা কত তোর ভবতলে ?
মোহে গন্ধে গন্ধরস সহি হুতাশনে।'

'মোহে গন্ধে গন্ধরস সহি হুতাশনে'—ধূপ আপনাকে তিলে তিলে দগ্ধ করিয়া জগতে গন্ধ বিতরণ করে। ধূপের এই যে সাধনা, ইহা একরূপ শক্তি-সাধনা। রাবণের যে শক্তি-সাধনার পরিচয় রামায়ণে পাওয়া যায়, উহাই মেঘনাদবধের রাবণ-চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য নহে, তাঁহার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁহার অজেয় পৌরুষ, যে পৌরুষ নিয়তিকে স্বীকার করিয়াছে কিন্তু নিয়তির কাছে পরাভব স্বীকার করে নাই, তাঁহার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁহার সুমহান্ আত্ম-গরিমা, যে আত্ম-গরিমা বীরবাহুর অতুলনীয় শৌর্যের কাহিনী শ্রবণে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছে,—মাতৃভূমির স্বাধীনতা-রক্ষায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছে—দেশদ্রোহিতা ও বিশ্বাসঘাতকতায় ক্ষুব্ধ হইয়াছে, 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর-পাতনের' কঠোর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছে। মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও প্রমীলার চিতারোহণের দৃশ্য কী করুণ, কী মর্মভেদী! অথচ ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ যিনি জগতে অজেয় ছিলেন,—উর্মিলাবিলাসী লক্ষ্মণের হস্তে তাহার নিধন নিয়তির অমোঘ বিধান ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাই বীর পুত্রের শেষকৃত্যে যেন তাঁহার কুলমর্যাদা, তাঁহার

শৌর্যমহিমা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হয়, সে-দিকে রাবণের কেমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি! এও যেন অদৃষ্টের রুদ্র মূর্তিকে উপহাস—অদৃষ্টের কাছে শির নত না করিবার দুর্ধর্ষ সঙ্কল্প। রাবণের স্বভাবের এই অনমনীয় দৃঢ়তা তাঁহার চরিত্রে যে বজ্রের কঠোরতা দান করিয়াছিল, ইহা তাঁহার শক্তি-সাধনারই বহিঃ-প্রকাশ। এই শক্তি-সাধনায় শ্রীমধুসূদনও দীক্ষিত ছিলেন; তাই তিনি রাবণকে 'grand fellow' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে' (১৮৬০) মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করিয়া আত্মশক্তির সম্বন্ধে সচেতন হন কিন্তু এই নবজাগ্রত প্রতিভা পরিপূর্ণতা লাভ করে মেঘনাদবধ কাব্যে (১৮৬১)। মেঘনাদবধের আখ্যান-বস্তু পুরাতন হইলেও ইহার দৃষ্টিভঙ্গি অভিনব। (It is classical in theme, but modern in spirit)। বাল্মীকির মহামানব এখানে ভিখারী রাঘব, বাল্মীকির দুরাধর্ষ দুনিরীক্ষ্য লক্ষ্মণ এখানে উর্মিলাবিলাসী, ভক্ত বিভীষণ এখানে কৃতঘ্ন, বিশ্বাসঘাতক, কুলাঙ্গার;—প্রাচীন রামায়ণের চিরন্তন আদর্শকে তাঁহার স্বাধীন আত্মা এইভাবে পদে পদে অস্বীকার করিয়াছে। তাঁহার এই যে revaluation of values,—ইহা প্রচলিত নীতি-ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-ঘোষণা।

বীরাঙ্গনা প্রমীলা মধুসূদনের অপূর্ব সৃষ্টি, বজ্রের কঠোরতা ও কুসুমের কোমলতা দিয়া তিনি এই নারীমূর্তি গড়িয়াছেন, প্রাচী ও প্রতীচীর আদর্শে যাহা কিছু মহিমময় ও গৌরবান্বিত, প্রমীলা-চরিত্রে তাহার সমন্বয় দৃষ্ট হয়। মেঘনাদের তূর্যধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে আমরা 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যের' (১৮৬১) বংশীনিনাদ শুনিতে পাই, কিন্তু ব্রজাঙ্গনা কাব্যের রাধায় মিলনের যে আবেগময়ী আকুলতা দেখিতে পাই, তাহা বিশেষভাবে নরলোকেরই সামগ্রী। ব্রজাঙ্গনা কাব্যেও মধুসূদনের চির-বিদ্রোহী আত্মার ক্রন্দন-ধ্বনিই আমরা শুনিতে পাই। মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' বাংলার কাব্যক্ষেত্রে

'সনেট' প্রবর্তনের প্রথম প্রয়াস, যদিও তিনি দুই একটি কবিতা ভিন্ন আর কোথাও Regular Petrarchian Sonnet রচনার চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার 'বীরাঙ্গনা কাব্য' (১৮৬২) ওভিডের 'Heroic Epistles'-এর অনুসরণে বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্রিকা-কাব্য। বীরাঙ্গনা কাব্যেরও আদ্যোপান্ত নিয়তি-বাদ অনুস্যূত রহিয়াছে। কবি এই কাব্যে প্রচলিত ধর্মনীতি ও সমাজ-নীতির প্রতি যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন, উহা বীরাচারী শ্রীমধুসূদনের শক্তি-সাধনারই এক রূপ। কবি 'বীরাঙ্গনা' নামটির যে অর্থ-গৌরব ঘটাইয়াছেন, তাহাও কম দুঃসাহসের পরিচায়ক নহে। (আবার মধুসূদনই বাংলা ভাষায় প্রথম সার্থক বিয়োগান্ত নাটক রচনা করিয়া প্রচলিত রীতির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' (১৮৬১) উদয়পুরের রাজা ভীমসিংহের দুহিতা 'কৃষ্ণকুমারী'র জীবনের শোচনীয় পরিণতির কাহিনী। যে অদৃশ্য দেবতা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আপনাকে নিত্যকাল অভিব্যক্ত করেন, প্রবন্ধের প্রারম্ভে আমরা যাঁহাকে নমস্কার জ্ঞাপন করিয়াছি;—যে অদৃষ্ট-সূত্রে মানবীয় ইতিহাস গ্রথিত, মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী'ও তাহারই একটি ক্ষুদ্র অধ্যায় অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। মহিষীর স্বপ্ন, মূর্ছিতা কৃষ্ণার আকাশ-বাণী শ্রবণ;—সকলই যেন সেই অদৃষ্ট-দেবতার লীলাবিলাস। শ্রীমধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র উভয়েই অদৃষ্টবাদের কবি, কিন্তু মধুসূদনের অদৃষ্টবাদ মূলতঃ হেলেনিক আদর্শে অনুপ্রাণিত, যদিও মধুসূদনের অন্তরে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য আদর্শের একটা দ্বন্দ্ব ছিল, এবং সেই দ্বন্দ্বের ফলে তাঁহার চিত্তে যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছিল, মেঘনাদ-বধে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের অদৃষ্টবাদ মূলতঃ প্রাচ্য আদর্শে অনুপ্রাণিত;—সেখানে প্রাক্তনের নাম দৈব এবং বর্তমান উদ্যমের নাম পুরুষকার,—যদিও মনীষী বঙ্কিমও

হেলেনিক প্রভাবকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। মধুসূদনের ব্যক্তিসত্তায় যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য আদর্শের দ্বৈতধারা ছিল, তাহা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না।

মধুসূদনের 'তিলোত্তমাসম্ভবে' ও 'মেঘনাদ-বধে' কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। তিলোত্তমাসম্ভবের দেবকুলজয়ী অসুরদ্বয় সুন্দ ও উপসুন্দ এবং মেঘনাদ-বধের রাক্ষসকুলরাজ রাবণ;—সকলেই মহা-শক্তিশালী, মহাভোগী, প্রবৃত্তি মার্গের শ্রেষ্ঠ সাধক। মেঘনাদ-বধের শ্রীরামচন্দ্র শত্রুসংহারের জন্য মহামায়ার শরণাপন্ন হইয়াছেন এবং মহামায়ার অচিন্ত্য প্রভাবেই মেঘনাদ-বধের ন্যায় এমন অভাবনীয় ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। তিলোত্তমাসম্ভবেও মহামায়ার মোহিনী মূর্তি অসুরদ্বয়ের বুদ্ধিভ্রংশ ঘটাইয়া তাহাদের ধ্বংস-সাধন করিয়াছে। তিলোত্তমাসম্ভব ও মেঘনাদ-বধ উভয় কাব্যেই মধুসূদন সেই মহামায়ার মহিমা কীর্তন করিয়াছেন, ভক্ত ও অ-ভক্তের নিকট যিনি—'সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী'। মেঘনাদের শেষকৃত্যের পর শক্তিসাধক মধুসূদন লঙ্কার অবস্থা বর্ণনার প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

'বিসর্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে'।

বাস্তবিক, মধুসূদন গ্রীক নিয়তিবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইলেও প্রাক্তনবাদ এবং কর্মফলবাদ তাঁহার চিন্তাকে প্রভাবিত করিয়াছে। ভাগবতে ব্রজাঙ্গনাদের প্রেম সমাজ-ধর্মের বিরোধী (unconventional);—গোপীগণের প্রেম বাস্তবিকই বেদবিধি-ছাড়া। গোপীগণের সাধনাও মূলতঃ তান্ত্রিক সাধনা, ভাগবতে গোপীগণের কাত্যায়নী-পূজায় সেই তত্ত্বই বিবৃত হইয়াছে। এই জন্যই ব্রজাঙ্গনার প্রেম মধুসূদনের কবিকল্পনাকে উদ্রিক্ত করিয়াছিল। ইহার প্রথম প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, বিজাতীয়

দীক্ষায় দীক্ষিত মধুসূদনের 'ক্যাপটিভ্ লেডীতে'। এই ইংরেজি কাব্যের এক স্থানে দেখিতে পাই, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত কবি শ্রীকৃষ্ণের বংশী-নিনাদ শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। আবার ব্রজাঙ্গনা কাব্যে ব্রজাঙ্গনার বিরহ-ব্যথায় যেন আমরা শ্রীমধুসূদনের হৃদয়ের অসীম আকুতি ও সকল বন্ধন হইতে আত্মাকে মুক্ত করিবার জন্য এক অন্তহীন আকুলতার সুর শুনিতে পাই। ব্রজাঙ্গনা যখন সখীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন—

'ছাড়ি দেহ বিহগীরে মোর অনুরোধে রে—হইয়া সদয়।
ছাড়ি দেহ যাক্ চলি হাসে যথা বনস্থলী
শুকে দেখি সুখে ওর জুড়াবে হৃদয়।
সারিকার ব্যথা স্মরি ওলো দয়াবতী।
রাধিকার বেড়ি ভাঙ—এ মম মিনতি।'

তখন শ্রীমধুসূদনের মর্ম-বেদনাই আমাদের শ্রুতিতে প্রবেশ করে। ব্রজাঙ্গনা-কাব্যের কবিও যে শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীমধুসূদন জাতীয়তার ঋত্বিক্—তিনি বঙ্গভূমিকে 'সুবরদা', 'শ্যামা', 'জন্মদা' বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন। এই দেশাত্মবোধ তাঁহার তান্ত্রিক সাধনারই এক রূপ। কবি ঈশ্বর গুপ্তের বা রঙ্গলালের কাব্যে মাতৃ-পূজা নাই। বাংলা দেশে মধুসূদনই সর্বপ্রথম মাতৃ-পূজার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই মাতৃ-পূজাকে সম্পূর্ণ-ভাবে বাংলার তান্ত্রিক সাধনা বলা যায় না, ইহা কিয়দংশে প্রতীচ্য শিক্ষা-দীক্ষারও ফল। বাঙ্গালী সাধক দিব্য-দৃষ্টিতে মৃন্ময়ীর মধ্যে চিন্ময়ীকে দর্শন করিয়াছেন, আর ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র সর্বপ্রথম দিব্য-দৃষ্টিতে মৃন্ময়ী বঙ্গজননীর মধ্যে দশপ্রহরণধারিণী দুর্গা, কমলদল-বিহারিণী লক্ষ্মী ও বিদ্যাদায়িনী বাণীকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের মাতৃপূজার আদর্শ ও তাঁহার ধর্মের আদর্শ

একীভূত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু শ্রীমধুসূদনের মাতৃ-পূজায় শক্তি-সাধনার এই পরিপূর্ণ রূপটি ধরা পড়ে নাই। তাঁহার স্বদেশ-প্রেম অনেকটা প্রতীচ্য আদর্শে অনুপ্রাণিত, আর এ বিষয়ে তিনি ডিরোজিওর শিষ্য। তথাপি প্রতীচ্য জাতির জাতীয়তার আদর্শকেও তিনি প্রাচ্য ভাবে অভিষিঞ্চিত করিয়াছেন। তাঁহার ব্যক্তি-সত্তা এই দ্বৈত আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল বলিয়াই তিনি প্রতীচীর ভাবধারা আত্মসাৎ করিয়াও আমাদের দেশের মহাকাব্য ও পুরাণের বিষয়-বস্তুকে এক অপরূপ শিল্পরূপ দান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বাংলা কাব্যের যুগ-প্রবর্তক মধুসূদন

শ্রীমধুসূদন শুধু যুগের অগ্রগামী নহেন, তিনি বাংলার কাব্যসাহিত্যে একক ও অনন্যসাধারণ বলিয়া তাঁহাকে একটি স্বতন্ত্র যুগ বলা যায়। তিনি কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু লইয়া মধুচক্র নির্মাণ করিলেও এ নির্মিতির গৌরব সম্পূর্ণ রূপে তাঁহারই প্রাপ্য। নানা কাব্যোদ্যানে কুসুম আহরণ করিলেও তিনি সম্পূর্ণ নূতন মালা গ্রথিত করিয়াছেন। মধুসূদনের প্রতিভার বিরাটত্ব তখনই বুঝিতে পারি, যখন দেখি তাঁহার সমসাময়িক মনীষিবৃন্দও এ মালার সৌন্দর্য পরিপূর্ণ ভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। পৃথিবীর বহু প্রতিভাশালী ব্যক্তির ন্যায় শ্রীমধুসূদনকেও জীবিতকালে বহু নিন্দা-গ্লানি সহ্য করিতে হইয়াছে কিন্তু কবির দৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকে নিবদ্ধ ছিল বলিয়াই তিনি উহাতে বিচলিত হন নাই। মধুসূদন কোন বিশেষ কবির পদাঙ্ক অনুসরণ করেন নাই, আবার তাঁহার পরবর্তী কবিগণেরও অমিত্রাক্ষর ছন্দের গতি-প্রকৃতি বা ইহার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকার ফলে, কেহই তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে পারেন নাই। কেবলমাত্র 'হেলেনা

কাব্যের' লেখক আনন্দচন্দ্র মিত্র তাঁহার অনুসৃত পথে বিচরণ করিয়া কথঞ্চিৎ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন কিন্তু প্রধানতঃ বিদেশী কাব্য হইতে বিষয়বস্তু নির্বাচনের জন্য তাঁহার মহাকাব্য-রচনার প্রয়াস অনেকাংশে ব্যর্থ হইয়াছে।

শ্রীমধুসূদনের সমসাময়িক মনস্বিগণ প্রায় কেহই তাঁহার রচনাবলীর প্রতি, বিশেষতঃ তাঁহার 'মেঘনাদ-বধের' প্রতি সুবিচার করিতে পারেন নাই, মধুসূদনের অন্তরঙ্গ বন্ধু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন—

"আমরা যেমন বলিয়া থাকি, এ লোকটা দোষেগুণে, মাইকেল মধুসূদনও তেমনি দোষেগুণে কবি। প্রত্যেক কবিরই দোষগুণ আছে কিন্তু 'দোষে-গুণে কবি' এই প্রয়োগের অর্থ এই যে, যেমন তাঁহার অসামান্য গুণ আছে, তেমনি অসামান্য দোষ আছে। ভাবের উচ্চতা, বর্ণনার সৌন্দর্য, করুণ রসের উদ্দীপনা তাঁহার এই সকল গুণ যখন বিবেচনা করা যায়, তখন তাঁহাকে বঙ্গভাষার সর্বপ্রধান কবি বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু যখন তাঁহার দোষ বিবেচনা করা যায়, তখন তাঁহাকে ঐ উচ্চ আসন প্রদান করিতে মন সঙ্কুচিত হয়। জাতীয় ভাব, বোধ হয়, মাইকেল মধুসূদনেতে যেমন অল্প পরিলক্ষিত হয়, অন্য কোন বাঙ্গালীর কবিতাতে সেরূপ হয় না। তিনি তাঁহার কবিতাকে হিন্দু পরিচ্ছদ দিয়াছেন বটে; কিন্তু সেই হিন্দু পরিচ্ছদের নিম্ন হইতে কোট-পেণ্টুলন দেখা দেয়। আর্য-কুলসূর্য রামচন্দ্রের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ না করিয়া রাক্ষসদিগের প্রতি অনুরাগ ও পক্ষপাত প্রকাশ করা, নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে হিন্দুজাতির শ্রদ্ধাস্পদ বীর লক্ষ্মণকে নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় আচরণ করানো, খর ও দূষণের মৃত্যু ভবতারণ রামচন্দ্রের হাতে হইলেও তাহাদিগকে প্রেতপুরে স্থাপন,—বিজাতীয় ভাবের অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে এই তিনটি এখানে উল্লিখিত হইয়াছে।"

মধুসূদনের চরিতকার যোগীন্দ্রনাথ বসুও 'মেঘনাদ-বধ কাব্যের' বিচারে অনুরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তিনি সমগ্র কাব্যের মধ্যে ষষ্ঠ সর্গই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কেননা, এই সর্গে আর্ষ রামায়ণের 'দুর্নিরীক্ষ্য দুরাধর্ষ' লক্ষ্মণ ভীরু কাপুরুষরূপে চিত্রিত হইয়াছেন এবং তিনি মেঘনাদের নিধনকারী হইলেও মেঘনাদের সম্মুখে তাঁহার মহিমা একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। যোগীন্দ্রবাবুর লিখিত চরিতগ্রন্থখানি বহু মূল্যবান তথ্যে সমৃদ্ধ হইলেও মধুসূদনের প্রতি সহানুভূতির অভাবেই তিনি তাঁহার কাব্য-প্রেরণার মূল উৎসের সন্ধান পান নাই। মধুসূদনের জীবনের অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতার ভয়াবহ চিত্র অঙ্কিত করিয়া তিনি পাঠকগণকে পাপের পরিণাম-সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। মধুসূদনের চরিত্রের বিশ্লেষণ করিতে গিয়া তিনি বলিতেছেন—

"মধুসূদনের কাব্যসমূহ যেমন বাল্মীকি, হোমর, বার্জিল, মিল্টন, কালিদাস, দান্তে, ট্যাসো, ভবভূতি প্রভৃতি নানা দেশের কবিগণের প্রদত্ত উপাদানে বিরচিত হইয়াছিল, তাঁহার নিজের প্রকৃতিও তেমনি বহুজনের প্রকৃতির সম্মেলনে সংগঠিত হইয়াছিল। পাণ্ডিত্যে এবং গাম্ভীর্যে তিনি মিল্টন, উচ্ছৃঙ্খলতা, প্রেমপিপাসা এবং অসংযতেন্দ্রিয়তায় তিনি বায়রণ, ঔদাস্য এবং মহাপ্রাণতায় তিনি বার্ণস্, অমিতব্যয়িতা এবং পরদিনের চিন্তায় ঔদাসীন্য সম্বন্ধে তিনি গোল্ড্‌স্মিথ্।" মধুসূদনের আত্মপ্রকৃতি যে তাঁহার অঙ্কিত রাবণ-চরিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছিল, এই সত্যের প্রতি কিন্তু যোগীন্দ্রবাবু আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক রজনীকান্ত গুপ্তও মধুসূদনের আলোচনা-প্রসঙ্গে তাঁহার জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতা ও অপরিণাম-দর্শিতা এবং তাঁহার কাব্যে বিজাতীয় ভাবের প্রাধান্যের নিন্দা করিয়াছেন।

কবি হেমচন্দ্র মেঘনাদ-বধের মৌলিকতা, স্বর্গ-মর্ত-নরক-সঞ্চারিণী

নিরঙ্কুশ কল্পনা, চিত্রাঙ্কন-নৈপুণ্য, নানা রসের অপূর্ব সমাবেশ, বিদ্যুচ্ছটাকৃতি, বিশ্বোজ্জ্বল বর্ণনাচ্ছটা প্রভৃতির অকুণ্ঠ প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দের সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় এবং ব্যাকরণ ও অলঙ্কার-শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে কাব্য-বিচারের চেষ্টা করায় তিনিও মধুসূদনের লোকোত্তর প্রতিভার প্রতি সুবিচার করিতে পারেন নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং লোকোত্তর প্রতিভার অধিকারী ছিলেন বলিয়া এই সত্য তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, মধুসূদন বাংলার কাব্য-সাহিত্যে নূতন যুগের স্রষ্টা। তিনি লিখিয়াছেন—

'সুপবন বহিতেছে দেখিয়া জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও। তাহাতে নাম লেখ 'শ্রীমধুসূদন'।'

কিন্তু হেমচন্দ্রের প্রতি পক্ষপাতিত্বের জন্য তিনিও সর্বত্র মধুসূদনের প্রতি সুবিচার করিতে পারেন নাই। 'মধুসূদনের ভেরী নীরব হইয়াছে, হেমচন্দ্রের বীণা অক্ষয় হউক'। মধুসূদনের লোকান্তর-গমনের পর বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি আমাদিগকে ক্ষুব্ধ করে।

তরুণ বয়সে রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদ-বধের প্রতিকূল সমালোচনা করিয়াছিলেন কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি এই কাব্যের কবি-প্রেরণা ও মধুসূদনের কবি-মানস সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলেরই প্রণিধানযোগ্য। মধুসূদন বাংলা কাব্যের 'ছন্দোবন্ধে ও রচনা-প্রণালীতে' যে নবত্ব সম্পাদন করিয়াছেন, কাব্যের অন্তর্নিহিত ভাব ও রসের যে পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন তাহার কথা উল্লেখ করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

'যে অটল শক্তি ভয়ঙ্কর সর্বনাশের মাঝখানে বসিয়াও কোন মতেই হার মানিতে চাহিতেছে না,—কবি সেই ধর্মবিদ্রোহী মহাদম্ভের পরাভবে সমুদ্রতীরের শ্মশানে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া

কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। যে শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে, তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া, যে শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না, বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল।')

কিন্তু মধুসূদনের দৃষ্টিতে রাবণের পরাভব হয়তো ধর্মবিদ্রোহী মহাদম্ভের পরাভব নয়, দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তির হস্তে অতিমানবের পরাজয়।

এ যুগের দুইজন মনস্বী সমালোচক মধুসূদনের অন্তর্জীবন ও কাব্য-প্রেরণা সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় মধুসূদনের সমগ্র রচনাবলীর যথাযোগ্য আলোচনা আজও হয় নাই।

মধুসূদনের কবিপ্রতিভার বিরাটত্ব, তাঁহার কল্পনার মৌলিকত্ব ও প্রকাশভঙ্গির অভিনবত্ব সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে তাঁহার পূর্বগামী খ্যাতিমান কবিগণের রচনাবলীর সঙ্গে তাঁহার কবিকৃতির তুলনা করিতে হয়। মধুসূদন যখন কাব্য-সাধনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন ঈশ্বর গুপ্তের কবিযশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যে সে যুগের শিক্ষিত বাঙ্গালীর নব-জাগ্রত স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের শ্রুতিসুখকর পদবিন্যাসে বহু কাব্যামোদী পাঠক আকৃষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁহার রচিত 'রসতরঙ্গিণী' ও 'বাসবদত্তা'র (১৮৩৬) সুমধুর শব্দঝঙ্কারের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা তখনও অনেকের মুখে শুনা যাইতেছে। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত, মদনমোহন বা রঙ্গলাল কেহই বাংলার কাব্যসাহিত্যে নব-যুগের প্রবর্তন করিতে পারেন নাই। বাংলা কবিতা তখন শীর্ণকায়া মন্থরগামিনী নদীর মত মৃদু-মন্দ গতিতে প্রবাহিত হইতেছিল এবং উহার সর্বাঙ্গে যৌবনের চাঞ্চল্য ও গতিবেগ সঞ্চার করিবার জন্যই মধুসূদনের ন্যায়

লোকোত্তর প্রতিভার প্রয়োজন হইয়াছিল। মদনমোহনের কাব্যে শব্দচয়ননৈপুণ্য ছিল, সুমধুর শব্দঝঙ্কার ছিল কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিলেও কাব্য-সাধনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন ভারতচন্দ্রেরই উত্তরাধিকারী, এইজন্য ইংরেজি সাহিত্যের রসগ্রাহী পাঠক-সমাজকে তিনি দীর্ঘকাল পরিতৃপ্ত করিতে পারেন নাই। রঙ্গলাল বাংলার কাব্য-সাহিত্যের আকৃতিগত পরিবর্তন সাধন করিতে না পারিলেও প্রকৃতিগত পরিবর্তন সাধন করিয়াছিলেন,—বস্তুতঃ ভারতের প্রাচীন ইতিহাস বা ঐতিহ্য হইতে বিষয়বস্তু-নির্বাচনের যে কৃতিত্ব, তাহা সর্বাগ্রে রঙ্গলালেরই প্রাপ্য। সুতরাং রঙ্গলালকেও এক হিসাবে যুগসন্ধির কবি বলা অন্যায় বা অসঙ্গত হইবে না। অবশ্য কোন নূতন ছন্দের প্রবর্তন করিবার মত প্রতিভা রঙ্গলালের ছিল না, অভিনব ভাব বা কল্পনার সন্ধানও তাঁহার কাব্যে মিলে না কিন্তু তাঁহাকেই প্রকৃতপক্ষে স্বাজাত্য-বোধের আদ্যাচার্য বলা চলে। রঙ্গলাল নিপুণ চিত্রকরের ন্যায় প্রকৃতির বৈচিত্র্যের ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন, কাব্যের মধ্যে অতিলৌকিক ঘটনার সমাবেশ করিয়াছেন এবং ব্যক্তির জীবনের ন্যায় জাতির জীবনও যে একান্তভাবে নিয়তির অধীন, ঐতিহাসিক আখ্যান অবলম্বনে এই তত্ত্ব স্থাপন করিয়াছেন,—তিনি বাংলার কাব্য-সাহিত্যকে একদিকে যেমন কুরুচি হইতে মুক্ত করিয়াছেন, অপর দিকে তেমনি ইংরেজি সাহিত্য হইতে উৎকৃষ্ট ভাবসমূহ আহরণ করিয়া স্বীয় কাব্য-মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, আবার ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যে যে সঙ্কীর্ণ বাঙ্গালী-প্রীতি আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, উহা বর্জন করিয়া তিনিই প্রথম ভারতের ইতিহাসের দিকে আপন দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করিয়াছেন। এই সমস্ত কারণে রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্য প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার কবি-যশ প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। রঙ্গলাল বোধ হয় আপন শক্তির সীমা-

সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, এই জন্য মধুসূদনের অমর কাব্য 'মেঘনাদ-বধ' প্রকাশিত হইবার পরেও তিনি কদাপি মধুসূদনের পদাঙ্ক-অনুসরণের প্রয়াস করেন নাই। যাহা হউক, মধুসূদনের অমর কাব্য প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই রঙ্গলালের কবি-যশ অনেকটা ম্লান হইয়া পড়ে।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য

'তিলোত্তমাসম্ভব' (১৮৬০) মহাকাব্য না হইলেও কিছুটা পরিমাণে মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত এবং প্রকৃত পক্ষে এই কাব্যই বাংলার কাব্য-সাহিত্যে নব-যুগের সূচনা করিয়াছে। মধুসূদনের চরিতকার সত্যই বলিয়াছেন, তিলোত্তমাসম্ভব সর্বাংশে মেঘনাদের পূর্বগামী হইবার উপযুক্ত। কাব্যের বিষয়-বস্তু-নির্বাচনেও মধুসূদনের সহজ সৌন্দর্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। যোগীন্দ্রবাবু বলেন, বিশ্বকর্মা যেমন স্থাবর-জঙ্গম হইতে তিল তিল সৌন্দর্য আহরণ করিয়া তিলোত্তমাকে নির্মাণ করিয়াছিলেন, কবিও সেইরূপ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য নানা কবির কাব্য হইতে সৌন্দর্য আহরণ করিয়া তিলোত্তমার সৃষ্টি করিয়াছেন। তিলোত্তমাসম্ভব রচনার কালে কবির 'তিলোত্তমা-সৃষ্টির' এরূপ কোন সজ্ঞান অভিপ্রায় ছিল বলিয়া মনে হয় না। তিলোত্তমাসম্ভবে যে প্রতীচ্য কবিগণের চাইতে প্রাচ্য কবিগণের প্রভাব অধিক, এ কথা মধুসূদনের চরিতকার স্বীকার করিয়াছেন। বিশেষতঃ, এই কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে মহাকবি কালি-দাসের কুমারসম্ভবের প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তিলোত্তমাসম্ভবের পাঠক মাত্রেই লক্ষ্য করিয়াছেন, কাব্যের প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গে স্থানে স্থানে ভাষার যে আড়ষ্টতা ও শ্লথ গতি লক্ষ্য করা যায়, তৃতীয় ও চতুর্থ সর্গে তাহার দৃষ্টান্ত অপেক্ষাকৃত বিরল, অর্থাৎ কাব্য-নির্ঝরিণী যাত্রারম্ভকালে স্থানে স্থানে উপলে প্রতিহত হইয়া

মন্থরগতি হইলেও মধ্যপথে অনেকটা স্বচ্ছন্দগতি হইয়াছে। তিলোত্তমার এই ভাষাগত আড়ষ্টতার অন্যতম কারণ যে সংস্কৃত কবিগণের, বশেষতঃ কালিদাসের অনুকরণের প্রয়াস, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ কথা সত্য যে তিলোত্তমাসম্ভব রচনাকালে কবি পূর্বগামী কবিদিগের ভাবধারাকে পরিপূর্ণ রূপে আত্মসাৎ করিয়া নূতন সৌন্দর্যলোকের সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। কিন্তু কাব্যের প্রারম্ভে তিনি ধবল-গিরির ভীষণ-গম্ভীর সৌন্দর্যের বর্ণনা করিয়া বাংলা কাব্যে যে নূতন রসের সঞ্চার করিয়াছেন উহা সহসা পাঠকের মনকে বিরাটের সম্মুখীন করিয়া দেয়।

তিলোত্তমা-সম্ভবে দেবরাজ ইন্দ্রের বা অন্যান্য দেবগণের চরিত্র-পরিকল্পনায় অথবা বিশ্বকর্মার শিল্পশালার বর্ণনায় মধুসূদন অসামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। এই কাব্যের একটি প্রধান দোষের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কাব্যের নায়ক মহাবলদৃপ্ত সুন্দ ও উপসুন্দ নিয়তির অধীন, কিন্তু তাহারা রক্তমাংসের মানুষ হইয়া উঠে নাই বলিয়াই তাহাদের নিধন আমাদের চিত্তে সমবেদনার উদ্রেক করে না।

বিশ্বকর্মা যেখানে স্থাবর-জঙ্গম হইতে তিল তিল সৌন্দর্য আহরণ করিয়া তিলোত্তমাকে সৃষ্টি করিতেছেন, সেখানে বর্ণনা কবিত্ব-সম্পদে কেমন উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, দেখুন—

'পদদ্বয় লয়ে
গড়িলেন বিশ্বকর্মা রাঙা পা দু'খানি।
বিদ্যুতের রেখা দেব লিখিলা তাহাতে
যেন লাক্ষারস-রাগ। বনস্থল-বধূ
রম্ভা উরুদেশে আসি করিলা বসতি,
সুমধ্যম মৃগরাজ দিল নিজ মাঝা;
খগোল নিতম্ব-বিম্ব; শোভিল তাহাতে

মেখলা, গগনে, মরি ছায়াপথ যথা!
গড়িলেন বাহু-যুগ লইয়া মৃণালে।

*　　　*　　　*

তপোবলে শশাঙ্ক সুমতি
হইলা বদন দেব অকলঙ্ক ভাবে;
ধরিল কবরীরূপ কাদম্বিনী ধনী,
ইন্দ্রচাপে বানাইয়া মনোহর সিঁথি।
জ্বলে যে তারা-রতন ঊষার ললাটে,
তেজঃপুঞ্জ, দুইখান করিয়া তাহারে
গড়াইল চক্ষুদ্বয়, যদিও হরিণী
রাখিলেক দেবপদে আনি নিজ আঁখি
গড়িলা অধর দেব বিম্বফল দিয়া,
মাখিয়া অমৃতরসে; গজ মুক্তাবলী
শোভিল রে দন্তরূপে বিশ্ব বিমোহিয়া।

*　　　*　　　*

বসুন্ধরা নানা রত্ন-সাজে
সাজাইলা বরবপু, পুষ্পলাবী যথা
সাজায় রাজেন্দ্রবালা কুসুম-ভূষণে।

*　　　*　　　*

কলরবে মধুদূত কোকিল সাধিল
দিতে নিজ মধুরব; কিন্তু বীণাপাণি
আনি সঙ্গে রঙ্গে রাগ-রাগিণীর কুল,
রসনায় আসন পাতিলা বাগীশ্বরী।
অমৃত সঞ্চারি তবে দেব-শিল্প-পতি
জীবাইলা কামিনীরে; সুমোহিনী-বেশে
দাঁড়াইলা প্রভা যেন, আহা, মূর্তিমতী, !

তিলোত্তমাসম্ভব-সম্পর্কে মনীষী যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মধুসূদনকে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা আমাদের প্রণিধানযোগ্য। তাঁহার মতে এই কাব্যখানি 'A monument that marks a grand epoch in our literature, when Bengali poetry first broke through the fetters of rhyme and soared exultingly into the lofty region of sublimity which is her genuine province.'

যে সমস্ত মনীষী সে-যুগে তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রাজনারায়ণ বসু ও রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নামও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

মেঘনাদবধ-কাব্য

শ্রীমধুসূদনের প্রতিভা যেমন অনন্যসাধারণ, তেমনই তাঁহার শ্রেষ্ঠ কবি-কৃতি মেঘনাদবধও বাংলা সাহিত্যে এক সম্পূর্ণ অভিনব ও বিস্ময়কর সৃষ্টি। সাগরে যেমন ঋজুগামিনী বক্রগামিনী নানা প্রবাহিণীর জলধারা আসিয়া মিলিত হয়, তেমনই মেঘনাদবধে বাল্মীকি, কালিদাস, হোমার, ওভিদ, ট্যাসো, দান্তে, মিল্টন প্রভৃতি নানা কবিগণের ভাব ও কল্পনার ধারা আসিয়া মিলিত হইয়াছে। কাব্যের আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত যেন আমরা উত্তালতরঙ্গসঙ্কুল সাগরের অশ্রান্ত ক্রন্দন ও রোষবিক্ষুব্ধ গর্জন শুনিতে পাই। শীর্ণকায়া তটিনীর কুলু কুলু ধ্বনির সঙ্গে পরিচিত বাঙ্গালী মেঘনাদ-বধেই সর্বপ্রথম সাগরের অতল হৃদয়তল হইতে উত্থিত, গম্ভীর, মর্মবিদারী ভাষা শুনিতে পাইল। মধুসূদনের বিপ্লবী হৃদয়ের ভাব ও কল্পনার উপযুক্ত বাহন ছিল এই অমিত্রাক্ষর ছন্দ, যাহাকে কোন কোন আধুনিক পণ্ডিত 'প্রবহমান অমিল পয়ার' আখ্যা দিয়াছেন। মেঘনাদবধে সত্যই মধুসূদনের দ্বৈত প্রবৃত্তির—প্যাগান-সুলভ

বলিষ্ঠ জীবনবাদ এবং রোমাণ্টিক কবিসুলভ নিরঙ্কুশ স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল-বিহারিণী কল্পনার সমাবেশ ঘটিয়াছিল। যাঁহারা এরিষ্টটল্ বা বিশ্বনাথের সংজ্ঞার সহিত মিলাইয়া মহাকাব্যের বিচার করেন, তাঁহারা যাহাই বলুন, মেঘনাদবধ হইতে সমালোচকগণ কবির আত্মগত ধ্যান-ধারণা বা ভাবনা-কামনার কথা যতই আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করুন, এ কথা সত্য যে, কবি সজ্ঞানে মহাকাব্য-রচনারই প্রয়াস পাইয়াছিলেন। মেঘনাদ-বধের বিষয়বস্তুর কাঠামো আর্ষ রামায়ণ হইতে গৃহীত হইলেও, ইহাকে একটি স্বতন্ত্র কাব্য বলিয়াই বিবেচনা করা উচিত, সুতরাং সিদ্ধরস কাব্য সম্পর্কে প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা যে প্রতিষেধ-বাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহার দ্বারা ইহার বিচার করা চলিবে না। মেঘনাদবধে মধুসূদনেরই দ্বৈত রূপ দেখা যায়,—বলিষ্ঠ, আত্মপ্রত্যয়শীল, প্রাণধর্মে দীক্ষিত, নিয়তিতে অবিশ্বাসী তরুণ মধুসূদনের প্রতিরূপ হইতেছেন মেঘনাদ, আর নিয়তির দুর্জয় শক্তিতে বিশ্বাসী অথচ নিয়তির কাছে নতিস্বীকারে কুণ্ঠিত, অভিমানী, পরিণতবয়স্ক মধুসূদনের প্রতিরূপ রাবণ। এক হিসাবে রাবণই মহাকাব্যের নায়ক বটেন কিন্তু অন্য দিক দিয়া বিবেচনা করিলে এই কাব্যের যথার্থ নায়ক দৈব, নিয়তি, বিধি বা প্রাক্তন, যিনি মহামহিমান্বিত মহাবলপরাক্রান্ত মহাসত্ত্ব রাবণের অন্তরে শত শ্মশান-চুল্লী প্রজ্বালিত করিয়া তাহাকে তিলে তিলে দগ্ধ করিয়াছেন।

মনস্বী সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার মেঘনাদ-বধ কাব্যের ভাষা ও ছন্দের বৈশিষ্ট্য-সম্পর্কে—মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের Rhythm বা ছন্দস্পন্দ-সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন। ১৩২৫ বঙ্গাব্দের 'প্রবাসী' জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদবধ সম্পর্কে লিখিয়াছেন :—

"এর প্রত্যেক ভাগে কবি ইচ্ছামত ছোট বড় নানা ওজনের

নানা সুর বাজিয়েছেন, কোন জায়গাতেই পয়ারকে তার প্রচলিত আড্ডায় এসে থামতে দেননি। প্রথম আরম্ভেই বীরবাহুর বীরমর্যাদা সুগম্ভীর হয়ে বাজল—'সম্মুখ-সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি বীরবাহু।' তারপরে তার অকালমৃত্যুর সংবাদটি যেন ভাঙ্গা রণপতাকার মত ভাঙ্গা ছন্দে ভেঙ্গে পড়ল—'চলি যবে গেলা যমপুরে অকালে।' তারপরে ছন্দ নত হয়ে নমস্কার করলে। 'কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণী'। তারপরে আসল কথাটা যেটা সবচেয়ে বড় কথা—সমস্ত কাব্যের ঘোর পরিণামের যেটা সূচনা, সেটা যেন আসন্ন ঝটিকার সুদীর্ঘ মেঘগর্জনের মত এক দিগন্ত থেকে আর এক দিগন্তে উদ্‌ঘোষিত হোলো—'কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি পদে। পাঠাইলা রণে পুন রক্ষঃকুলনিধি রাঘবারি'।"

বাস্তবিক, প্রাচীন পয়ার ছন্দকে মিত্রাক্ষরের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া মধুসূদন উহার মধ্যে যে শব্দঝঙ্কার ও ধ্বনিগৌরবের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাকে যে স্বচ্ছন্দ গতিবেগ দান করিয়াছেন, তাহা একমাত্র মধুসূদনের প্রতিভারই উপযুক্ত।

ব্রজাঙ্গনা ও বীরাঙ্গনা কাব্য

মধুসূদনের চরিতকার যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মতে আমরা মেঘনাদ-বধে শুনিতে পাই গম্ভীর ভেরীনিনাদ, ব্রজাঙ্গনা কাব্যে শুনি সুমধুর বংশীধ্বনি আর বীরাঙ্গনা কাব্যে শ্রবণ করি যুগপৎ বেণুনাদ ও তূর্যধ্বনি ;—অতএব মধুসূদনের রচনাবলীর মধ্যে বীরাঙ্গনা কাব্যই শ্রেষ্ঠ। রসজ্ঞ কাব্য-সমালোচকেরা যোগীন্দ্রবাবুর এই মত গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা বলেন, মধুসূদনের কাব্য-গ্রন্থাবলীর মধ্যে মেঘনাদবধের পরেই বীরাঙ্গনা কাব্যের স্থান নির্দেশ করিতে হয়। ব্রজাঙ্গনায় মধুসূদন রাধার বিরহ অবলম্বনে যে

সুমধুর শব্দঝঙ্কারের সৃষ্টি করিয়াছেন, উহা আমাদিগকে মুগ্ধ করিলেও তেমন বিস্মিত করে না। তথাপি, আমাদিগকে এ কথাটি স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্রজাঙ্গনার 'রাধিকা' শুধু বিরহিণী নন, বিদ্রোহিণীও বটেন।

মেঘনাদবধে মধুসূদন যে পাঁচটি নারী-চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, উহারা প্রত্যেকেই আপন স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল অথচ পতিপ্রেমে মহীয়সী। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য কাব্যে যে সকল মহিমময়ী নারীর আলেখ্য অঙ্কিত হইয়াছে, প্রমীলা সেই সকল চিত্রের সৌন্দর্যের সারভূতা হইলেও চিত্রাঙ্গদা ও মন্দোদরী, সীতা ও সরমা কাহাকেও আমরা বিস্মৃত হইতে পারি না। কিন্তু কূলপ্লাবিনী নদী যেমন তটের শাসনকে উপেক্ষা করিয়া দুর্বার গতিতে প্রবাহিত হয়, তেমনই যে প্রেম শাস্ত্রের বন্ধন, সমাজের বন্ধন, ধর্মের বন্ধন সকল বন্ধনকে অগ্রাহ্য করিয়া দুর্দম গতিতে প্রিয়জনের অভিমুখে ধাবিত হয়, মেঘনাদবধে সে প্রেমের মহিমাকীর্তনের অবকাশ নাই। কিন্তু মধুসূদনের যে কবি-প্রকৃতি সমাজের নির্দেশ, ধর্মের নির্দেশ, ছন্দ ও অলঙ্কার-শাস্ত্রের নির্দশকে অগ্রাহ্য করিয়া অনাবিষ্কৃত পথে অভিযানে যাত্রা করিয়াছে, সে প্রকৃতি শুধু পতিপ্রেমে মহীয়সী নারীর মহিমান্বিত চিত্র অঙ্কন করিয়াই পরিতৃপ্ত হইতে পারে না, হউক সে নারী ব্রততীর মত কমনীয়া বা বহ্নিশিখার মত দীপ্তিমতী। তাই মধুসূদন ব্রজাঙ্গনা কাব্যে শ্রীমতী রাধার বিরহকে অবলম্বন করিয়া কুল-প্লাবিনী ভালবাসার জয়গান করিলেন। ব্রজাঙ্গনার রাধিকা যে বৈষ্ণব পদাবলীর মহাভাবময়ী রাধিকা নয়, প্রেমময়ী প্রাকৃত নায়িকা মাত্র, অনেক সমালোচক সে কথা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং মধুসূদনের ব্যক্তি-জীবনের সঙ্গে পরিচয় তাঁহাদের সে চেষ্টার সহায়ক হইয়াছে। কিন্তু এরূপ প্রয়াস নিষ্ফল। ব্রজাঙ্গনা কাব্যের রাধা পিঞ্জরাবদ্ধ বিহগীর মধ্যে

নিজের মর্মবেদনা অনুভব করিতেছেন, শ্যামের বংশীধ্বনি শ্রবণে সখীকে বলিতেছেন,—

"যে যাহারে ভালবাসে সে যাইবে তার পাশে
মদন রাজার বিধি লঙ্ঘিব কেমনে ?
যদি অবহেলা করি রুষিবে শম্বর-অরি
কে সম্বরে স্মর-শরে এ তিন ভুবনে ?"

ইহা দুর্জয়-প্রেমময়ী নায়িকার উক্তি এবং এ উক্তি শিলা-ভট্টারিকার একটি প্রসিদ্ধ শ্লোকের মত প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত উভয় জগতেই সমভাবে প্রযোজ্য।

বীরাঙ্গনা কাব্যে বিভিন্ন পত্রিকার মধ্য দিয়া কবি যে সকল চরিত্র-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, উহারা প্রত্যেকেই আপন স্বাতন্ত্র্যে দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে একদিকে যেমন পতিপ্রেমের উজ্জ্বল আলেখ্য অঙ্কিত হইয়াছে, পতির জন্য গভীর উৎকণ্ঠা প্রকাশিত হইয়াছে, অপর পক্ষে তেমনি সমাজ-বিগর্হিত দুর্জয় প্রেমকেও মহিমান্বিত করা হইয়াছে। এই কাব্যের দুঃশলা ও ভানুমতী উভয়েই ধর্মশীলা ও পতির মঙ্গলের জন্য উৎকণ্ঠিতা, অথচ কবি উভয়ের চারিত্রিক স্বাতন্ত্র্যটুকু অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। আবার নবমল্লিকা-কুসুমের মত কমনীয়া ঋষিকন্যা শকুন্তলা ও কৃষ্ণগতপ্রাণা ভক্তিমতী রুক্মিণীর প্রেমে কত পার্থক্য। শূর্পনখা ও তারা উভয়ের প্রেমই দুর্বার ও প্রচণ্ড, প্রেমের দুর্দম বেগে উভয়েই নীতি ও ধর্মে জলাঞ্জলি দিয়াছেন, তথাপি দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নী তারা ও রাক্ষসকুলোদ্ভব, লঙ্কেশ্বরের সহোদরা শূর্পনখার প্রকৃতি যে স্বতন্ত্র, লেখক আমাদিগকে তাহা বিস্মৃত হইতে দেন নাই। তারা প্রেমময়ী, কিন্তু সে যে কলঙ্কিনী, পাপিনী, সে কথা তাহার মনে সর্বদা জাগরূক রহিয়াছে। যে তারা সোমদেবের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন,—

"এস তবে, প্রাণসখে ; দিনু জলাঞ্জলি
কুলমানে তব জন্যে,—ধর্ম, লজ্জা, ভয়ে।
কুলের পিঞ্জর ভাঙ্গি, কুল-বিহঙ্গিনী
উড়িল পবন-পথে, ধর আসি তারে,
তারানাথ !"

সেই তারাই আবার নিজের আচরণে ধিক্কার দিয়া বলিয়াছেন,—

'জন্ম মম মহা ঋষিকুলে,
তবু চণ্ডালিনী আমি ? ফলিল কি এবে
পরিমলাকার ফুলে, হায়, হলাহল ?
কোকিলের নীড়ে কিরে রাখিলি গোপনে
কাকশিশু ? কর্মনাশা—পাপ-প্রবাহিণী
কেমনে পড়িল বহি জাহ্নবীর জলে ?"

কিন্তু শূর্পনখার মনে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সংঘাত-অনুতাপ নাই ; তাই সে অকুণ্ঠভাবে লক্ষ্মণকে বলিতে পরিয়াছে,—

"কায় মন প্রাণ আমি সঁপিনু তোমারে,
ভুঞ্জ আসি রাজভোগ দাসীর আলয়ে।"

আবার পুরুরবার রূপ-গুণে মুগ্ধা উর্বশীর কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ পত্রিকা-খানিতে প্রিয়তমের চরণে আত্মসমর্পণের আকাঙ্ক্ষাই প্রকট হইয়া উঠিয়াছে,—

"যথা বহে প্রবাহিণী বেগে সিন্ধুনীরে,
অবিরাম ; যথা চাহে রবিচ্ছবি-পানে
স্থির আঁখি সূর্যমুখী ; ও চরণে রত
এ মনঃ,—উর্বশী, প্রভু, দাসী হে তোমারি।"

'বীরাঙ্গনা কাব্যের' আশাহতা অভিমানিনী নির্লজ্জা কটুভাষিণী কৈকেয়ীর প্রতি আমাদের সহানুভূতি জাগে, পুত্রশোকাতুরা বীরাঙ্গনা জনার গ্লানিসূচক উক্তিকে আমরা ক্ষমা করি, কৃষ্ণগত-

প্রাণা রুক্মিণীর প্রেমের গভীরতায় আমরা মুগ্ধ হই, জাহ্নবী-চরিত্রের লোকাতীত মহিমা আমাদের বুদ্ধি ও কল্পনাকে অভিভূত করে।

চতুর্দশপদী কবিতাবলী

মধুসূদনের তিলোত্তমাসম্ভব যদি কবিপ্রতিভার বালার্কচ্ছটা, চতুর্দশপদী কবিতাবলী তবে সেই সূর্যের ক্রম-বিলীয়মান রশ্মিরাগ। কিন্তু এই কবিতাবলীতেই আমরা মধুসূদনের আত্মগত আশা ও আকাঙ্ক্ষা, বেদনা ও ব্যর্থতার পরিচয় পাই,—মধুসূদনের হৃদয়ে নৈরাশ্যের মেঘ তখন পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল, লোকোত্তর প্রতিভার অধিকারী হইয়াও কবি-চিত্ত সংশয়ে পীড়িত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—

"লিখিনু কি নাম মোর বিফল যতনে
বালিতে, রে কাল, তোর সাগরের তীরে ?"

তীব্র দারিদ্র্যে ক্ষুব্ধ হইয়া কবির অন্তর গাহিয়া উঠিয়াছিল,—

"উদাসীন-দশা তার সদা জীব-পুরে,
যে অভাগা রাঙা পদ ভজে মা, ভারতি !"

কবি এই মর্মান্তিক সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রতিভা-সূর্যের দীপ্তি ধীরে ধীরে ম্লান হইয়া অস্ত-দিগন্তে মিলাইয়া যাইতেছে, চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে কবির অন্তর্জীবনের এই ঘটনার সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে। আবার মধুসূদন যে মনে-প্রাণে খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন, সুদূর প্রবাসে অবস্থিতি-কালেও যে "জন্মভুমি-স্তনে দুগ্ধ-স্রোতোরূপী' কপোতাক্ষ নদের স্মৃতি তাঁহার অন্তরে উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিতেছিল, আগমনী ও বিজয়ার গান যে কবিচিত্তে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত হইয়াছিল, দেশ-বিদেশের কবিগণের কাব্যসুধাপানে পরিতৃপ্ত হইলেও কবি যে কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস,

মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, এমন কি, ঈশ্বর গুপ্তের কথাও বিস্মৃত হন নাই, চতুর্দশপদী কবিতাবলী পাঠ করিয়া আমরা তাহাও জানিতে পারি। কিন্তু 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে কবির অন্তর্জীবনের প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকিলেও চতুর্দশ পংক্তির ক্ষুদ্র পরিসরের ভিতর কবি-চিত্ত পরিপূর্ণ-ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই।

মিল্টনের 'সনেট' সম্পর্কে ডাক্তার জন্‌সন্‌ বলিয়াছেন,— "Milton's was a genius that could hew a colossus out of a rock but could not carve heads on cherry-stones'.

জন্‌সনের এই অতিশয়োক্তিটি যেমন মিল্টনের সনেট সম্পর্কে, তেমনি মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাবলীর সম্পর্কেও আংশিক ভাবে সত্য।

মধু-চক্র

অনেক সমালোচক মধুসূদনের রচনাবলীতে, বিশেষতঃ মেঘনাদবধ কাব্যে, পাশ্চাত্ত্য রেনেঁশাসের প্রভাব আবিষ্কারের অতিমাত্রায় উৎসাহে তাঁহার উপর পূর্ব-গামী ভারতীয় কবিগণের প্রভাবকে খর্বীকৃত করিয়াছেন। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, বাল্যকাল হইতেই কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় মধুসূদনের ছিল এবং এই দুইজন কবি তাঁহার চেতনার গভীরতম স্তরকে স্পর্শ করিয়াছিল। মেঘনাদবধে য বিভীষণ বিশ্বাসঘাতকরূপে চিত্রিত হইয়াছেন, ইহা আর্ষ রামায়ণের বিরোধী হইলেও কৃত্তিবাসী রামায়ণের অনেকটা অনুরূপ। আমাদের দেশে যে একটি প্রবাদ বহুকাল যাবৎ চলিয়া আসিতেছে, 'ঘরের শত্রু বিভীষণ', ইহার মূলেও কি কোন আধুনিক

পণ্ডিত পাশ্চাত্ত্য প্রভাব আবিষ্কার করিতে চাহেন ? বিভীষণের প্রসঙ্গে কৃত্তিবাস যে বলিয়াছেন,—

"পিতা হউন, পুত্র হউন, হউন জননী,
দেশের যে শত্রু, তাকে শত্রু বলে গণি।"

ইহাও কি পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের ফল ?

অবশ্য, মধুসূদনের রাবণ আর্ষ রামায়ণের রাবণ নহেন, তাই বীরবাহুবধের পর পুত্রশোকাতুর রাবণের কণ্ঠে আমরা শুনিতে পাই,—

"রিপুদলবলে দলিয়া সমরে,
জন্মভূমি-রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে ?
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ়, শত ধিক তারে।"

রাবণের এই স্বদেশ-প্রেমে আছে রেনেঁশাসের প্রভাব।

কাব্যের ষষ্ঠ সর্গে আমরা বিভীষণের প্রতি মেঘনাদের তিরস্কার-বাণী শুনিতে পাই,—

"কোন্ ধর্মমতে, কহ দাসে, শুনি
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি,—এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি ? শাস্ত্রে বলে, গুণবান যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়, পর পর সদা।"

এখানে কিন্তু আর্ষ রামায়ণেরই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই।

'ন জ্ঞাতিত্বং ন ভ্রাতৃত্বং ন জাতিস্তব দুর্ম্মতে।
প্রমাণং ন চ সৌহার্দ্দ্যং ন ধর্ম্মো ধর্ম্মদূষক॥
গুণবান্ বা পরজনঃ স্বজনো নির্গুণোহপিবা।
নির্গুণঃ স্বজনঃ শ্রেয়ান্ যঃ পরঃ পর এব চ॥

সুতরাং এ কথা আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মধুসূদন প্রতীচ্যের কাব্য-সাহিত্যের ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হইলেও এবং প্রধানতঃ

সেই সাহিত্য-কানন হইতে পুষ্পচয়ন (?) করিলেও বাল্মীকি, কালিদাস ও কৃত্তিবাসের রচিত কাব্যোদ্যান হইতেও কুসুম আহরণ করিয়া ও উহা যথা-স্থানে গ্রথিত করিয়া এক অপূর্ব নূতন মাল্য রচনা করিয়াছেন। (মধুসূদনের উপর মহর্ষি বাল্মীকির প্রভাব যে সামান্য নয়, সে সম্পর্কে মৎপ্রণীত 'ভারত-জিজ্ঞাসা' গ্রন্থের 'মহর্ষি বাল্মীকি ও কবি শ্রীমধুসূদন) প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য'। ফলতঃ, মধুসূদন (একবার মাত্র) নানা দেশ-বিদেশের কবিগণের চিত্তফুলবন-মধু আহরণ করিয়া এমন এক অপূর্ব মধু-চক্র নির্মাণ করিয়াছেন, যাহা বাংলা সাহিত্যে 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি'।

দীনবন্ধু ও বাংলার নাট্যসাহিত্য

বাংলার নাট্যসাহিত্যে দীনবন্ধুর দান অবিস্মরণীয়।

বহু দোষ-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও দীনবন্ধু যে বাংলার নাট্য-সাহিত্যে একক, সে বিষয়ে বোধ হয় রসজ্ঞ পাঠকদের মধ্যে কোন মতদ্বৈধ নাই। সম্ভবতঃ দীনবন্ধুর যতখানি শক্তি ছিল, ততখানি সার্থকতা তিনি লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার মধ্যে যে পরিমাণে শিল্পিজনোচিত সহানুভূতি ছিল, সেই পরিমাণে শিল্পি-সুলভ মাত্রাবোধ ছিল না, বাহিরের ঘটনাপুঞ্জ তাঁহার নিকট যতখানি সত্য ছিল, মানুষের অন্তরের বিভিন্ন ভাবের ঘাত-প্রতিঘাত ততখানি সত্য ছিল না; তাঁহার মধ্যে যতটা চিত্ত-চমৎকারের প্রয়াস ছিল, ততটা সুদূরপ্রসারিণী কল্পনা ছিল না। এক কথায়, তিনি যতখানি বহির্মুখ ছিলেন, ততখানি অন্তর্মুখ ছিলেন না। অন্তরের মধ্যে কান পাতিলে তিনি যতটা জনতার কোলাহল শুনিতে পাইতেন, ততটা নৈঃশব্দ্য অনুভব করিতে পারিতেন না। সংসারে বহু প্রতিভাশালী ব্যক্তি অন্তরের মধ্যে একটা নিঃসঙ্গ একাকীত্ব অনুভব করেন—বিবিক্তদেশ-সেবিত্ব তাঁহাদের মানস জীবনের পক্ষে জলবায়ুর মতই অপরিহার্য বলিয়া মনে করেন—কিন্তু সেই একাকীত্ব, সেই জন-সংসদে অরতি—দীনবন্ধু হয়ত কোন দিনই বিশেষভাবে অনুভব করেন নাই। সুতরাং শ্রেষ্ঠ নাট্যকারসুলভ অন্তর্দৃষ্টি দীনবন্ধু লাভ করিতে পারেন নাই।

দীনবন্ধুর প্রথম নাটক নীলদর্পণে (১৮৬০) (নীলকর-বিষধর-দংশন-কাতর-প্রজানিকরক্ষেমঙ্করেণ কেনচিৎ পথিকেনাভিপ্রণীতং) নাট্যকারের প্রচুর অভিজ্ঞতা ও লাঞ্ছিত, অসহায় মানুষের প্রতি অপরিসীম সহানুভূতির পরিচয় আছে এবং নীলকরের অত্যাচার-

রূপ একটি সাময়িক ঘটনা ইহার বিষয়বস্তু হইলেও নাটকখানির একটি চিরন্তন সাহিত্যিক মূল্য আছে। দুর্বলের উপর শক্তিমদমত্ত প্রবলের অত্যাচারের চিত্র যে পরিবেশের মধ্যেই প্রদর্শিত হউক না কেন, চিরদিনই মানুষের অন্তরে সমবেদনার উদ্রেক করে। কিন্তু ইহা বিয়োগান্ত নাটক হিসাবে অনেকাংশে ব্যর্থ হইয়াছে। কেননা, খাঁটি বিয়োগান্ত নাটক রচনা করিতে হইলে নাট্যকারের গভীর জীবন-দৃষ্টির (high seriousness) প্রয়োজন। মানব-মনের সূক্ষ্ম বৈচিত্র্যের বা বিরুদ্ধ ভাবের সংঘাতে মানুষের মনে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, উহার চিত্র অঙ্কিত করিতে হইলে নাট্যকারের যে অন্তর্মুখিতার প্রয়োজন, দীনবন্ধুর চরিত্রে তাহার একান্ত অভাব ছিল। আমরা বলিয়াছি, দীনবন্ধুর যতটা পর্য্যবেক্ষণশক্তি ও সহানুভূতি ছিল, ততখানি অন্তর্দৃষ্টি ছিল না। আবার যথার্থ নাটকের পক্ষে ঘটনার যে ঐক্য বা সংহতি অপরিহার্য, নীলদর্পণে উহার একান্ত অভাব। কিন্তু বহু দোষ সত্ত্বেও নীলদর্পণ যে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে যুগান্তরের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। অবশ্য নীলদর্পণের ভাষায় স্থানে স্থানে যে কৃত্রিম উচ্ছ্বাস দেখা যায়, বাংলা গদ্যের তৎকালীন অবস্থা স্মরণ করিলে উহার জন্য দীনবন্ধুকে সম্পূর্ণ দায়ী করা চলে না।

দীনবন্ধুর দ্বিতীয় নাটক 'নবীন তপস্বিনী' (১৮৬৩) গ্রন্থকারের রচিত আখ্যান-কাব্য 'বিজয়-কামিনী' অবলম্বনে রচিত। এই রোমান্স-ধর্মী নাটকখানিতে লেখক দর্শকগণের চিত্ত-চমৎকার উৎপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু দীনবন্ধুর প্রতিভা স্বভাবতঃই এই শ্রেণীর নাটক-রচনার উপযোগিনী ছিল না, তাই তাঁহার প্রয়াস অনেকাংশে ব্যর্থ হইয়াছে। এই নাটকে বঙ্কিমচন্দ্র সেক্‌স্‌পীয়রের —Merry Wives of Windsor এর প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, 'প্রকৃত ঘটনা, জীবিত ব্যক্তির চরিত্র, প্রাচীন

উপন্যাস, ইংরেজী গ্রন্থ এবং প্রচলিত খোসগল্প হইতে সার গ্রহণ করিয়া দীনবন্ধু তাহার অপূর্ব চিত্তরঞ্জক নাটকসকলের সৃষ্টি করিতেন। নবীন তপস্বিনীতে ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়'।

প্রহসন-রচনায় ও হাস্যরসের অবতারণায় দীনবন্ধুর নৈপুণ্য ছিল স্বাভাবিক। তাঁহার 'বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো' প্রকাশিত হইলে বাঙ্গালী পাঠক-সমাজ তাঁহার এই শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পায়। বিবাহের জন্য উন্মত্ত রাজীবের লাঞ্ছনা ও দুর্গতি ও বৃদ্ধা ডুম্‌নী পেঁচোর মার সঙ্গে অবাঞ্ছিত মিলন পাঠকের মনে যে কৌতুক-রসের সঞ্চার করে, তাহা বিশেষভাবে উপভোগ্য। দীনবন্ধু যে কালে জীবিত ছিলেন, সে কালে বাঙ্গালী-সমাজে রাজীবের অভাব ছিল না, আর এখনও হয়তো রাজীবের সগোত্রের বাঙ্গালী সমাজ হইতে একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই। রাজীবের প্রকৃতিগত দুর্বলতাকে কিন্তু লেখক সহানুভূতির চোখে দেখিয়াছেন এবং মৃদু কশাঘাতের সাহায্যে রাজীবের দলের চৈতন্য-সম্পাদন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। দীনবন্ধু যেখানে প্রয়োজন বোধ করিয়াছেন, সেখানে সমাজের দোষ-ত্রুটির প্রতি তীক্ষ্ণ কশাঘাত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। রাজীবের কন্যা রামমণির নিকট পেঁচোর মা নবদ্বীপের পণ্ডিতদের সম্পর্কে বলিয়াছেন,—'ট্যাকা পালি তানারা গরু খাতি বস্তা দিতি পারে, মোর বের বস্তা তু তুশ্চু কথা'। এই কথাগুলির মধ্যে পণ্ডিত-সমাজের অর্থলোভের প্রতি যে ইঙ্গিত করা হইয়াছে, উহাতে আমাদের শুধু হাসির উদ্রেক করে না, অন্তরকেও বেদনায় আপ্লুত করিয়া তোলে।

'সধবার একাদশী' রচনা করিয়া দীনবন্ধু সে যুগে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন এই গ্রন্থ-প্রচারে অতিমাত্রায় ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন এবং তীব্র ভাষায় নাট্যকারের নিন্দা করিয়াছিলেন। কিন্তু শুধু ন্যায়রত্ন মহাশয় নহেন, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও

এই নাটকখানির অবিমিশ্র প্রশংসা করিতে পারেন নাই। তিনি লিখিয়াছিলেন,—'এই প্রহসন বিশুদ্ধ রুচির অনুমোদিত নহে'। নীলদর্পণে যে ভাষাগত অশ্লীলতা বা গ্রাম্যতা-দোষ রহিয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্র উহার নিন্দা করেন নাই কিন্তু সধবার একাদশীতে তিনি যে রুচিগত অশ্লীলতা দেখিতে পাইয়াছিলেন, উহাকে তিনি ক্ষমা করিতে পারেন নাই।

'সধবার একাদশী' দীনবন্ধুর শ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া অনেকে নির্দেশ করিয়াছেন। এই প্রহসনখানিতে দীনবন্ধু হাস্যরসের সৃষ্টিতে ও চরিত্র-চিত্রণে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন, প্রত্যেকটি চরিত্র সহানুভূতির সঙ্গে অঙ্কিত করিয়াছেন এবং গ্রন্থের নামকরণের আপাত-প্রতীয়মান অসঙ্গতির মধ্য দিয়া এক শ্রেণীর পুরুষ-চরিত্রের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। ইহার প্রত্যেকটি চরিত্র—অটলবিহারী, নিমচাঁদ, ভোলাচাঁদ, কেবলা হাকিম বা ঘটিরাম, রামমাণিক্য প্রভৃতি প্রতিটি চরিত্রই সে যুগের এক একটি বিশেষ টাইপ ;—এই চরিত্রগুলির মধ্যে শিক্ষিত নিমচাঁদের দুর্গতি আমাদের হৃদয়কে বিশেষভাবে সমবেদনায় আর্দ্র করে। এই প্রহসনখানিতে আমরা দীনবন্ধুর হাস্যস্নিগ্ধ মূর্তির পশ্চাতে বেদনাদিগ্ধ মূর্তিখানি দেখিতে পাই। মানুষের অধোগতি (degradation) ও অসঙ্গতি (incongruity) যদি হাস্যরসের উৎস হয়, (Sully, Hoffding প্রভৃতি মনীষিগণ এই মত পোষণ করিয়াছেন) তবে 'সধবার একাদশী'তে উভয়বিধ চিত্রই অঙ্কিত হইয়াছে। গোকুল বাবুর প্রতি নিমচাঁদের উক্তি 'Arise, fair sun, and kill the envious দরওয়ান' অথবা সার্জেন্টের আলো-দর্শনে পানোন্মত্ত অবস্থায় তাঁহার উক্তি 'Hail! Holy Light! offspring of Heaven' প্রভৃতি দীনবন্ধুর হাস্যরসের নিদর্শন। দীনবন্ধু যে এই প্রহসনখানির মধ্য দিয়া নীতি-শিক্ষা দিবার সজ্ঞান প্রয়াস করেন নাই ইহা ভালই হইয়াছে। তবে, এ কথাও

সত্য যে দীনবন্ধু এই প্রহসনখানিতে স্থূল রসিকতা সৃষ্টির উৎসাহে অনেক স্থলে মাত্রা লঙ্ঘন করিয়াছেন। 'শব্দালঙ্কার-প্রয়োগের' সজ্ঞান প্রয়াস যেমন কবি ঈশ্বর গুপ্তকে পাইয়া বসিয়াছিল, তেমনি স্থূল, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য রসিকতার অবতারণা করিয়া পাঠক বা দর্শকের হাসির উদ্রেক করিবার একটা সচেতন প্রচেষ্টাও দীনবন্ধুকে যেন পাইয়া বসিয়াছিল। শিল্পিসুলভ সংযম রক্ষা করিয়া যদি দীনবন্ধু নাটকখানি প্রণয়ন করিতেন, তাহা হইলেও কোন চরিত্র অপূর্ণাঙ্গ হইত বলিয়া মনে হয় না।

সেকালের একজন সমালোচক 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায় 'সধবার একাদশীর' অনুকূল সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সমালোচক ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্যের মতে নিমে দত্তই প্রহসনখানির যথার্থ নায়ক এবং রক্ত-মাংসের মানুষের মতই তাঁহার চরিত্রও দোষে-গুণে গঠিত। কিন্তু একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, 'সধবার একাদশী' রচনায় দীনবন্ধু যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিলেও শিল্পিজনোচিত সংযম বা মাত্রাবোধের পরিচয় দিতে পারেন নাই। দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী'তে মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' নামক প্রহসনের প্রভাব আছে সত্য কিন্তু মধুসূদন দীনবন্ধুর মত স্থূল রসিকতা-সৃষ্টির সজ্ঞান প্রয়াস করেন নাই। সেই জন্য অনেকের মতে মধুসূদন প্রহসন-রচনার ক্ষেত্রে আজও বাংলা সাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া রহিয়াছেন। সে যাহা হউক, দীনবন্ধুর প্রতিভা যে বিশেষভাবে প্রহসন-রচনার উপযোগিনী ছিল, সে কথা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার দোষ-ক্রটিগুলির সম্পর্কেও আমরা উদাসীন থাকিতে পারি না।

দীনবন্ধুর 'লীলাবতী' (১৮৬৭) 'নবীন তপস্বিনীর' মতই রোমান্সধর্মী নাটক, কিন্তু নাটকখানিতে লেখক ললিতমোহন ও

নদের চাঁদ এই দুইটি বিপরীত চরিত্র অঙ্কিত করিয়া কৌলীন্য-প্রথার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। নাটকখানি দীনবন্ধুর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন না হইলেও সে যুগে বিশেষ প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় নাটকখানির উপাখ্যানের মনোরম বৈচিত্র্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এই নাটক-খানিতে দীনবন্ধু অনেকটা সংযম ও সুরুচির পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার লঘু-চপল হাস্যরস এখানে তেমন স্ফূর্তির অবকাশ পায় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, 'লীলাবতী বিশেষ যত্নের সহিত রচিত এবং দীনবন্ধুর অন্যান্য নাটকাপেক্ষা ইহাতে দোষ অল্প।' 'দোষ' বলিতে বঙ্কিমচন্দ্র অন্যান্য দোষের সঙ্গে গ্রাম্যতা-দোষের প্রতিও ইঙ্গিত করিয়াছেন।

দীনবন্ধুর 'জামাই বারিক' প্রহসনখানিও (১৮৭৩) বেশ উপভোগ্য। যে যুগে বড়লোকের গৃহে 'ঘরজামাই'র দল শ্বশুর-মন্দিরে মর্যাদাহীন অকর্মণ্য জীবনযাপন করিত, সে যুগ হইতে আমরা বহুদূরে সরিয়া আসিয়াছি, তথাপি এই প্রহসনখানি পাঠ করিয়া আমরা হাস্য-সংবরণ করিতে পারি না। গর্বিতা কামিনীর জীবনে যে পরিবর্তন আসিয়া তাহার সকল গর্ব চূর্ণ করিয়াছিল, উহা আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। ঘরজামাইর তালিকায় যখন আমরা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম শুনিতে পাই তখন আমাদের বেশ কৌতুক বোধ হয়। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে দীনবন্ধু 'জামাই ষষ্ঠী' নামে যে কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে 'জামাই বারিক' প্রহসনের বিষয়বস্তুর ছায়াপাত হইয়াছে :—

"যে জন হয়েছে, ঘর জামায়ে, জামাই।
কোনদিন নাহি তার ষষ্ঠীর কামাই॥
দু' কুলেতে কেহ নাই, কোথা আর যায়।
ষষ্ঠীর বিড়াল হয়ে মাছ দুধ খায়॥

অপমানে অপমান কিছু নাহি বোধ।
পেটে খেলে পিঠে সয়, কেন হবে ক্রোধ ॥
ফলে যদি এ বিষয়ে দোষ তার ধরি।
বিচারেতে দোষী হন হর আর হরি ॥”

দীনবন্ধুর ‘কমলে কামিনী’ (১৮৭৩) নাটকখানিও একটি কাব্যধর্মী রোমান্স; ইহার আখ্যানবস্তুর মূল বিষয় প্রেম। যে নিরঙ্কুশ কবি-কল্পনা এ ধরণের আখ্যান-বস্তুর উপজীব্য, দীনবন্ধুর সে কল্পনা ছিল না; সুতরাং, নাটকখানি তেমন সার্থকতা লাভ করে নাই। দীনবন্ধু হয়তো আপন প্রতিভার সীমা-সম্পর্কে তেমন সচেতন ছিলেন না; হয়তো বা বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণে প্রেমমূলক চিত্তচমৎকার-কারী আখ্যান-বস্তুকে নাট্যাকারে গ্রথিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

রুচিগত ও ভাষাগত অশ্লীলতার জন্য দীনবন্ধু বহু নিন্দিত হইয়াছেন, আবার কোন কোন সমালোচক এ বিষয়ে দীনবন্ধুর পক্ষে ওকালতি করিতে গিয়া প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছেন। এই উভয় শ্রেণীর সমালোচকই একদেদর্শী। দীনবন্ধুর প্রশংসা করিতে গিয়া কোন একজন মনস্বী সমালোচক সত্যের অপলাপ পর্যন্ত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—‘স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর রুচিকে অসংযত বা অনির্মল বলিয়া অবহেলার যোগ্য মনে করেন নাই’ (দীনবন্ধু মিত্র, ডাক্তর সুশীলকুমার দে, পৃষ্ঠা ৪) কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যে ‘সধবার একাদশী’তে বিশুদ্ধ রুচির অভাব দেখিতে পাইয়া ইহার যথেষ্ট নিন্দাও করিয়াছেন, লেখক কোথাও সে কথার উল্লেখ করেন নাই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘কিঞ্চিৎ জলযোগের’ আলোচনা-প্রসঙ্গেও বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন,—

‘সধবার একাদশী’ অশ্লীলতা-দোষে দূষিত হইলেও অন্যান্য গুণে ভারতবর্ষীয় ভাষায় এরূপ প্রহসন দুর্লভ।” (বঙ্গদর্শন, চৈত্র, ১২৭৯)।

অবশ্য, বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর বিরুদ্ধে যে অশ্লীলতার অভিযোগ করিয়াছেন, উহার মূলে আছে যুগের প্রভাব এবং বিশেষ ভাবে ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব। যে অসাধারণ শক্তির বলে বঙ্কিমচন্দ্র যুগের প্রভাব এবং স্বীয় গুরুর প্রভাবকে পর্যন্ত অতিক্রম করিয়াছিলেন, সে শক্তি দীনবন্ধুর ছিল না। কিন্তু সার্থকনামা পুরুষ দীনবন্ধুর মধ্যে শিল্পিজনোচিত দুইটি গুণ বিশেষ ভাবে বিদ্যমান ছিল,—লাঞ্ছিত মানবতার প্রতি সমবেদনা ও স্বদেশবাসীর স্খলন-পতন-ত্রুটিতে বেদনাবোধ। এই দুইটি গুণেই তিনি নীলদর্পণ রচনার দ্বারা 'প্রজানিকর-ক্ষেমঙ্কর' হইতে পারিয়াছিলেন এবং প্রহসন-রচনায় অনন্যদুর্লভ সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

ঋগ্বেদে বৈদিক ঋষি বলিয়াছেন,—'ইলা, সরস্বতী ও মহী এই দেবীত্রয় সুখদায়িনীরূপে আমাদের হৃদয়ে স্থান লাভ করুন'।

ইলা সরস্বতী মহী তিস্রো দেবীর্ময়ো ভুবঃ।
বর্হিঃ সীদন্ত্বস্রিধঃ। ঋক্ ১।১৩।৯

এখানে সম্ভবতঃ ইলা, সরস্বতী ও মহী যথাক্রমে মাতৃভাষা, মাতৃ-সভ্যতা ও মাতৃভূমির প্রতীক। আমরা বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পর্কে কিছু বলিবার পূর্বে বৈদিক ঋষির এই মন্ত্র স্মরণ করি, কেননা, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসাধনা প্রকৃতপক্ষে এই তিন দেবীরই উপাসনা। বঙ্কিমচন্দ্রকে যিনি একটা যুগ বলিয়াছেন এবং যুগস্রষ্টা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তিনি সত্য কথাই বলিয়াছেন। তরুণ বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্যরূপে কাব্যসাধনার পথে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তারপর স্বদেশীয় বিষয়বস্তু অবলম্বনে ইংরেজি ভাষায় উপন্যাস রচনা করিয়া যশস্বী হইতে চাহিয়াছিলেন, তারপর প্যারীচাঁদের গদ্যরীতির অনুসরণে বাংলায় উপন্যাস-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াও সাত অধ্যায়ের বেশী অগ্রসর হন নাই। তখন পর্যন্ত প্রতিভাশালী পুরুষ আপনার প্রতিভার পথ খুঁজিয়া না পাইয়া বিজন সাধনায় রত ছিলেন। তারপর 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া তিনি সহসা আত্মশক্তি-সম্পর্কে সচেতন হইলেন। 'দুর্গেশনন্দিনী'র রচনাভঙ্গি নির্দোষ না হইলেও বাঙ্গালী পাঠক এই গ্রন্থেই সর্বপ্রথম এমন এক গদ্যরীতির সন্ধান পাইল যাহাকে বলা হয় 'বিশ্রম্ভ রীতি', এইরূপ রীতির মধ্য দিয়াই লেখক পাঠকের অন্তরঙ্গ বন্ধু হইয়া উঠেন। আবার, এই উপন্যাসেই বঙ্কিমচন্দ্র শব্দচিত্র-অঙ্কনে ও শব্দ-সংগীত-সৃষ্টিতে যে নৈপুণ্য দেখাইলেন, উহা

যে পূর্বগামী লেখকদের মধ্যে দুর্লভ ছিল, সাহিত্যরসপিপাসু বাঙ্গালী পাঠক তাহা সুস্পষ্টরূপে অনুভব করিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'Rajmohan's Wife' এ চরিত্র-সৃষ্টির বৈচিত্র্য না থাকিলেও ইহাতে তাঁহার প্রতিভার নবারুণচ্ছটা লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-রচনার প্রথম প্রয়াসের সঙ্গে তাঁহার পরবর্তী সাহিত্যকৃতির সংযোগ-সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছেন। বাস্তবিক, বঙ্কিম-মানসের ক্রম-বিকাশের ধারা অনুসরণ করিতে হইলে 'রাজমোহনের স্ত্রী' হইতেই যাত্রা আরম্ভ করা উচিত। এই অপরিণত সাহিত্যিক প্রয়াসের মধ্যেও বঙ্কিমচন্দ্র নারী-চরিত্র-অঙ্কনে অধিকতর নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। তরুণ বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতেও নারী যে মহাশক্তির আধার, মাতঙ্গিনী ও তারার চরিত্রে আমরা তাহার পরিচয় পাই।

বাংলার প্রথম যথার্থ উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' কলা-কৌশলের দিক দিয়া যতটা উৎকর্ষের দাবী করিতে পারে, তাহা সত্যই বিস্ময়কর। কাহিনীর জটিলতা, চমৎকারিতা ও নাটকীয় দ্রুতগতি, সমাজ-বহির্ভূত অথচ আত্মত্যাগে মহিমান্বিত প্রেমের উজ্জ্বল আলেখ্য, দেবালয়ে নায়ক ও নায়িকার পরস্পরের প্রতি অনুরাগ-সঞ্চারের কাহিনী, নায়কের বিচারমূঢ়তা ও নায়িকার স্থৈর্য্যের চিত্র, চতুরা রমণীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের নিদর্শন প্রভৃতি উপন্যাসখানিকে সর্বতো-ভাবে উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। বাঙ্গালীর বৈচিত্র্যহীন, গতানুগতিক জীবন-যাত্রার মধ্যে এই রোমান্স-ধর্মী আখ্যায়িকা তাহার সম্মুখে এমন এক নূতন জগৎ উদ্ঘাটন করিয়াছে যেখানে মানুষের অশ্রু কল্পনার রামধনুচ্ছটায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে, যেখানে পঞ্চশর রণ-কোলাহলের মধ্যেও তাহার পুষ্পধনু বর্ষণ করে, আবার করুণা যেখানে সহসা প্রেমে রূপান্তরিত হইয়া মানুষের গড়া শাস্ত্র ও সমাজকে অস্বীকার করে অথচ প্রতিদ্বন্দ্বিনীর জন্য মহান

আত্মত্যাগেও কুণ্ঠিত হয় না। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে কিঞ্চিৎ ভাষাগত ত্রুটি ও চরিত্র-সৃষ্টিতে কিছু অসঙ্গতি আছে সত্য, আবার ইহাতে যে হাস্যরসের অবতারণা করা হইয়াছে তাহা 'নির্মল, শুভ্র, সংযত' হইলেও অত্যন্ত স্থূল; তথাপি 'দুর্গেশনন্দিনী'তেই সে যুগের সাহিত্যরসিক পাঠক বঙ্কিম-প্রতিভার সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখিতে পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

আমাদের দেশের আলঙ্কারিকগণ দণ্ডীর দশকুমারচরিত, সুবন্ধুর বাসবদত্তা, বাণভট্টের কাদম্বরী প্রভৃতি গ্রন্থকে গদ্যকাব্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যে এরূপ গদ্যকাব্যের যে অভাব ছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের অলোকসামান্য প্রতিভা সে অভাব পূর্ণ করিয়া রসিক বাঙ্গালী-পাঠকের চিত্তে এক অননুভূতপূর্ব বিস্ময়রসের সৃষ্টি করিয়াছে। ভবভূতির 'মালতীমাধব' হইতে বঙ্কিমচন্দ্র শুধু 'কপালকুণ্ডলা' এই নামটি গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু ভবভূতির নায়িকা সম্পূর্ণ ভিন্ন উপাদানে গঠিত। কপালকুণ্ডলার পরিকল্পনায় বঙ্কিম কালিদাস, সেক্সপীয়র বা মিল্টনের নিকট ঋণী নহেন, তবে কপালকুণ্ডলার আখ্যান-বস্তুতে সেক্সপীয়রের 'ওথেল' নাটকের কিঞ্চিৎ ছায়া প্রতিফলিত হইয়াছে। প্রকৃতি-পালিতা কপালকুণ্ডলার জীবনে শুধু কাপালিক ও অধিকারীর প্রভাব নয়, গম্ভীরনাদী বারিধি ও স্নিগ্ধশ্যামা অরণ্যানীর প্রভাবও যথেষ্ট। লেখক অপূর্ব কৌশলে কপালকুণ্ডলা, মতিবিবি ও শ্যামাসুন্দরীর কাহিনী এক সূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন। আবার, যে নিয়তিবাদের উপর কপালকুণ্ডলার আখ্যানবস্তু গড়িয়া উঠিয়াছে, গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়েই নবকুমারের উক্তির মধ্যে তাহার মূল সূত্র নিহিত রহিয়াছে—'যাহা জগদীশ্বরের হাত, তাহা পণ্ডিতে বলিতে পারে না, ও মূর্খ, কি প্রকারে বলিবে'?

কপালকুণ্ডলা গ্রন্থে কপালকুণ্ডলা, মতিবিবি ও মেহেরুন্নেসা তিন

জন্যেই অসাধারণ নারী আর শ্যামাসুন্দরী সাধারণ গৃহস্থবধূ। নবকুমারের হৃদয়ে কপালকুণ্ডলার প্রতি যে প্রবল আকর্ষণ ছিল, তাহা নানাভাবে আত্ম-প্রকাশ করিলেও প্রকৃতি-দুহিতা কপালকুণ্ডলার আকর্ষণ কোন ব্যক্তি-পুরুষের দিকে প্রবাহিত হয় নাই, সে যেন প্রকৃতির মতই উদাসীন, নির্লিপ্ত, বন্ধনহীন। সুতরাং কপালকুণ্ডলার চরিত্রে বৃত্তিবিশেষের অভাব লক্ষ্য করিয়া যাঁহারা মনস্তাত্ত্বিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা পণ্ডিত হইলেও কাব্যরসিক নহেন। যে পরিবেশের মধ্যে গ্রন্থের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে, তাহা অত্যন্ত নাটকীয়; গ্রন্থশেষে লেখক যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহাতে একজন প্রাচীন সমালোচকের মনে জাগিয়াছে কবির একটি উক্তি,—

'Where shall I grasp thee
Infinite Nature—where' ?

কপালকুণ্ডলায় বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা কোথাও আড়ষ্ট নহে, ইহা যথার্থ কবি-ভাষা। এই ভাষা কোথাও চিত্র-ধর্মী, কোথাও বা সংগীত-ধর্মী হইয়া উঠিয়াছে।

'মৃণালিনী' উপন্যাসেই সর্বপ্রথম বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতির সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। ইহাতে তিনি বিশ্বাসঘাতকতার ভয়াবহ পরিণামের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, কিন্তু উপন্যাসের কলা-কৌশলের দিক দিয়া গ্রন্থখানি তেমন সার্থকতা লাভ করে নাই। এই গ্রন্থে হেমচন্দ্র-মৃণালিনী ও পশুপতি-মনোরমার প্রণয়-কাহিনী উত্তমরূপে গ্রথিত হয় নাই এবং মূল কাহিনী অপেক্ষা পশুপতি-মনোরমার কাহিনী অনেক বেশী প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। রহস্যময়ী ও বৈচিত্র্যময়ী মনোরমার চরিত্র লেখক অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু দুর্বলচরিত্র ও প্রেমোন্মত্ত নায়ক হেমচন্দ্র আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে না; বরঞ্চ পশুপতির প্রেমের

প্রবলতাই আমাদিগকে আকৃষ্ট করে। আমরা দেখিতে পাই, মনোরমার সঙ্গে মিলনের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতার অন্যতম কারণ। অবার উপন্যাসের নায়িকা মৃণালিনী পতিপ্রাণা হইলেও তাঁহার মধ্যে আমরা নারী-মহিমা পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করি না। তাঁহার চরিত্রে ব্যক্তিত্ব বলিয়া কোন জিনিষই নাই। সুতরাং মনোরমার চরিত্রের নিকট মৃণালিনীর চরিত্র সর্বাংশে ম্লান হইয়া যায়। মৃণালিনীর সখীত্বের চিত্রটি কিন্তু আমরা ভুলিতে পারি না। গিরিজায়ার চরিত্রটি ক্ষুদ্র, কিন্তু তাঁহাকেও সহজে বিস্মৃত হওয়া যায় না।

কোন কোন সমালোচক 'মৃণালিনী'তে লেখকের 'ঐতিহাসিক কল্পনার' পরিচয় পাইয়াছেন। এই উপন্যাসেই আমরা সর্বপ্রথম এমন একজন সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পাই, যিনি স্বহস্তে রাষ্ট্ররক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এইদিক দিয়া বিচার করিলে 'মৃণালিনীর' সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ তিনখানি উপন্যাসের সাদৃশ্য আছে। আবার পশুপতি ও মনোরমার জীবনে আমরা জ্যোতিষী গণনার সফলতা দেখিতে পাই, এইদিক দিয়া সীতারামের সঙ্গে 'মৃণালিনীর' সম্পর্ক আছে।

'বিষবৃক্ষে' বঙ্কিমচন্দ্র যেমন রোমান্সের বর্ণচ্ছটা-প্রোজ্জ্বল জগৎ হইতে আমাদের গার্হস্থ্য জীবনের পরিচিত পরিবেশের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তেমনই তাঁহার রচনা-রীতিরও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এই উপন্যাসের দুইটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য—নাটকীয় স্বগতোক্তি ও চিঠিপত্রের প্রাচুর্য। কুন্দনন্দিনীর মত লজ্জানম্রা অবাকপটু অথচ প্রেমময়ী বালিকা অথবা হীরার মত কুটিল, স্বার্থপরায়ণা, পরশ্রীকাতরা নারীর মনের কথা আমরা তাহাদের অন্তর্গূঢ় চিন্তাধারার অনুসরণ করিয়া জানিতে পারি। বিষবৃক্ষের যুগ বা বঙ্গদর্শনের যুগ হইতেই বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের মধ্য দিয়া

সজ্ঞানে যুগপৎ লোককল্যাণ-সাধন ও রসসৃষ্টির আদর্শকে গ্রহণ করিয়াছেন।

'বিষবৃক্ষে'র রচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্রের মনে মহাকবি কালিদাসের একটি উক্তি নিশ্চয়ই সজাগ ছিল—'বিষবৃক্ষোহপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্'। 'বিষবৃক্ষ' সামাজিক উপন্যাস হইলেও বঙ্কিমচন্দ্র ইহাতে গ্রীক ট্র্যাজিডি ও সেক্সপীয়রের ট্র্যাজিডির প্রভাবকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। কুন্দনন্দিনীর স্বপ্নে ভাবী ঘটনার যে ছায়াপাত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, তাহার জীবন পূর্ব হইতেই নিয়তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, সে তাহার জীবনের শোচনীয় পরিণতির জন্য দায়ী নয়। লেখক যে অপরিসীম সহানুভূতির সঙ্গে কুন্দনন্দিনীর চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, পরবর্তী কালে শৈবলিনী বা রোহিণীর চরিত্র সেই সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত করিতে পারেন নাই। কুন্দনন্দিনীর শোচনীয় পরিণতির মধ্য দিয়া তিনি তাহার প্রেম ও আত্মত্যাগকেই মহীয়ান করিয়াছেন, কোনরূপ নীতিকে সার্থক করিবার চেষ্টা করেন নাই। নগেন্দ্রনাথ স্বভাবত মহানুভব হইলেও রূপজ মোহ কিরূপে তাহাকে ধীরে ধীরে অধঃপতনের প্রায় শেষ সোপানে নামাইয়া আনিয়াছে, শিল্পী বঙ্কিম তাহা সুন্দর রূপেই চিত্রিত করিয়াছেন। আবার নগেন্দ্রনাথ ও সূর্যমুখীর দাম্পত্য প্রেমের মাঝখানে যে ব্যবধান রচিত হইয়াছিল, তাহার পার্শ্বে শ্রীশচন্দ্র ও কমলমণির দাম্পত্য প্রেমের আলেখ্য উজ্জ্বলতর হইয়া দেখা দিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথের অধঃপতনের কারণ সম্পর্কে লেখক সংক্ষেপে যে ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা দুই একটি ঘটনার মধ্য দিয়া পরিস্ফুট করিলে তাহার প্রতি পাঠকের সহজেই সহানুভূতির উদ্রেক হইতে পারিত। তথাপি, দেবেন্দ্রনাথের ভিতর যে একটি অপরিতৃপ্ত প্রেমপিপাসু হৃদয় ছিল, তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি।

একমাত্র হীরাকেই আমরা উপন্যাসের Villain মনে করিতে পারি, কিন্তু তাহাকেও লেখক একেবারে হৃদয়হীন বা অনুভূতিশূন্য করিয়া সৃষ্টি করেন নাই।

'বিষবৃক্ষে' লেখক বিশুদ্ধ দাম্পত্য প্রেম ও রূপজ মোহের পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া মোহ বা কামের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করিয়া দিয়াছেন, উপদেষ্টা বা আদর্শবাদী বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে যেন একটু বেশী জায়গা দখল করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রই প্রচারক বঙ্কিমচন্দ্রের উপর জয়ী হইয়াছেন।

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসকে 'বাল্যপ্রণয়ের ট্র্যাজিডি' না বলিয়া 'সংযমীর ব্রতভঙ্গের' ট্র্যাজিডি বলাই অধিকতর সঙ্গত। (বঙ্কিম-পরিচিতি, 'বঙ্কিম-চন্দ্রের উপন্যাস' শীর্ষক প্রবন্ধ।) প্রতাপকেই প্রকৃতপক্ষে এই গ্রন্থের নায়ক বলা যায়, তথাপি চন্দ্রশেখরের ক্ষণিক মোহই তিনটি অমূল্য জীবনকে সীমাহীন ব্যর্থতায় ভরিয়া দিয়াছে এবং এইদিক দিয়া গ্রন্থের নামকরণ সার্থক হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, 'চন্দ্রশেখর ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিত, কিন্তু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নহেন'। কিন্তু চন্দ্রশেখর যদি গ্রন্থপণ্ডিত না হইয়া নারীহৃদয়ের রহস্যে প্রবীণ হইতেন, অথবা যদি যথার্থ পণ্ডিতের মত কুসুম-সায়কের লক্ষ্য না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার কিংবা প্রতাপ-শৈবলিনীর জীবনে এমন শোচনীয় পরিণতি ঘটিত না। শুধু চন্দ্রশেখর কেন, তাঁহার গুরু রামানন্দ স্বামী নির্লিপ্ত সন্ন্যাসী কিংবা যোগবলে বলীয়ান হইলেও নারীর মনের রহস্যের সন্ধান পান নাই। চন্দ্রশেখরের ক্ষণিক আত্মবিস্মৃতি এবং প্রতাপ-শৈবলিনীর বাল্যপ্রণয়—এই উভয় ঘটনাই তিনটি জীবনকে অনিবার্য পরিণতির দিকে লইয়া গিয়াছে।

'চন্দ্রশেখরে', বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনার যে বিশালতা ও বিস্তৃতি দেখা যায়, তাহাতে এই আখ্যায়িকাকে রোমান্সের পর্যায়ভুক্ত করা চলে।

ইহাতে ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে গার্হস্থ্য জীবনের কাহিনী অপূর্ব কলাকৌশলের সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত হইয়াছে এবং সমগ্র আখ্যায়িকাটি কবি-কল্পনার ইন্দ্রধনুচ্ছটায় রঞ্জিত হইয়াছে। অবশ্য উপন্যাসের শেষের দিকে বঙ্কিমচন্দ্র নীতির আদর্শকে প্রতিষ্ঠার জন্য ঘটনার নাটকীয় গতিকে শিথিল করিয়াছেন। উপন্যাসখানিতে বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষুদ্র চরিত্র অঙ্কনেও অসামান্য কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে যে দ্বৈত সত্তা ছিল, 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কবি বঙ্কিম শৈবলিনীর প্রবল হৃদয়াবেগকে স্বীকৃতি দিয়াছেন, কিন্তু আচার্য বঙ্কিমের দৃষ্টিতে শৈবলিনী পাপীয়সী, তিনি তাহাকে দিয়া কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করাইয়াছেন। অবশ্য, প্রতাপকর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা শৈবলিনীর নরক-দর্শন তাহার অন্তর্দ্বন্দ্বেরই প্রতিচ্ছবি মাত্র। তথাপি, লোক-শিক্ষক বঙ্কিমচন্দ্র যদি একটু সহানুভূতি ও মাত্রাবোধের পরিচয় দিতেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ চন্দ্রশেখরের আখ্যান-বস্তু কলা-কৌশলের দিক দিয়া অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করিত। অবশ্য, এই উপন্যাসেও শেষ পর্যন্ত শিল্পী বঙ্কিমই জয়ী হইয়াছেন। কেননা, শৈবলিনী যে দৈহিক সম্পর্কের দিক দিয়া সম্পূর্ণ নিরপরাধা, ইহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইলেও এবং চন্দ্রশেখর তাহাকে গ্রহণ করিলেও সে দাম্পত্য জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। আর বাস্তবিকপক্ষে এ শৈবলিনী যেন সে শৈবলিনী নয়, তাহারই প্রেতমূর্তি। তথাপি তাহাকে অভিশপ্ত জীবনের দুর্বহ ভার বহন করিতে হইয়াছে। এদিকে প্রতাপও তাহারই মঙ্গলের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবলীলাক্রমে আত্মদান করিয়াছে। এইভাবে চন্দ্রশেখরের ক্ষণিক আত্মবিস্মৃতি বা রূপজ মোহ তাহার নিজের এবং প্রতাপ ও শৈবলিনীর জীবনকে দগ্ধ মরুভূমিতে পরিণত করিয়া দিয়াছে।

'রজনী' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর মুখে রজনীর কাহিনী বর্ণনা করিয়া বাংলায় কথাসাহিত্য-রচনার এক নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। পরবর্ত্তী কালে রবীন্দ্রনাথ 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে এই ধারার অনুসরণ করিয়াছেন। লর্ড লিটনের প্রসিদ্ধ উপন্যাসের কাণা ফুলওয়ালী নিদিয়ার আদর্শে রজনীর চরিত্র পরিকল্পিত হইলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিস্তর। ফলতঃ রজনী একটি নূতন সৃষ্টি। রজনীর অন্তরের অনুভূতিকে বঙ্কিমচন্দ্র যেরূপ নৈপুণ্যের রহিত চিত্রিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কবি-দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। রজনীর জীবন অলক্ষ্য নিয়তির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, যদিও পরিণামে তাহার সকল দুঃখের অবসান ঘটিয়াছে এবং সে নিজের অবস্থাকে সহজে গ্রহণ করিয়াছে। লবঙ্গলতার চরিত্র-অঙ্কনে বঙ্কিমচন্দ্র নারী-হৃদয়ের গোপন প্রেমকে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দান করিয়াছেন, এখানে কোন সামাজিক সংস্কারের দ্বারা তাঁহার দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয় নাই। অবশ্য, অলৌকিকত্বের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের যে মোহ ছিল, উহা হইতে তিনি মুক্তি লাভ করিতে পারেন নাই। তথাপি যাহারা মনস্তত্ত্ব-আলোচনায় উৎসাহী, তাহাদের কাছে উপন্যাসটির একটি স্বতন্ত্র মূল্য আছে, আধুনিক মনস্তত্ত্বের কোন কোন বিষয়েও উপন্যাসখানি আলোকসম্পাত করিতে পারে।

কিন্তু বিপুল পাঠকসমাজের কাছে আজও রজনী অনেকখানি উপেক্ষিতা। তাহার কারণ প্রথমতঃ, বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে আখ্যানবর্ণনার যে রীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে ঘটনার ঐক্যসূত্র কতকটা শ্লথ এবং পাঠকের রস-বোধ ব্যাহত হইয়াছে, দ্বিতীয়তঃ, উপন্যাসের মধ্যে তত্ত্ব কিছু বেশী প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তৃতীয়তঃ, রজনীর উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত বিষয়টি গল্পের মধ্যে একটু বেশী স্থান জুড়িয়া কাহিনীর গতিকে কিছু মন্থর করিয়াছে। তথাপি

যাঁহারা মনোযোগের সঙ্গে উপন্যাসখানি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহার নির্মিতি-কৌশলের প্রশংসা না করিয়া পারিবেন না।

'কৃষ্ণকান্তের উইল' বাংলার কথাসাহিত্যে একটি নূতন যুগের সূচনা করিতেছে। লেখক এখানে কোন অতিপ্রাকৃত ঘটনার অবতারণা করেন নাই, কোন স্বপ্ন বা জ্যোতিষী গণনারও আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই, একেবারে খাঁটি সামাজিক উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। দুইটি প্রধান নারী-চরিত্রের মধ্য দিয়া তিনি এই কথাটি প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, নারীই সংসারে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের শক্তিভূতা। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে গ্রীক বা সেক্সপীয়রের নাটকের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়াছেন। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' ঘটনা-স্রোতের সঙ্গে সমান তালে ভাষাও ছুটিয়া চলিয়াছে নদীর স্রোতের মত, কোথাও উপল-খণ্ডের দ্বারা তাহার গতি প্রতিহত হইতেছে না। বঙ্কিমচন্দ্রের নির্মিতি-কৌশল এখানে 'বিষবৃক্ষ' হইতে স্বতন্ত্র। তাই 'বিষবৃক্ষের' বস্তু ও ঘটনা-সংস্থানের সঙ্গে 'কৃষ্ণকান্তের উইলের' কথাবস্তু ও ঘটনা-সন্নিবেশের পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। এক বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র পৃথিবীর অদ্বিতীয় নাট্যশিল্পী সেক্সপীয়রের সঙ্গে তুলনীয়। বঙ্কিমচন্দ্রে কখনও এক জাতীয় চরিত্র ছদ্মবেশ পরিয়া দুইবার আবির্ভূত হয় নাই; তাঁহার অঙ্কিত প্রত্যেকটি চরিত্র আপন স্বাতন্ত্র্যে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। নগেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দলাল, সূর্যমুখী ও ভ্রমর, কুন্দনন্দিনী ও রোহিণী সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতুতে গড়া। অথচ উভয় উপন্যাসের উদ্দেশ্যই ক্ষণস্থায়ী রূপজ তৃষ্ণার উপরে দাম্পত্য প্রেমের মহিমাকে প্রতিষ্ঠা করা।

'কৃষ্ণকান্তের উইলে' রোহিণীর চরিত্রের পরিণতির যে ছবি অঙ্কিত হইয়াছে, উহা লইয়া সমালোচকদের মধ্যে বাদ-বিতণ্ডার অন্ত নাই। শরৎচন্দ্রের মতে বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীর 'অকারণ, অহেতুক, জবরদস্তি অপমৃত্যুর' মধ্য দিয়া 'হিন্দুধর্মের সুনীতির আদর্শকেই'

প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন, তাই তাঁহার 'অকৃত্রিম, অকপট ভালবাসাকে' তিনি ধূলায় লুণ্ঠিত করিয়াছেন। অবশ্য শরৎচন্দ্র একটি বিশেষ ভাব-দৃষ্টি লইয়া বিষয়টির বিচার করিয়াছেন। কোন কোন সমালোচক শরৎচন্দ্রের এই মতের বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি উত্থাপন করিয়াছেন এবং সে সকল যুক্তিও একেবারে অগ্রাহ্য নহে। কিন্তু রোহিণীর অপমৃত্যুর মধ্য দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র নীতিকে সার্থক করিয়াছেন কিনা, উহা আমাদের প্রধান বিচার্য নয়, আমাদের বিচার্য, রোহিণীর জীবনে এই শোচনীয় পরিণতি ঘটনা-সংস্থানের মধ্য দিয়া অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে কিনা। বাস্তবিক রোহিণীর এই পরিণতি এমন আকস্মিক যে উহা পাঠকের রসানুভূতিকে পীড়িত না করিয়া পারে না। সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার শরৎচন্দ্রের উক্তির কঠোর সমালোচনা করিলেও একথা স্বীকার না করিয়া পারেন নাই যে, রোহিণীর অপমৃত্যু অত্যন্ত আকস্মিক হইয়াছে। এই আকস্মিকতা, এই অনিবার্যতার অভাবই সাহিত্য-বিচারে 'কৃষ্ণকান্তের উইলের' প্রধান ত্রুটি। 'বিষবৃক্ষে' কিন্তু এইরূপ কোন ত্রুটি লক্ষিত হয় না। 'বিষবৃক্ষ' বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম সামাজিক উপন্যাস, এই উপন্যাসের রচনাকালে তিনি গ্রীক বা ইংরেজি নাটকের প্রভাবকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। এইজন্য সেখানে প্রত্যেকটি চরিত্র ধীরে ধীরে অনিবার্য পরিণতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সুবোধ সেন মহাশয় বলেন,—'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের গোবিন্দলাল, ভ্রমর ও রোহিণীর ট্রাজিডির মধ্যে অনিবার্যতা নাই। অন্তত রোহিণীর সম্পর্কে এ একথাটি সত্য। রোহিণীর অপমৃত্যু ঘটাইতে হইবে, এই জন্যই যেন উপন্যাসের মধ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে নিশাকরের অবতারণা করা হইয়াছে এবং পাঠকের চমক ভাঙ্গিবার পূর্বেই রোহিণীর হত্যাকাণ্ড শেষ হইয়া গিয়াছে।

প্রাচীন সমালোচকদের বিচারে 'ভ্রমর' 'সূর্যমুখীর' মত আদর্শ হিন্দু নারী নহেন কিন্তু তাঁহার দুর্জয় অভিমান তাঁহার চরিত্রের চারিপার্শ্বে একটি মাধুর্য বিকীর্ণ করিতেছে। কিন্তু এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, তাহার এই অভিমানই আংশিকভাবে গোবিন্দলালের অধঃপতন এবং তাহার নিজের জীবনের শোচনীয় পরিণতির জন্য দায়ী।

'কৃষ্ণকান্তের উইলের' প্রথম সংস্করণে গোবিন্দলাল জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন, কিন্তু পরবর্তী সংস্করণে লেখক তাঁহাকে সন্ন্যাসী সাজাইয়াছেন। এখানেও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ট্র্যাজেডি হিসাবে অনেকখানি লঘু হইয়া গিয়াছে, রোহিণী ও ভ্রমরের শোচনীয় পরিণতিও পাঠকের মনে অত্যন্ত গভীরভাবে রেখাপাত করিতে পারে নাই। হয়ত লেখক বলিতে চাহিয়াছেন যে, গোবিন্দলালের সন্ন্যাসও একটা আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র কিন্তু সে কথা উপন্যাসে ঘটনাপুঞ্জের মধ্য দিয়া স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-সমূহের মধ্যে 'রাজসিংহ' আকারে বৃহত্তম। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, ইহা তাঁহার একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং হিন্দুগণের বাহুবল প্রতিপাদন করাই ইহার উদ্দেশ্য। এই উপন্যাস-রচনার মূল প্রেরণা ছিল স্বদেশ-প্রেম, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে। উপন্যাসের উপাদান-সংগ্রহের জন্য তিনি যে পাশ্চাত্ত্য লেখকদের উপর (টড্, অর্ম প্রভৃতি) নির্ভর করিয়াছেন, এ কথা তিনি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং যাঁহারা আধুনিক ঐতিহাসিক গবেষণার আলোকে রাজসিংহের বিচার করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। তথাপি এ কথা সত্য যে, স্কট প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য ঔপন্যাসিকগণ ঐতিহাসিক উপন্যাস-রচনায় যতখানি সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্র ততখানি সিদ্ধিলাভ করেন নাই। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-প্রতিভার বিশিষ্ট

প্রকৃতির সন্ধান পাইব। বঙ্কিমচন্দ্রের মূল কবি-প্রেরণা ছিল রোমান্টিক, তিনি ছিলেন প্রধানতঃ আদিরসের কবি, নারীর প্রলয়ঙ্করী শক্তি ও নারীর মহিমাকেই তিনি নূতন করিয়া আবিষ্কার করিয়াছিলেন। 'রাজসিংহে'ও দেখিতে পাই, সমস্ত ঐতিহাসিক বিপর্যয়ের কেন্দ্রে অবস্থান করিতেছেন রাজা বিক্রমশোলাঙ্কির কন্যা চঞ্চলকুমারী। আবার বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন স্বপ্ন-দ্রষ্টা, তিনি যে স্বদেশের মহিমময় অতীত ও গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, 'আনন্দমঠে' তাহার নিদর্শন আছে। কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করিতে হইলে যে বিশিষ্ট কল্পনা অপরিহার্য, যাহা স্কটের উপন্যাস ও সেক্সপীয়রের নাটকের প্রধান গুণ, বঙ্কিমচন্দ্রে সে কল্পনার প্রাচুর্য ছিল না। তথাপি 'রাজসিংহের' মধ্যে যে রণ-কোলাহল আমাদের শ্রুতি-গোচর হয়, তাহাতে নরনারীর হৃদয়-বীণায় প্রেমের যে ঝঙ্কার বাজিয়া উঠে, উহা ডুবিয়া যায় নাই। জেব্ উন্নিসা বাদশাহ-জাদী ও নীতিকুশলা হইলেও তাঁহার মধ্যে যে একটি চিরন্তনী নারী-প্রকৃতি ছিল, এ কথা লেখক আমাদিগকে বিস্মৃত হইতে দেন নাই। মবারকের মৃত্যুর পর জেব উন্নিসার দশা বর্ণনা করিতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র স্মরণ করিয়াছেন কালিদাসের রতিকে, যিনি হরকোপানলে মদন ভস্মী-ভূত হইবার পর—

'বসুধালিঙ্গনধূসরস্তনী
বিললাপ বিকীর্ণমূর্দ্ধজা'।

রাজসিংহের আর একটি বিশেষ গুণ ঘটনাপুঞ্জের বিরামবিহীন গতি। রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের এই গুণটির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

যে তিনটি ক্ষুদ্র উপন্যাসকে বঙ্কিমচন্দ্র আখ্যায়িকা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, উহাদের সাধারণ লক্ষণ—অপ্রত্যাশিতের

অভ্যাগম। বঙ্কিমচন্দ্র খাঁটি 'কমেডি' বড় একটা রচনা করেন নাই; কেননা, তিনি জীবনকে গভীর করিয়া দেখিয়াছেন এবং মানুষের জীবনে দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তির প্রভাবকে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু 'রাধারাণী' ও 'ইন্দিরায়' তিনি জীবনের লঘু, কৌতুকময় দিকটির প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছেন। 'চন্দ্রশেখরে' যেমন বাল্য-প্রণয়ের বিষাদময় পরিণতির চিত্র, তেমনই 'যুগলাঙ্গুরীয়ে' উহার সুখকর পরিণামের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। ইহা একটি 'রোমান্স-ধর্মী' উপন্যাসের ক্ষুদ্র সংস্করণ। 'রাধারাণী'তে কিন্তু যুগলাঙ্গুরীয়ের ন্যায় কলা কৌশলের নিদর্শন নাই। 'ইন্দিরায়' বঙ্কিমচন্দ্র এক নূতন রচনা-রীতির অনুসরণ করিয়াছেন। এখানে ইন্দিরা স্বয়ং সমস্ত কাহিনীর বক্তা। 'ইন্দিরার' কাহিনী যেমন লঘু, সরল ও কৌতুকময়, ইহার ভাষাও তেমনি ঝর্ণার মত উচ্ছল গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। 'ইন্দিরা ছোট ছিল, বড় হইয়াছে'। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় বাঙ্গালী পাঠক সমাজের কাছে তাহার দর বাড়ে নাই; 'ইন্দিরা' আজও আমাদের নিকট উপেক্ষিতাই রহিয়া গিয়াছে।

'আনন্দমঠে' বঙ্কিমচন্দ্র যে কবি-কল্পনা ও ঋষিদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন, গ্রন্থের আদ্যোপান্ত যে ভীম-গম্ভীর ও রহস্যময় পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছেন, উহা সত্যই বিস্ময়কর। সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের ছিন্ন পত্রকে অবলম্বন করিয়া তিনি একটি নূতন বেদ রচনা করিয়াছেন, প্রতীচীর স্বদেশ-প্রেমের আদর্শকে তিনি একটি যুগোপযোগী তান্ত্রিক ধর্মে রূপান্তরিত করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে 'পদচিহ্ন' গ্রামের কথা বলিয়াছেন, উহা কোন বিশেষ পল্লী নয়, উহা সে যুগের হৃতগৌরব, হৃতসর্বস্ব বঙ্গভূমি। 'আনন্দমঠে' বঙ্কিমচন্দ্র যে তান্ত্রিক ধর্মের প্রচার করিয়াছেন, উহাতে জ্ঞান, প্রেম ও শক্তির ত্রিধারা মিলিত হইয়াছে। সন্তান-সম্প্রদায় সম্যকভাবে

এই ধর্ম আচরণ করিতে পারে নাই। তাঁহারা দেশমাতৃকাকে ভক্তিভরে উপাসনা করিলেও তাঁহাদের ভক্তি জ্ঞানমিশ্রা নহে। ভক্তি যতদিন জ্ঞানমিশ্রা না হয়, ততদিন মানুষের ব্রতভঙ্গ হইবার আশঙ্কা থাকে। ক্ষণিক হৃদয়ের আবেগে তাঁহার জীবনের সঙ্কল্প একেবারেই ভাসিয়া যাইতে পারে। তাই দেখিতে পাই, ভবানন্দ বা জীবানন্দ 'যৌবন-জলতরঙ্গ' রোধ করিতে পারেন নাই। অন্যদিক হইতে দেখিতে গেলে এ কথা বলিতে হয় যে, বঙ্কিমচন্দ্র নর-নারীর হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে কোন অবস্থায়ই অস্বীকার করেন নাই।

'আনন্দমঠে' চরিত্রসৃষ্টির বৈচিত্র্যের অবকাশ স্বল্প হইলেও ভবানন্দ, জীবানন্দ, শান্তি, কল্যাণী প্রভৃতি চরিত্রগুলি স্থানে স্থানে আপন মহিমায় ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। 'আনন্দমঠেই' বঙ্কিমচন্দ্র সর্বপ্রথম নারীকে স্বদেশ-সেবার বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে আনয়ন করিয়াছেন। 'আনন্দমঠের' ন্যায় 'দেবী চৌধুরাণী' এবং 'সীতারামেও' বঙ্কিমচন্দ্র শুধু নারীর কল্যাণী মূর্তিরই প্রতিষ্ঠা করেন নাই, তাঁহার স্বপ্নে উদ্ভাসিত হইয়াছে নারীর এক অপূর্ব মহিমময়ী মূর্তি। এ মূর্তি ভারতীয় সাহিত্যে নাই, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যেও নাই, ইঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের মানসী প্রতিমা।

'আনন্দমঠে' বঙ্কিমচন্দ্র শিল্পী ও প্রচারক, রসস্রষ্টা কবি ও মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি কিন্তু সম্যক ভাবে ইহার রস-আস্বাদন ও তাৎপর্য-গ্রহণ করিতে হইলে চাই ইষ্টনিষ্ঠা ও মনের সংস্কারমুক্তি। 'আনন্দমঠে' মহাপুরুষ যে তত্ত্বটি আমাদিগকে শিখাইয়াছেন, আমরা তাহা শিখি নাই। সে তত্ত্বটি এই—বিদ্যাবিজ্ঞানদায়িনী বাণীর উপাসনা যেখানে দেশ.সবার অঙ্গীভূত নয়, সেখানে দেশমাতৃকার উপাসনা সম্যক সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। 'তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা সনাতন হিন্দুধর্ম নহে, সে একটা লৌকিক অপকৃষ্ট ধর্মমাত্র', 'প্রকৃত হিন্দুধর্ম

জ্ঞানাত্মক'। বাস্তবিক, যেদিন জ্ঞান, প্রেম ও শক্তির ত্রিবেণীসঙ্গমে স্নান করিয়া আমরা ধন্য হইব, সেদিনই 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের রহস্য আমাদের নিকট সম্যক প্রকাশিত হইবে।

'দেবী চৌধুরাণী'তে বঙ্কিমচন্দ্র নারীকে সংসারের ক্ষুদ্র পরিবেশের বাহিরে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে স্থাপন করিয়াছেন সত্য কিন্তু সেখানে তাঁহার জীবন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সংসার-ধর্ম পালনের জন্য প্রস্তুতি মাত্র। নিষ্কাম ধর্মের আদর্শ প্রচার এই উপন্যাস-রচনার প্রধান উদ্দেশ্য কিন্তু দেবী চৌধুরাণীর জীবনে ভবানী পাঠকের শিক্ষার উপরে নারী-প্রকৃতিই জয়লাভ কবিরাছে। গ্রন্থের উপসংহারে বঙ্কিমচন্দ্র গীতার যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা কলাকৌশলের দিক দিয়া অত্যন্ত অসঙ্গত। গ্রন্থমধ্যে একমাত্র ভবানী পাঠকই নিষ্কাম ধর্মে দীক্ষিত কিন্তু তাঁহার দস্যুতা প্রভৃতি কর্ম লেখকের সমর্থন লাভ করে নাই।

কিন্তু সেকালের পারিবারিক ও সামাজিক চিত্র হিসাবে দেবী চৌধুরাণী বিশেষ উৎকর্ষের দাবী করিতে পারে। এই উপন্যাসের সাগরবৌ ও নয়ানবৌ, হরবল্লভ ও ব্রজেশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিটি ক্ষুদ্র চরিত্র পর্যন্ত অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে অঙ্কিত হইয়াছে। পল্লীর বাস্তব চিত্র অঙ্কনেও লেখকের অসাধারণ পর্যবেক্ষণ-শক্তি ও গভীর সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। দেবী চৌধুরাণীর আখ্যান-বস্তুর পরিকল্পনায় কিছু অসঙ্গতি থাকিলেও মোটের উপর এখানেও শিল্পী বঙ্কিম প্রচারক বঙ্কিমের উপর জয়লাভ করিয়াছেন।

একজন মনস্বী সমালোচক বলিয়াছেন—দেবী চৌধুরাণীতে বঙ্কিম চন্দ্র নিষ্কাম ধর্মের আদর্শকে অন্বয়মুখে ও সীতারামে ব্যতিরেকমুখে স্থাপন করিয়াছেন। বাস্তবিক, মানুষ নিষ্কাম ধর্মের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইলে, বিষয়ের ধ্যানে মানুষের বুদ্ধি মোহগ্রস্ত হইলে সে কেমন করিয়া ধীরে ধীরে অবনতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে, কেমন

করিয়া তাহার সাহস, মহত্ত্ব, ঔদার্য ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইতে থাকে, 'সীতারাম' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র তাহারই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। উপন্যাসখানিতে ধর্মপ্রবক্তা বঙ্কিম ও শিল্পী বঙ্কিমের মধ্যে পরিণয়-বন্ধন ঘটিয়াছে। সীতারাম উপন্যাসে কল্পনার বিশালতা, আখ্যান-বস্তুর জটিলতা, চরিত্র-সৃষ্টির বৈচিত্র্য ও ক্ষুদ্র চরিত্রাঙ্কনে নৈপুণ্য আছে, সর্বোপরি, ইহাতে ট্রাজিডির মূল সূত্র নিয়তিবাদ অনুস্যূত রহিয়াছে। আবার এই উপন্যাসে যুগপৎ যে হিন্দুপ্রীতি ও উদার অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় আছে, তাহাতে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বৈত রূপ দেখিতে পাই। উপন্যাসের মধ্যে চন্দ্রচূড় ও চাঁদশাহ ফকীর বিশেষভাবে আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মত লেখক মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণে কালক্ষেপ না করিয়া পাঠকের কল্পনা-শক্তির উপর নির্ভর করিয়াছেন এবং আখ্যায়িকার নাটকীয় গতিকে কখনো শ্লথ হইতে দেন নাই। জয়ন্তীর সাহচর্যে শ্রীর জীবনে যে পরিবর্তন আসিয়াছিল অথচ যে পরিবর্তনের উপরেও তাহার নারীপ্রকৃতি জয়ী হইয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্র উহার কারণ নির্দেশ করিবার জন্য মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হন নাই। জয়ন্তীর জীবনের পূর্বকাহিনীর অবতারণা করিয়া তিনি উপন্যাসের আয়তন-বৃদ্ধি করেন নাই বা তাঁহার চরিত্রের দুর্বোধ্যতা ও রহস্যময়তার আবরণ উন্মোচন করেন নাই। এই সকল ব্যাপারে তাঁহার উচ্চাঙ্গের কলা-কৌশলেরই পরিচয় পাওয়া যায়। গঙ্গারামের পরস্ত্রীতে আসক্তি এবং সীতারামের স্বীয় স্ত্রীর প্রতি আসক্তি—এই ট্রাজিডির মূল বিষয়-বস্তু। কিন্তু সীতারামের অধঃপতনের কাহিনী (কোন প্রসিদ্ধ সমালোচকের মতে ম্যাকবেথের অধঃপতনের কাহিনীর মতই) আমাদের অন্তরকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। আমরা ভাবি, সীতারামের এই অধঃপতনের জন্য দায়ী কে? আমাদের মনে হয়, দায়ী সীতারাম স্বয়ং এবং দায়ী অঘটনঘটনপটীয়সী নিয়তি।

বাস্তবিক, সীতারামের জীবনের শোচনীয় পরিণতি একই সঙ্গে Tragedy of Fate এবং Tragedy of Character.

বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাসেও তাঁহার সৃষ্টিশক্তি ম্লান হয় নাই, এখানেও তাঁহার বুদ্ধি নব-নব-উন্মেষশালিনী।

উপন্যাস-সাহিত্য বঙ্কিম-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হইলেও বাংলা গদ্য-সাহিত্যের এমন বিভাগ অতি অল্পই আছে যাহা তাঁহার মনীষার দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠে নাই। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—'নির্মল, শুভ্র, সংযত হাস্য বঙ্কিমই প্রথম বাংলা সাহিত্যে আনয়ন করেন'। এই হাস্যরসের পরিচয় আছে 'কমলাকান্তের দপ্তরে,' 'লোকরহস্যে,' 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিতে'; —এমনকি, বঙ্কিমচন্দ্রের গুরুগম্ভীর প্রবন্ধও স্থানে স্থানে হাস্যরসের শুভ্র কিরণ-সম্পাতে দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে। তিনি বাঙ্গালী জাতিকে অতীত ইতিহাসের আলোচনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন, সর্বাঙ্গসুন্দর মাসিক পত্রের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, বাংলার প্রবন্ধ-সাহিত্য ও সমালোচনা-সাহিত্যকে সম্পন্ন করিয়াছেন, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিবার সরস ভঙ্গীর প্রবর্তন করিয়াছেন। সর্বোপরি, দার্শনিক ও ধর্মপ্রবক্তা বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের জাতীয় জীবনে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন।

বঙ্কিম-দর্শনের মূলসূত্র

আনন্দমঠের উৎসর্গ-পত্রে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—'স্বর্গে মর্তে সম্বন্ধ আছে।' এই কথাটির মধ্যেই বঙ্কিম-দর্শনের মূলসূত্র বীজরূপে নিহিত রহিয়াছে। বনস্পতির মূল ভূগর্ভে প্রোথিত থাকিলেও আকাশ হইতে যে জলধারা পৃথিবীতে পতিত হয়, উহা পান করিয়াই সে পরিপুষ্ট হয়, আর ঊর্ধ্বে আকাশের পানে আপনার শাখা-প্রশাখাকে বিস্তার করে। বনস্পতি তাহার বিশাল দেহে স্বর্গ ও মর্তকে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত করে। পৃথিবীর মানুষও

তেমনি আপনার সহস্র সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা লইয়া তাহার জৈবধর্মের পরিতৃপ্তি-সাধনে রত হয়, খণ্ডিত দেশকালের মধ্যেই তাহাকে আপনার সমাজধর্ম ও যুগধর্মকে পালন করিতে হয়,—তাই তাহার ব্যষ্টি-বিশ্ব নিজের মধ্যে, পরিবারের মধ্যে, স্বদেশের মধ্যে এবং স্বজাতির মধ্যে আপনাকে ব্যাপ্ত করে; কিন্তু কেবল অজস্র কর্মের মধ্য দিয়াই মানুষের জীবন সার্থকতা লাভ করে না, তাহার সমস্ত কর্ম যখন ঈশ্বরমুখীনতা প্রাপ্ত হয়, মানুষ যখন ঈশ্বরে পরানুরক্তি লাভ করে, তখনই সে পরিপূর্ণ মানবতার ধর্মে দীক্ষিত হয়।

দর্শনে কর্মযোগী

সাহিত্যে যেমন বিদ্যাসাগরী ও আলালি ভাষাকে বর্জন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র এক মধ্যপন্থার অনুসরণ করিয়াছিলেন,—জীবনেও তেমনি অবিমিশ্র স্বাজাত্যের ঔদ্ধত্য ও পাশ্চাত্ত্যের অন্ধ অনুকরণকে বর্জন করিয়া যুক্তির আলোকসম্পাতে এক অভিনব পন্থার আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

আবার, পাশ্চাত্ত্যের নীরস যুক্তিবাদ ও বাঙ্গালীসুলভ ভাবপ্রবণতা, উভয়কে পরিহার করিয়া তিনি প্রাচী ও প্রতীচীর চিন্তাধারায় যাহা কিছু গৌরবময়, তাহা হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া এক অপূর্ব মধুচক্র নির্মাণ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-প্রতিভা যেমন সৃজনধর্মী, দার্শনিক প্রতিভা তেমনি সচল ও সক্রিয়,—সুস্থ ও বলিষ্ঠ মনের পরিচায়ক। মতবাদ ভারাক্রান্ত দর্শনের রাজ্যে তিনি যে কোন নূতন মত প্রচার করেন নাই, তাহার কারণ ইহা নহে যে, কোন নূতন মত-প্রচারের মত মনীষা তাঁহার ছিল না, তাহার কারণ এই যে, জীবনের সঙ্গে যে মতবাদের অবিচ্ছেদ্য যোগ নাই, তাহাতে তাঁহার বিশ্বাস ছিল না;—জাতিকে মানুষ করিবার যে দুর্জয় সাধনা তিনি করিয়াছিলেন, তাহারই

অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ তাঁহার সাহিত্যিক-প্রতিভার ন্যায় দার্শনিক-প্রতিভাও স্ফূর্তি পাইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রকে সাহিত্যে কর্মযোগী বলা হইয়া থাকে, আমরা বলিব, আধুনিক যুগে বঙ্কিমচন্দ্র দর্শনেও কর্মযোগী ছিলেন।

ত্রিবেণী-সঙ্গম

বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানতঃ যুক্তিবাদী ছিলেন, এবং ধর্মব্যাখ্যায়ও স্বাধীন চিন্তার পক্ষপাতী ছিলেন। প্রথম বয়সে যে যুক্তিবাদ তাঁহার মধ্যে নাস্তিক্য-বুদ্ধির উদ্রেক করিয়াছিল, উহাই পরিণত বয়সে হিন্দুধর্মের অভিনব ব্যাখ্যায় তাঁহাকে নিয়োজিত করিয়াছিল। সেই যুক্তিবাদ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষার অবশ্যম্ভাবী ফল এবং তাঁহার অনন্যসাধারণ মনীষার অপূর্ব নিদর্শন। মানুষ অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী হইলেও পরিবেশের প্রভাব ও বংশানুক্রমকে একেবারে অতিক্রম করিতে পারে না, কিন্তু এ ক্ষেত্রেও বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে যে মণিকাঞ্চন-সংযোগ ঘটিয়াছিল, তাহা অতি অল্প লোকের জীবনেই দেখা যায়। উত্তরাধিকারসূত্রে বঙ্কিমচন্দ্র লাভ করিয়াছিলেন—ভারতের অতীত সাধনা ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা আর প্রতীচীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণের সঙ্গে পরিচিতি তাঁহাকে করিয়াছিল কঠোর যুক্তিবাদী। যে মহাপুরুষ দেবীচৌধুরাণীর উৎসর্গ-পত্রের লক্ষ্যস্থল, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে কতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন,—বঙ্কিমের পরিণত বয়সের রচনাবলীই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। এরূপ উত্তরাধিকার কয়জনের ভাগ্যেই বা ঘটে? আর শ্রদ্ধার সহিত মনীষার এরূপ অপূর্ব সমন্বয়—কয়জনের জীবনেই বা দেখা যায়? শ্রদ্ধা ও মনীষার দুই ধারা মিলিত হইয়া যে গঙ্গাযমুনার সৃষ্টি হইয়াছিল, স্বদেশ-প্রীতিরূপ সরস্বতীও তাহার সহিত মিলিত হইয়া অপূর্ব ত্রিবেণীসঙ্গম রচনা করিয়াছিল,—তাহাতে স্নান করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ধন্য হইয়াছিলেন।

ধর্মের অর্থগৌরব

যে ভিত্তিভূমির উপর বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মের মনোরম হর্ম্য রচনা করিয়াছিলেন—উহা সম্পূর্ণ ভারতীয়; উহার নাম ভক্তিধর্ম বা ভাগবতধর্ম। ইহার উপর তিনি ইউরোপীয় আদর্শকে স্থাপন করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন ;—সমস্ত বৃত্তির সুসমঞ্জস অনুশীলন ধর্মের দেহ, আর ভগবদ্‌ভক্তি ইহার আত্মা। তাঁহার এই অভিনব ধর্ম-ব্যাখ্যায় স্বদেশ-প্রেমের সহিত বিশ্বমৈত্রী, মানব-প্রেমের সহিত পশুপ্রীতি, নিষ্কাম কর্মের সহিত বেন্থাম ও মিলের হিতবাদ, ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত একদিকে পাশ্চাত্ত্যের লৌকিক বিজ্ঞান ও অপরদিকে ভক্তিধর্ম, সকল বিরোধ পরিত্যাগ করিয়া এক সঙ্গে মিলিত হইয়াছে ;—এখানে মহর্ষি শাণ্ডিল্য, দেবর্ষি নারদ, এমনকি, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে স্পিনোজা, ফিক্তে, কোম্‌তে, জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল, মেথিউ আরনল্ড, গেটে, হার্বার্ট স্পেন্সার, সীলী প্রভৃতি পরম সখ্য স্থাপন করিয়াছেন। দেবীচৌধুরাণীর গুরু ভবানী পাঠক দেবী চৌধুরাণীকে এই অনুশীলন-তত্ত্বে বা পরিপূর্ণ মানবতার ধর্মে দীক্ষাদান করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুর সমস্ত শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া দেখাইয়াছেন,—একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণেই এই অনুশীলনের আদর্শ সমগ্রতা ও পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এইজন্য, অনেকে 'শ্রীকৃষ্ণচরিত্র'কে অনুশীলন-তত্ত্বের ভাষ্য বলিয়া মনে করেন। এইখানেই আমরা তাঁহার বিরাট মনীষা ও প্রতিভার মৌলিকতার পরিচয় পাই।

যুক্তিহীন বিচারে ধর্মহানি

পাশ্চাত্ত্য দর্শনের যুক্তিবাদের আলোক-সম্পাতে বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশীয় শাস্ত্র ও সাহিত্যের আলোচনা করিয়াছিলেন। যুক্তিবাদী

বঙ্কিমচন্দ্র সে যুগে নব্য হিন্দুধর্মে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। প্রতিমা-পূজা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র—

'চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা' ॥

এই প্রচলিত মতকে অবলম্বন করিলেও তাঁহার কবিদৃষ্টিতে প্রতীকোপাসনার আর একটি তাৎপর্য উদ্ভাসিত হইয়াছিল। সার্থকনামা পুরুষ হেষ্টির সহিত মসীযুদ্ধে প্রবৃত্ত বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন—

'প্রতিমা জিনিষটি শিশুর ক্রীড়নক নহে। মানুষের কবি-প্রেরণা ও শিল্প-প্রেরণা সহজাত। তাহার মনে আদর্শ সৌন্দর্যের প্রতি, আদর্শ পবিত্রতার প্রতি, আদর্শ শক্তির প্রতি দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে। এই আকাঙ্ক্ষাই যুগে যুগে স্থাপত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতি চারুকলার মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। ভগবদাদর্শও তেমনি একটা প্রত্যক্ষ আকারের মধ্য দিয়া ব্যক্ত হইতে চায়। সাধকের ধ্যান-নেত্রে ঐ আদর্শ যে আকার পরিগ্রহ করে, প্রতিমার মধ্য দিয়া তাহারই অভিব্যক্তি হয়।'

প্রতিমা-পূজার এই ব্যাখ্যায় আমরা কবি বঙ্কিম ও যুক্তিবাদী বঙ্কিমকে একই সঙ্গে দেখিতে পাই। যুক্তিবাদের প্রাবল্যহেতুই বঙ্কিমচন্দ্র রাধাকৃষ্ণ ও হরগৌরীর উপাসনাকে রূপক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, হিন্দুর অনেক আচার যে অর্থশূন্য ও প্রাণহীন, একথা স্পষ্ট ভাষায় প্রচার করিয়াছেন। ধর্মতত্ত্বে নব্য হিন্দুধর্মের প্রচারক তীব্র ভাষায় বলিতেছেন—'হিন্দুধর্ম মানি, হিন্দুধর্মের 'বকামি'গুলা মানি না'। 'গৌরদাস বাবাজীর ভিক্ষার ঝুলি', 'ত্রিদেবসম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র কি বলে' প্রভৃতি প্রবন্ধে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের অপূর্ব যুক্তি-জাল-বিস্তারের কৌশল দেখিতে পাই। 'গৌরদাস বাবাজীর ভিক্ষার ঝুলি'তে তিনি বিষ্ণুলীলার

রূপক ব্যাখ্যা করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা স্বীকার করিয়াছেন। ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদও বঙ্কিমচন্দ্রের মনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই ক্রমোন্নতিবাদের আলোকেই তিনি হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'ধর্মতত্ত্বে' বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন ঃ

'আমাদের সর্বাঙ্গসম্পন্ন হিন্দুধর্মের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব যে, ইহার যত পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা কেবল ইহাকে সর্বাঙ্গসম্পন্ন করিবার চেষ্টার ফল। ইহার প্রথমাবস্থা ঋগ্বেদসংহিতার ধর্ম আলোচনায় জানা যায়। যাহা শক্তিমান বা সুন্দর তাহার উপাসনা, এই আদিম বৈদিক ধর্ম। তাহাতে আনন্দভাগ যথেষ্ট ছিল, কিন্তু সতের ও চিতের উপাসনার অর্থাৎ জ্ঞান ও ধ্যানের অভাব ছিল। এইজন্য কালে তাহা উপনিষদ্ সকলের দ্বারা সংশোধিত হইল। উপনিষদের ধর্ম চিন্ময় পরব্রহ্মের উপাসনা। তাহাতে জ্ঞানের ও ধ্যানের অভাব নাই, কিন্তু আনন্দাংশের অভাব আছে। ব্রহ্মানন্দপ্রাপ্তিই উপনিষদ্ সকলের উদ্দেশ্য বটে কিন্তু চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিসকলের অনুশীলন ও স্ফূর্তির পক্ষে সেই জ্ঞান ও ধ্যানময় ধর্মে কোনও ব্যবস্থা নাই। বৌদ্ধধর্মে উপাসনা নাই। বৌদ্ধেরা সৎ মানিতেন না, এবং তাঁহাদের ধর্মে আনন্দ ছিল না। এই তিন ধর্মের একটিও সচ্চিদানন্দপ্রয়াসী হিন্দুজাতির মধ্যে অধিক দিন স্থায়ী হইল না। এই তিন ধর্মের সার ভাগ গ্রহণ করিয়া পৌরাণিক হিন্দুধর্ম সংগঠিত হইল। তাহাতে সতের উপাসনা, চিতের উপাসনা এবং আনন্দের উপাসনা প্রচুর পরিমাণে আছে। ইহাই জাতীয় ধর্ম হইবার উপযুক্ত'।

আমরা দেখিতেছি, নব্য হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যাতে বঙ্কিমচন্দ্র সর্বত্রই প্রখর যুক্তির আশ্রয় লইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যাহাকে 'জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃত ভক্তি' বলেন, বঙ্কিম-দর্শনে তাহার কোন স্থান

নাই। 'ভক্তি ভিন্ন মনুষ্যত্ব নাই', এ কথা স্পষ্টতঃ প্রচার করিলেও তিনি বৈষ্ণবীয় রস-তত্ত্বে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারেন নাই।

ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্ম

অদ্বৈত বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্মকে বঙ্কিমচন্দ্র কখনও যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠাপিত করিতে চেষ্টা করেন নাই। রাজা রামমোহন অধিকারভেদে সাধনার তিনটি স্তর স্বীকার করিয়াছেন:— (১) নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা, (২) সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা, ও (৩) প্রতীকোপাসনা। আচার্য স্বামী বিবেকানন্দও সাধকের পক্ষে দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, ও অদ্বৈতবাদ এই তিনটি ক্রমিক স্তর স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্কিম-দর্শনে নির্গুণ ব্রহ্মের কোন স্থান নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ঈশ্বর 'infinite in the infinity of his infinite attributes'। খ্রীষ্টীয় Theism ও কেশবচন্দ্র-প্রচারিত ব্রাহ্মধর্মের প্রভাবকে সম্ভবতঃ বঙ্কিমচন্দ্র একেবারে অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

অবতার-বাদ

বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা প্রতিপন্ন করিলেও স্বয়ং অবতারবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। ঈশ্বর যে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব, একথা তিনি 'শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে' যুক্তির সাহায্যে স্থাপন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে রাজা রামমোহনের আলোচনা একদেশদর্শী; উহা স্বপক্ষস্থাপনাহীন কথাবিশেষ মাত্র। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রে যুক্তির সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণকে প্রতিষ্ঠা করিবার প্রথম প্রচেষ্টা দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায়ের 'শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্ম' ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ধারাবাহিক ভাবে 'ধর্মতত্ত্বে' মুদ্রিত হইতে থাকে। ইহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে। বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র (১ম ভাগ)

প্রকাশিত হয় ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে। যাঁহারা অবতার-বাদের ধার ধারেন না, তাঁহাদের জন্যই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ মনুষ্যরূপে দাঁড় করাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অবতার-বাদ-স্থাপনের চেষ্টায়ও তিনি প্রতীচীর প্রভাব হইতে একেবারে মুক্ত হইতে পারেন নাই।

শ্রীকৃষ্ণ-কথিত ধর্ম

এক বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্ত্যের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। ভালমন্দ বা পাপপুণ্যের আদর্শ যে শাশ্বত নয়, বঙ্কিমচন্দ্র ইহা বিশ্বাস করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে যথার্থ ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি 'কখনও মিথ্যা বলেন না, তবে যেখানে লোকহিতার্থে মিথ্যা প্রয়োজনীয় অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেইখানে কৃষ্ণোক্তি স্মরণপূর্বক মিথ্যা কহেন'। হিন্দুধর্মের মতে পুণ্য বা শুভ কর্ম জীবনের আদর্শ নহে, পাপপুণ্য বা শুভাশুভকে অতিক্রম করাই জীবনের আদর্শ (transvaluation of all values)। সুতরাং সত্য যেখানে শিবের সঙ্গে মিলিত হয়, সেখানে উহা আমাদিগকে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাইয়া দেয় কিন্তু যখন উহা শিবেতরের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন উহা আমাদিগকে কেবলই দিগ্‌ভ্রান্ত করে।

পাশ্চাত্ত্যের মতবাদকে জাতীয় প্রকৃতির অনুকূল করিবার জন্য মনের যে সক্রিয়তার প্রয়োজন, বঙ্কিম-প্রতিভায় তাহার প্রাচুর্য ছিল। তাই, তাঁহার ধর্ম-ব্যাখ্যায় প্রাচী ও প্রতীচীর এমন অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল।

দ্বৈত উপাসনা

বঙ্কিমচন্দ্র শাশ্বত দেবতার ন্যায় যুগ-দেবতার নিকটও মস্তক নত করিয়াছিলেন। তিনি এই মহা সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, শাশ্বত দেবতা নিত্য ও অপরিবর্তনীয় হইলেও যুগ-দেবতা

বিভিন্ন রূপে আবির্ভূত হইয়া মানবের কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন। যে এই যুগ-ধর্মের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার না করিয়া পশ্চাতে পড়িয়া থাকে, যুগ-দেবতার রথচক্রতলে সে পিষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু এই শাশ্বত দেবতার ধর্মের সঙ্গে যুগ-ধর্মের প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধ নাই। বিশ্ব-মৈত্রী শাশ্বত দেবতার ধর্ম, স্বদেশপ্রীতি ও স্বাজাত্যবোধ যুগ-ধর্ম,—যখন আমাদের স্বদেশ-প্রেমে পরপীড়ন থাকে না, যখন আমাদের স্বাজাত্যাভিমান সঙ্কীর্ণ 'পেট্রিয়টিজমে' পরিণত হয় না, তখনই যুগপৎ এই উভয় দেবতার উপাসনা করা হয়। শাশ্বত দেবতা আমাদিগকে ব্রহ্ম-বিদ্যার আলোচনায় নিমগ্ন থাকিতে আদেশ দেন, আর যুগ-দেবতা আমাদিগকে লৌকিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করিতে, দেশের স্বাধীনতা অর্জন করিতে এবং দেশকে সর্বতোভাবে শ্রীসম্পন্ন করিতে আদেশ দেন। যখন আমরা ব্রহ্ম-বিদ্যাকে জীবনের চরম লক্ষ্য জানিয়াও বহির্বিষয়ক জ্ঞানে উদাসীন না হই, আত্মার স্বাধীনতাকে পরম কাম্য বলিয়া জানিয়াও দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রতি উপেক্ষা-প্রদর্শন না করি, তখনই এই উভয় দেবতার উপাসনা করা হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে উভয় দেবতার উপাসনাই আছে।

বঙ্কিমচন্দ্র এই যুগধর্মের স্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ভাগবত ধর্মকে পর্যন্ত অপূর্ণ বলিতে সাহসী হইয়াছিলেন। এইখানে আমরা বিদ্রোহী বঙ্কিমের এক রূপ দেখিতে পাই। সত্যানন্দ ও মহেন্দ্র সিংহের কথোপকথন শুনুন ঃ—

"সত্য। দীক্ষিত না হইলে তুমি সম্প্রদায়ের কোন গুরুতর কার্যে অধিকারী হইবে না।

মহেন্দ্র। দীক্ষা কি? দীক্ষিত হইতে হইবে কেন? আমি ত' ইতিপূর্বেই মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছি।

সত্য। সে মন্ত্র ত্যাগ করিতে হইবে। আমার নিকট পুনর্বার লইতে হইবে।

মহেন্দ্র। মন্ত্র ত্যাগ করিব কি প্রকারে?

সত্য। আমি সে পদ্ধতি বলিয়া দিতেছি।

মহেন্দ্র। নূতন মন্ত্র লইতে হইবে কেন?

সত্য। সন্তানেরা বৈষ্ণব।

মহেন্দ্র। ইহা বুঝিতে পারি না। সন্তানেরা বৈষ্ণব কেন? বৈষ্ণবের অহিংসাই পরম ধর্ম।

সত্য। সে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব। নাস্তিক বৌদ্ধধর্মের অনুকরণে যে প্রাকৃত বৈষ্ণবতা উৎপন্ন হইয়াছিল, এ তাহারই লক্ষণ। প্রকৃত বৈষ্ণবধর্মের লক্ষণ,—দুষ্টের দমন, ধরিত্রীর উদ্ধার। কেননা, বিষ্ণুই সংসারের পালনকর্তা। দশবার শরীরধারণ করিয়া পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছেন। কেশী, হিরণ্যকশিপু, মধুকৈটভ, মুর, নরক প্রভৃতি দৈত্যগণকে, রাবণাদি রাক্ষসগণকে, কংস, শিশুপাল প্রভৃতি রাজগণকে তিনিই যুদ্ধে ধ্বংস করিয়াছিলেন। তিনিই জেতা, জয়দাতা, পৃথিবীর উদ্ধারকর্তা, আর সন্তানের ইষ্টদেবতা। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম নহে—উহা অর্ধেক ধর্মমাত্র। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু প্রেমময় - কিন্তু ভগবান কেবল প্রেমময় নহেন—তিনি অনন্ত শক্তিময়। আমরা উভয়েই বৈষ্ণব—কিন্তু উভয়েই অর্ধেক বৈষ্ণব।"

('আনন্দমঠ', দ্বিতীয় খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ)

বাস্তবিক পক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে সে যুগের বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারা, সে যুগের আশা-আকাঙ্ক্ষা সংহত ও কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল, তাই তাঁহাকে আমরা 'যুগ-মানব' আখ্যা দিতে পারি। দেশমাতৃকার উপাসনাই আমাদের যুগধর্ম, আর এই ধর্মের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি—বঙ্কিমচন্দ্র

কৃষ্ণচরিত্রের জন্মকথা

শিশু বঙ্কিমচন্দ্র প্রাণ ভরিয়া মাকে দেখিলেন। মা কি ছিলেন, কি হইয়াছেন, তাহা দেখিলেন,—মা কি হইবেন, তাহাও তাঁহার দিব্যদৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হইল। বঙ্কিমচন্দ্র মাকে চিনিবার ও চিনাইবার চেষ্টায় তাঁহার অনন্যসাধারণী প্রতিভাকে নিযুক্ত করিলেন। তিনি বুঝিলেন—বাঙ্গালীর প্রতিভা ও মনীষার এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে, যাহাতে সে নিখিল ভারতের সঙ্গে যুক্ত হইয়াও আপনার স্বাতন্ত্র্যকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। সহজিয়া বাউলের মানবধর্মে দীক্ষিত এই বাঙ্গলা, 'বারভূঞা' নামে খ্যাত হিন্দু ও মুসলমান জমিদারগণের অতুল শৌর্য ও বিক্রমের পাদপীঠ এই বাঙ্গলা—জীমূতবাহন ও রঘুনন্দনের অপূর্ব মনীষার প্রসূতি এই বাঙ্গলা, কুশাগ্রধী রঘুনাথ শিরোমণির প্রখর মনীষার দীপ্তিতে উদ্ভাসিত এই বাঙ্গলা, সাধক-শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ও পূর্ণানন্দ গিরি, রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের পাদরজঃপূত এই বাঙ্গলা, বৈষ্ণবপ্রেমগাথা-মুখরিত এই বাঙ্গলা, কান্তভাবাশ্রিত রাধাপ্রেমের জীবন্ত বিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার লীলা-সহচরগণের আবির্ভাবে ধন্য এই বাঙ্গলা—অথচ আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালী বাংলাকে চিনিল না। বঙ্কিমের হৃদয় হইতে ক্রন্দনধ্বনি জাগিয়া উঠিল—'কোথা মা কমলাকান্তপ্রসূতি জন্মভূমি' ? আচার্য ভূদেবের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রও বলিয়া উঠিলেন—

'কপিলদেবপ্রিয়া ন্যায়শাস্ত্রপ্রসূতি তন্ত্রশাস্ত্রজননী বঙ্গমাতা আর কতকাল আত্মবিস্মৃতা হইয়া নীচানুকরণরতা থাকিবেন ?' (পুষ্পাঞ্জলি, একাদশ অধ্যায়)।

অষ্টাদশ শতাব্দীতেই বাঙ্গালীর আত্মবিস্মৃতি আরম্ভ হয়। ভীরু, কাপুরুষ, দুর্বল, মিথ্যাচারী কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার এই যুগের রাজা, *

* অবশ্য, স্বধর্মনিষ্ঠ, বিদ্যোৎসাহী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যে একেবারে গুণহীন ছিলেন ইহা বলা আমাদের অভিপ্রায় নহে।

বিদ্যাসুন্দরের হীনচরিত্র, ভীরুশ্রেষ্ঠ নায়ক এই যুগের বাঙ্গালীর আদর্শ। জাতির মধ্যে যে স্বচ্ছ জীবনধারা এতদিন অপ্রতিহত গতিতে প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা শুকাইয়া গিয়াছে, ধর্মকলহে বাংলার আকাশ-বাতাস বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং জাতীয় অধোগতির অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে বাংলার স্বাধীনতা-সূর্য অস্তমিত হইয়াছে। স্বর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা অন্ধকারে ডুবিয়া গেলেন,—মাকে না দেখিতে পাইলে শিশু যেমন করিয়া কাঁদে, একাক্ষর মহামন্ত্রে দীক্ষিত বঙ্কিমচন্দ্র তেমন করিয়া কাঁদিলেন। তারপর, আবার জ্ঞানবিজ্ঞানসমৃদ্ধ প্রতীচীর সংস্পর্শে আসিয়া বাঙ্গালীর নির্জীব, মৃতপ্রায় দেহে প্রাণের স্পন্দন দেখা দিল,—বাঙ্গালী মুগ্ধ বিস্ময়ে যেমন পাশ্চাত্ত্যের উপকরণ-সম্ভারের দিকে তাকাইল, তেমনি আপন ঘরের অমৃতের প্রতিও তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। এই নব জাগরণের দিনে রাজা রামমোহন তাঁহার বিরাট মনীষা লইয়া আবির্ভূত হইলেন। কিন্তু যিনি সব্যসাচীর মত একদিকে স্বদেশীয় ও অপর দিকে বিদেশীয় পণ্ডিতগণের সঙ্গে মসী-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার চোখেও ভারতীয় সাধনার ক্রমবিকশের ধারা এবং বাঙ্গলার সাধনার সহিত উহার যোগসূত্র ধরা পড়িল না। আবার, রামমোহনের অনুবর্তিগণ সেই যুগন্ধর পুরুষের ক্ষুরধার যুক্তির প্রখরতা ও অলোকসামান্য মনীষার বিশালতা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া প্রত্যেকে নিজ নিজ শিক্ষা ও দীক্ষা অনুযায়ী স্বতন্ত্র পথ বাছিয়া লইলেন। জ্ঞানতাপস অক্ষয়কুমারের মধ্যে যুক্তিবাদ প্রবল ছিল বটে, কিন্তু ভারতীয় সাধনার বিবর্তনে পৌরাণিক ভক্তি-ধর্মেরও যে একটা বিশেষ স্থান আছে তাহা তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। ভক্ত কেশব-চন্দ্রের সাধনায় যুক্তিবাদের বিশেষ স্থান ছিল না, কিন্তু ভক্তির একটা ক্রম-বিকাশ ছিল এবং পুরাণ ও তন্ত্র-সমূহের একটা

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা তাঁহার দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। সুতরাং, তিনি তাঁহার গুরুর মতবাদ হইতে ক্রমশঃ দূরে সরিয়া পড়িয়াছিলেন। আবার, যে উদার দৃষ্টি লইয়া রাজা রামমোহন উপনিষদ্, বেদান্ত ও তন্ত্রসমূহের আলোচনা করিয়াছেন, সেই দৃষ্টি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ছিল না। কিন্তু বৈষ্ণবধর্মের প্রতি প্রবল বিদ্বেষ থাকায় রাজা রামমোহনও ভারতীয় সাধনার অখণ্ড ঐক্য উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। সুতরাং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে এই সকল পরস্পরবিরোধী আদর্শ সংহত ও দৃঢ়-বদ্ধ হয় নাই। সংস্কারকগণের মধ্যে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি না থাকাতে তাঁহারা অনেকেই প্রাচীনের অযথা নিন্দাবাদ করিয়াছেন এবং প্রতীচীর প্রতি অসঙ্গত পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছেন। সুতরাং, স্বধর্ম ও পরধর্মে যে সংঘর্ষ চলিয়াছে, তাহার কোন সমাধান হয় নাই। যুগাচার্য বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুর শাস্ত্রসিন্ধু ও পাশ্চাত্ত্যের জ্ঞানসমুদ্র মন্থন করিয়া পরিপূর্ণ মানবতার যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাতেই স্বধর্মভ্রষ্ট বাঙ্গালী আবার আপন ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছিল। স্বধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং প্রতীচীর জ্ঞানবিজ্ঞানের সংস্পর্শে আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র আপন অসামান্য প্রতিভার বলে স্বতন্ত্র পথ বাছিয়া লইলেন—উহা তাঁহাকে 'ধর্ম-ব্যাখ্যা'-প্রণেতা পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি ও পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন হইতে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে সমাজসংস্কারের কোন উন্মাদনা ছিল না। উহার কারণ অনুসন্ধান করিলে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের আসল রূপটি ধরিতে পারিব। যাঁহারা মনে করিতেন—অস্পৃশ্যতা দূর করিলে, বাল্য-বিবাহ উঠাইয়া দিলে এবং বিধবা-বিবাহের প্রবর্তন করিলেই আমাদের সমাজ উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিবে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের দলে নাম সহি করিতে পারেন নাই;

তাঁহার মধ্যে ভট্টাচার্য-সুলভ গোঁড়ামি ছিল বলিয়া যে পারেন নাই ; তাহা নহে ;—তাঁহার চিন্তাধারা স্বতন্ত্র ছিল বলিয়াই পারেন নাই। জাতীয় জীবনের যখন অধোগতি ঘটে, তখন সমাজ-দেহে নানারূপ বিকৃতি দেখা যায় বটে, কিন্তু যে চিকিৎসক সমাজের সর্বাঙ্গে বিশুদ্ধ শোণিত-ধারা সঞ্চারিত করিবার চেষ্টা না করিয়া উহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ছেদনের দ্বারা বা বাহির হইতে উৎক্ষিপ্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সংযোজনার দ্বারা ব্যাধির উপশম করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের চিকিৎসা-পদ্ধতিতে বঙ্কিমচন্দ্র আস্থাহীন ছিলেন। যাঁহারা জয়চাঁদ বা মীরজাফরকে ভারতের পরাধীনতার কারণ বলিয়া নির্দেশ করেন, তাঁহাদের মতবাদও বঙ্কিমচন্দ্র গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন—যে সমাজে বা রাষ্ট্রে প্রাণধারা অব্যাহত থাকে, সেখানে কখনও কৃতঘ্নতা বা বিশ্বাসঘাতকতা আত্মপ্রকাশ করে না কিন্তু জাতীয় জীবনের যখন চরম দুর্গতি উপস্থিত হয়, তখন সহস্র সহস্র জয়চাঁদ, মীরজাফর ও লালসিংহে দেশ ছাইয়া ফেলে। তাই বঙ্কিমচন্দ্র চাহিয়াছেন—মানুষ গড়িতে। গ্রীস দেশের খ্যাপা দার্শনিক 'ডায়োজিনিস্' দিবাভাগে বর্তিকা হস্তে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেন আর বলিতেন—'ওগো, মানুষ চাই।' বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তর হইতেও এই ক্রন্দনই গুমরিয়া উঠিয়াছিল—'ওগো, মানুষ চাই, মানুষ চাই'।

প্রতীচীর শিষ্য বঙ্কিমচন্দ্র হার্বার্ট স্পেন্সার, আর্ণল্ড প্রভৃতি মনীষিগণের নিকট পরিপূর্ণ মানবতার আদর্শে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। আর প্রাচীর শিষ্য বঙ্কিম বিশেষ কোন মানবের মধ্যে সেই আদর্শের সন্ধানে ব্যর্থকাম হইয়া আপন ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর অতি গৌরবময় যুগের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া তিনি দেখিলেন—মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ এদেশে ঘটে নাই। বাঙ্গলার

নব্য নৈয়ায়িকগণ মস্তিষ্কের (Intellect) চরম উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন, বৈষ্ণব কবি ও সাধকগণ প্রেমধর্মের (Religious Sentiment) পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, তান্ত্রিক সাধকগণ মনঃ-শক্তির (Will-Force) অপূর্ব বিকাশ দেখাইয়াছেন কিন্তু মনীষার সঙ্গে হৃদয়ের এবং হৃদয়ের সঙ্গে ইচ্ছাশক্তির সামঞ্জস্যের যে আদর্শ, তাহার সন্ধান বাঙ্গলার গৌরবের দিনেও বড় একটা মিলে না। বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের মধ্যে শারীরিকী, জ্ঞানার্জনী, কার্যকারিণী ও চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিসমূহের চরম স্ফূর্তি দেখিতে চাহিয়াছিলেন, তাই তাঁহার এত সাধের বাঙ্গলা তাঁহাকে তৃপ্তি দান করিতে পারিল না, তাই বিদ্রোহী বঙ্কিম 'আনন্দমঠে' বৈষ্ণবধর্মের নূতন আদর্শ প্রচার করিলেন, 'ধর্মতত্ত্বে' পেটুকের সঙ্গে যোগীকেও অধার্মিক বলিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হইলেন না। করুণার মূর্তিমান বিগ্রহ বুদ্ধদেব, ত্যাগ ও ক্ষমার অবতার যীশুখ্রীষ্ট তাঁহার প্রাণের ক্ষুধা মিটাইতে পারিল না—তাঁহার স্বপ্নে ভাসিয়া উঠিল—মহাপুরুষ ও সত্যানন্দ, ভবানী পাঠক ও চন্দ্রচূড়, কল্যাণী ও শান্তি, প্রফুল্ল, শ্রী ও জয়ন্তী। তিনি মহাকাব্যরূপ সিন্ধু মথিত করিয়া দেখাইলেন, পরিপূর্ণ মানবতার আদর্শ আমাদের যেরূপ আছে, পৃথিবীর আর কোথাও সেরূপ নাই। শ্রীরামচন্দ্র, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতির মধ্যে তিনি সর্বাঙ্গীণ মানবতার স্ফূর্তি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন কিন্তু কুরুক্ষেত্রের সিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে এমন একটি সর্বাঙ্গসুন্দর আদর্শ দেখিতে পাইলেন যাহার সম্মুখে অপর সকল আদর্শ ম্লান হইয়া যায়। যে বৃন্দাবন-বিহারী শ্রীকৃষ্ণ মুখমারুতে বংশীর রন্ধ্রসমূহ পূর্ণ করিয়া ব্রজগোপীর মনোহরণ করেন, তাঁহাকে যে বাঙ্গালী বঙ্কিম চিনিতেন, শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রেই তাহার প্রমাণ আছে। কিন্তু যিনি—

'নিজ সম সখা সঙ্গে গোগণ-চারণ-রঙ্গে
বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দে বিহার।

যাঁর বেণুধ্বনি শুনি স্থাবর জঙ্গম প্রাণী
অশ্রু বহে পুলক, কম্প, ধার' ॥

বহু শত বৎসর তাঁহার উপাসনা করিয়াও যে বাঙ্গালী মানুষ হয় নাই, এ দুঃখ বঙ্কিমচন্দ্রকে গভীরভাবে পীড়া দিয়াছিল। তাহার প্রধান কারণ,—তিনি জাতিকে মানুষ করিবার দুরূহ ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'সম্ভবামি যুগে যুগে'—এই বাণীতে শ্রদ্ধাবান হইয়াও তিনি পূর্ববর্তী কোন যুগন্ধর পুরুষের তীব্র আক্রমণ হইতে শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা করিবার জন্য এবং বাঙ্গালীকে সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের আদর্শে দীক্ষিত করিবার জন্য ক্ষুরধার যুক্তিজাল ও পাণ্ডিত্যের সাহায্যে প্রচার করিলেন—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই মানুষের সমস্ত বৃত্তি চরম স্ফূর্তিপ্রাপ্ত।

তাঁহার এই বিপুল পরিশ্রমের মূলে ছিল—স্বদেশপ্রেম, জাতিকে মানুষ করিবার দুর্নিবার, দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা, ইংরেজের শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবে যাহারা আত্মসম্বিৎ হারাইয়া তাহাদেরই প্রতিটি কথার প্রতিধ্বনি করিতেছিল, তাহাদিগকে প্রবুদ্ধ (dehypnotise) করিবার প্রচেষ্টা। আজ জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, তাঁহার এই পর্বতপ্রমাণ পরিশ্রম কি ব্যর্থ হইয়া যাইবে? আমরা কি এখনও মানুষ হইবার দুর্জয় সঙ্কল্প গ্রহণ করিব না? আমরা কি এই দ্বন্দ্ব-কোলাহলময় সংসারে পাঞ্চজন্যের সেই সিংহনাদ শুনিতে পাইব না? যদি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেই মহান্ বীর্য, সেই মহতী প্রতিভা, সেই অপূর্ব সমন্বয়, সেই নিষ্কাম কর্মযোগ ও তত্ত্বজ্ঞানের আদর্শ আমাদিগের মধ্যে নবজন্মলাভের প্রেরণা না জাগায়, যদি আমাদিগকে প্রজ্ঞাবান, মেধাবান, শক্তিমান করিয়া না তোলে, তাহা হইলে বলিতে হইবে, আমরা যথার্থই মরিতে বসিয়াছি।

বঙ্কিমচন্দ্রের দুই রূপ

মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র দুইটি বিভিন্ন মূর্তিতে আমাদের নিকট আবির্ভূত হইয়াছেন। একরূপে তিনি লাঞ্ছিত, নিপীড়িত মানবতার প্রতিনিধি, আর একরূপে ভারতীয় সাধনা ও সংস্কৃতির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের উদ্ধার-কর্তা।

তাই তাঁহার মধ্যে একদিকে ব্রাহ্মণের স্থির প্রশান্তি, আর একদিকে ক্ষত্রিয়ের উগ্র অসহিষ্ণুতা। একদিকে বঙ্কিমচন্দ্র বিড়ালের মুখে নির্যাতিত মানবের বেদনাকে ভাষা দিয়াছেন, হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্তের শোচনীয় অবস্থা মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন, কৃষিজীবীর দুঃখে অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিয়াছেন, সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী ঘোষণা করিয়া জলদগম্ভীর স্বরে বলিয়াছেন, 'ভারতবর্ষ হিন্দুমুসলমানের দেশ',—আর একদিকে বঙ্কিমচন্দ্র স্বীয় ধর্মের গ্লানি মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছেন, আত্ম-বিস্মৃত হিন্দু জাতির পরানুচিকীর্ষায় সত্যানন্দের মত উগ্র অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র মহাপুরুষের স্থির প্রশান্তি লইয়া মানুষের ব্যথা অনুভব করিতেছেন, কিন্তু যেখানে তিনি স্বীয় ধর্ম ও সভ্যতাকে বিপন্ন দেখিয়াছেন, সেখানে কাপুরুষের মত সেই দুঃসহ অগৌরবকে সহ্য করিতে পারেন নাই। হিন্দু জাতির যুগ-যুগ-সঞ্চিত বেদনা তাই বঙ্কিমচন্দ্রের কণ্ঠে ভাষা পাইয়াছে। মানবতার প্রতিনিধি বঙ্কিমচন্দ্র কৃষকের দুর্দশা বর্ণনা করিতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

'বল দেখি চশ্‌মা-নাকে বাবু, ইহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? তুমি লেখাপড়া শিখিয়া ইহাদিগের কি মঙ্গল সাধিয়াছ? আর তুমি ইংরেজ বাহাদুর····তুমি বল দেখি যে তোমা হইতে এই হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্তের কি উপকার হইয়াছে?' 'কমলাকান্তের

দপ্তরে' বিড়াল চৌর্য-নীতির সমর্থন করিয়া যে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছে, তাহা হঠাৎ আলোর-ঝলকানির মত পণ্ডিত্যাভিমানী দ্বিপদ হইতে বিজ্ঞ চতুষ্পদের শ্রেষ্ঠত্ব আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছে। আবার স্বদেশ ও স্বজাতির অতীত গৌরব বঙ্কিমচন্দ্রকে বিস্ময়ে অভিভূত, সম্ভ্রমে নত করিতেছে, স্বজাতির বর্তমান দুর্দশা তাঁহার চক্ষুর্দ্বয়কে অশ্রুতে সিক্ত, হৃদয়কে ক্রোধে উদ্দীপ্ত করিতেছে। আমরা 'সীতারাম' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের এই মূর্তি দেখিতে পাই :—

'পাথর এমন করিয়া যে পালিশ করিয়াছিল, সে কি আমাদেরই মত হিন্দু? আর এই প্রস্তর-মূর্তি সকল যে খোদিয়াছিল,—এই দিব্যপুষ্প-মাল্যাভরণভূষিত বিকম্পিতচেলাঞ্চলপ্রবৃদ্ধসৌন্দর্য, সর্বাঙ্গ-সুন্দর গঠন, পৌরুষের সহিত লাবণ্যের মূর্তিমান্ সম্মিলন-স্বরূপ পুরুষমূর্তি যাহারা গড়িয়াছে তাহারা কি হিন্দু? এইরূপ কোপপ্রেমগর্বসৌভাগ্যস্ফুরিতাধরা, চীনাম্বরা, তরলিতরত্নহারা, পীবরযৌবনভারাবনতদেহা এই সকল স্ত্রীমূর্তি যারা গড়িয়াছে, তারা কি হিন্দু? তখন হিন্দুকে মনে পড়িল। তখন মনে পড়িল, উপনিষদ্, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, পাণিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, বৈশেষিক; এ সকলই হিন্দুর কীর্তি—এ পুতুল কোন্ ছার? তখন মনে করিলাম, হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জীবন সার্থক করিয়াছি।'

এই স্বাজাত্যাভিমান-প্রদীপ্ত উজ্জ্বল মুখমণ্ডলের পশ্চাতে বিষাদ-ম্লান বঙ্কিমের যে মুখচ্ছবি, তাহাও আমরা দেখিয়াছি—

'হায়! এখন কিনা হিন্দুকে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল স্কুলে পুতুল-গড়া শিখিতে হয়! কুমারসম্ভব ছাড়িয়া সুইনবর্ণ পড়ি, গীতা ছাড়িয়া মিল্ পড়ি, আর উড়িষ্যার প্রস্তরশিল্প ছাড়িয়া সাহেবদের চীনের পুতুল হাঁ করিয়া দেখি। আরও কি কপালে আছে বলিতে পারিনা।'

বঙ্কিমচন্দ্রের এই ব্যথাহত মূর্তিখানি ভুলিয়া গেলে ধর্মব্যাখ্যাতা বা কৃষ্ণচরিত্র-বিশ্লেষণকারী বঙ্কিমের মধ্যে ক্বচিৎ কখনও যে অসহিষ্ণুতা দেখা যায়, তাহার সঙ্গত অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। বঙ্কিম-দর্শনের মর্মগ্রহণ করিতে হইলে মানবপ্রেমিক বঙ্কিম-চন্দ্র ও হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি বঙ্কিমচন্দ্র এই উভয়ের অখণ্ডত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে এবং তাঁহার হৃদয়ের পুঞ্জীভূত বেদনা হৃদয় দ্বারা অনুভব করিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্বে স্বদেশ-প্রেম ও বিশ্ব-প্রেম কিরূপে সকল বিরোধ পরিহার করিয়াছে, নিম্নোদ্ধৃত উক্তিই তাহার প্রমাণ—

'আত্মরক্ষা হইতে স্বজনরক্ষা গুরুতর ধর্ম, স্বজনরক্ষা হইতে দেশরক্ষা গুরুতর ধর্ম। যখন ঈশ্বরে ভক্তি এবং সর্বলোকে প্রীতি এক, তখন বলা যাইতে পারে যে, ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন দেশপ্রীতি সর্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম।'

এইজন্য বঙ্কিম-কথিত ধর্মতত্ত্বে বাহুবলেরও একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। প্রাচীন আর্য ঋষিগণ একদিন যে এই বাহুবলের প্রয়োজনীয়তা বিলক্ষণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রার্থনায়ই তাহার প্রমাণ আছে :—'হে মন্যুস্বরূপ, অন্যায়ের প্রতি যে পবিত্র ক্রোধ তাহা আমাদের মনে সঞ্চারিত কর।' কিন্তু মহাকাব্যের গৌরবময় যুগের অবসানে ভারতবর্ষে অধঃপাতের সূত্রপাত হয়। তারপর দীর্ঘদিনের পরাধীনতায় ভারতীয়গণ এবং বিশেষ-ভাবে বাঙ্গালী জাতি ভীরু, কাপুরুষ, নির্বীর্য হইয়া পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালী জাতির এই শোচনীয় অধোগতির দুইটি সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখিতে পাইয়াছিলেন—দারিদ্র্য ও বাহুবলের অভাব। 'গরীবের কোন ধর্ম নাই', 'দুর্বলের পক্ষে ধর্মাচরণ অসাধ্য',—এই দুইটি মহাসত্য বঙ্কিমচন্দ্র যেমন উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এমন আর কেহ করেন নাই। পরবর্তী কালে আচার্য বিবেকানন্দ আমাদিগকে

কূর্মদেবতার পূজা করিতে অর্থাৎ ভালভাবে খাইয়া পরিয়া মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিতে বলিয়াছেন। আবার বিদ্রোহী বিবেকানন্দ এদেশের যুবকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—'তোমরা গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলার দ্বারাই স্বর্গরাজ্যের অধিকতর নিকটবর্তী হইবে। তোমাদের শরীর একটু সুস্থ বলিষ্ঠ হইলে তোমরা শ্রীকৃষ্ণের মহান বীর্য ও মহতী প্রতিভা ভালরূপে বুঝিতে পারিবে।' আমরা দেখিতে পাই, বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ পুরুষ বাহুবলে বলীয়ান্, অস্ত্রধারণে দক্ষ, যুদ্ধে নিপুণ, শত্রুবধে নির্মম। বঙ্কিমচন্দ্র আমাদিগকে প্রখর যুক্তির সাহায্যে 'বাহুবলের' প্রয়োজনীয়তা বুঝাইতেছেন—

'যে বলে পশুগণ এবং মনুষ্যগণ উভয়ে প্রধানতঃ স্বার্থসাধন করে, তাহাই বাহুবল; প্রকৃতপক্ষে ইহা পশুবল, কিন্তু সর্বকার্যক্ষম এবং সর্বত্রই শেষ নিষ্পত্তি-স্থল। যাহার আর কিছুতেই নিষ্পত্তি হয় না, তাহার নিষ্পত্তি বাহুবলে। এমন গ্রন্থি নাই যে, ছুরিতে কাটা যায় না,—এমন প্রস্তর নাই যে, আঘাতে ভাঙ্গে না। বাহুবল ইহ জগতের উচ্চ আদালত···ইহার উপর আর আপীল নাই। বাহুবল পশুর বল, কিন্তু মনুষ্য অদ্যাপি কিয়দংশে পশু, এজন্য বাহুবল মানুষের প্রধান অবলম্বন।'

বঙ্কিমচন্দ্র কুক্কুরের দলের পলিটিশিয়ানকে মর্মে মর্মে ঘৃণা করিয়াছেন, আর বৃষের দলের পলিটিশিয়ানের জয়গান করিয়াছেন, পৃথিবী যে তস্কর-ভোগ্যা এই মহাসত্যও কমলাকান্তের মুখে প্রচার করিয়াছেন। তিনি অস্ত্রধারণ-নিষেধ-আইনকে আইনের ভুল বলিয়া প্রচার করিতে দ্বিধা করেন নাই। আমরা এইখানেই ব্রাহ্মণ্য ধর্মে দীক্ষিত বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষাত্র-বীর্য দেখিতে পাই।

বঙ্কিম-দর্শনের উৎস-সন্ধানে

পূর্বে বলিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র দর্শনে কর্মযোগী ছিলেন। আবার বলি, যে বঙ্কিমচন্দ্রের ধ্যান-নেত্রে কোন এক অনন্ত মুহূর্তে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র উদ্ভাসিত হইয়াছিল, 'কমলাকান্তের দুর্গোৎসবে' যাঁহার পুঞ্জীভূত বেদনা ভাষা পাইয়াছিল, সেই বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় না থাকিলে তাঁহার দার্শনিক মতবাদ সম্যক্ উপলব্ধি করা যায় না। এই জড়, মৃতপ্রায় বাঙ্গালীকে যে তিনি নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন—নিশ্চেষ্ট, নিরুদ্যম, দলাদলি-প্রিয়, কলহপরায়ণ জাতিকে যে তিনি মানুষ করিতে চাহিয়াছিলেন এবং তাহারই ফল-স্বরূপ 'কৃষ্ণচরিত্র', 'অনুশীলনতত্ত্ব'. 'ভগবদগীতার ভাষ্য' (অসম্পূর্ণ) প্রভৃতি গ্রন্থ বঙ্গবাণীকে উপহার দিয়াছেন, এ কথা যেন আমরা কখনও বিস্মৃত না হই। বঙ্কিমচন্দ্রের দার্শনিক মতবাদকে শুধু academic discussion রূপে গ্রহণ করিলে মস্ত একটা ভুল করা হইবে। দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র যত বড়ই হউন, মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র তাহা অপেক্ষা বৃহত্তর, মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র যত বড়ই হউন, প্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্র তাহা অপেক্ষা বৃহত্তর, প্রতিভাবান্ বঙ্কিমচন্দ্র যত বড়ই হউন, সাধক বঙ্কিমচন্দ্র তাহা অপেক্ষা বৃহত্তর। আজ আমরা মানুষ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি, সাধক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি, প্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণতি জ্ঞাপন করি। কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া আমরা বলি—

'তুমিই সাজালে ভাষা শ্যাম সুষমায়,
বালিকা প্রফুল্ল আনি গড়াইলে দেবীরাণী
বিদ্যুতে মাখিয়া ফুল দেব-প্রতিভায়।
কল্পনা-কালিন্দী-তটে, গড়িলে আনন্দ-মঠে,
ভারত-ভবিষ্য-স্বর্গ সুমেরু-ছায়ায়।

শিখালে সন্তান-ধর্ম জননীর প্রিয় কর্ম,
মহাবীর সত্যানন্দ মহাপ্রাণতায়।
তুমি সাজাইলে ভাষা নানা আভরণে,
বুঝাইলে যোগ ভক্তি কৃষ্ণের অসীম শক্তি
দেখালে আদর্শ নর দেব-নারায়ণে,
ঝেড়ে পুছে ধূলা মাটি হিন্দুর আসল খাঁটি
বুঝাইলে দয়া ধর্ম দেশবাসিগণে।
তোমার স্বাধীন মত, শরতের রৌদ্রবৎ
জ্বলিতেছে ভারতের গগনে গগনে।'

কবি হেমচন্দ্র ও বাংলায় উনবিংশ শতাব্দী

(১৮৩৮-১৯০৩)

যে লোকোত্তর প্রতিভার গুণে মধুসূদন বাংলার কাব্য-সাহিত্যে একটি নূতন যুগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, হেমচন্দ্র সে প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না। কিন্তু একথা সত্য যে, উনিশ শতকের শেষার্ধে প্রতীচ্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকের হৃদয়ে যে আশা ও আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছিল, হেমচন্দ্রের রচনাবলীতে উহারই প্রতিফলন দেখিতে পাই। এইজন্য হেমচন্দ্র যতটা কবি-শক্তির অধিকারী ছিলেন, তাহার চেয়ে অধিক কবি-যশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এ যুগে হেমচন্দ্রের রচনাবলীর পাঠক-সংখ্যা যেমন বিরল, তেমনই তাঁহার দানের উপযুক্ত মর্যাদা-দানেও আমরা কুণ্ঠিত।

হেমচন্দ্রের রচনাবলীকে প্রধানতঃ কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। (১) মহাকাব্য, (২) ক্ষুদ্র বা নাতিদীর্ঘ আখ্যান-কাব্য, (৩) সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি নানা বিষয়ে ব্যঙ্গ কবিতা, (৪) স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তামূলক কবিতা এবং (৫) প্রকৃতিবিষয়ক কবিতা। হেমচন্দ্রের সমগ্র রচনাবলীর মধ্যে তাঁহার স্বদেশপ্রেম ও স্বাজাত্যবোধ-মূলক কবিতাই সে যুগের বাঙ্গালীর নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক সমাদর ও মর্যাদা লাভ করে।

হেমচন্দ্রের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'চিন্তাতরঙ্গিণী' সে যুগে সমাদর লাভ করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয় আখ্যান-কাব্যেই (বীরবাহু কাব্য) স্বদেশপ্রেম ও স্বাজাত্যবোধের প্রথম যথার্থ স্ফুরণ দেখা যায়। এই কাব্যের আখ্যাপত্রে দেখিতে পাই, ভারতের

গৌরবময় অতীতের জন্য কবি বিলাপ করিতেছেন। কবি বলিতেছেন—

'আর কি সে দিন হবে জগৎ জুড়িয়া যবে
ভারতের জয়কেতু মহাতেজে উড়িত।
যবে কবি কালিদাস শুনাতে মধুর ভাষ
ভারতবাসীর মন নানা রসে তুষিত'॥

ইহার পর হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী' আত্মপ্রকাশ করে। কবিতাবলীর কোন কোন কবিতায় যথার্থ কবিত্ব-শক্তির পরিচয় আছে। এই কাব্যগ্রন্থে 'হতাশের আক্ষেপ', 'যমুনাতটে', 'লজ্জাবতী লতা', 'পদ্মের মৃণাল', 'অশোকতরু' প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গীতিকবিতা, 'বিধবা রমণী', 'কুলীন-মহিলাবিলাপ' প্রভৃতি সামাজিক কবিতা এবং 'ভারতসঙ্গীত' প্রভৃতি জাতীয় ভাবের উদ্বোধক কবিতা স্থান পাইয়াছে। 'পদ্মের মৃণাল' কবিতায় পদ্মের মৃণাল উপলক্ষ্য মাত্র, ইহাকে অবলম্বন করিয়াই কবি জাতির জীবনে নিষ্ঠুর নিয়তি-লীলার বর্ণনা করিয়াছেন। 'অশোকতরু' কবিতায় কবি অশোকতরুকে উপলক্ষ্য করিয়া মানব-মনের ভয়াবহ মানচিত্র উদ্ঘাটন করিয়াছেন এবং আপন ব্যক্তি-জীবনের পুঞ্জীভূত বেদনাকে প্রকাশ করিয়াছেন। 'ভারত-সঙ্গীত' কবিতায় হেমচন্দ্র চারণ-কবির মত ভেরী-নিনাদ করিয়া ঘুমন্ত দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন।

ইহার পর বৃত্রসংহার, প্রথম খণ্ড (১৮৭৫) এবং প্রায় আড়াই বৎসর পরে এই কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ড আত্মপ্রকাশ করে। আমরা যথাস্থানে এই মহাকাব্যখানির বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। নানা দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও বৃত্রসংহার সে-যুগের পাঠকসমাজের প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল এবং স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র কবি হেমচন্দ্রকে এই কবি-কৃতির জন্য অভিনন্দন জানাইয়াছিলেন।

হেমচন্দ্রের 'আশাকানন', 'ছায়াময়ী' ও 'দশমহাবিদ্যা' যথাক্রমে রূপককাব্য, মহাকবি দান্তের 'ডিভাইনা কমেডিয়ার' আভাস-অবলম্বনে রচিত খণ্ডকাব্য এবং পৌরাণিক বিষয়বস্তুর আশ্রয়ে গ্রথিত আখ্যানকাব্য। 'ছায়াময়ী' কাব্যে যেমন হেমচন্দ্র বাঙ্গালী পাঠকসমাজের কথা চিন্তা করিয়াই খ্রীষ্টীয় পুরাণের অবিকল অনুসরণ করেন নাই, তেমনি হয়ত 'দশমহাবিদ্যায়' পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত পাঠকবর্গের কথা স্মরণ করিয়া অথবা স্বয়ং প্রতীচ্য ভাবধারার প্রভাব অতিক্রম করিতে না পারিয়া পৌরাণিক কাহিনীকে বিকৃত করিয়াছেন। দশমহাবিদ্যায় কবি পৌরাণিকী পরিকল্পনার সঙ্গে ক্রমবিকাশবাদ-রূপ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সামঞ্জস্য-স্থাপনের অদ্ভুত প্রয়াস করাতে ভাবের অসঙ্গতি ও দুর্বোধ্যতা-দোষে কাব্যখানি দুষ্ট হইয়াছে। তথাপি, সতীশূন্য কৈলাসে মহাদেবের যে গম্ভীর বিলাপ-ধ্বনি আমরা শুনিতে পাই, সমগ্র বাংলা সাহিত্যে তাহার তুলনা নাই। 'বান্ধব' পত্রিকায় 'দশমহাবিদ্যা' উচ্চ প্রশংসা লাভ করে, কিন্তু সমালোচক অক্ষয়চন্দ্র সরকার কাব্যখানির প্রতিকূল সমালোচনা করিয়াছেন। 'ছায়াময়ী'র প্রারম্ভে হেমচন্দ্র যে রৌদ্র ও বীভৎস রসের অবতারণা করিয়াছেন, উহাকে কিন্তু অক্ষয়চন্দ্র 'বঙ্গভাষায় অতুল্য' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলা দেশে যে নব জাগৃতি দেখা দিয়াছিল, উহার লক্ষণ—স্বদেশপ্রেম ও স্বাজাত্যবোধ, সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শে প্রত্যয়, যুক্তির আলোকে হিন্দুধর্মের তাৎপর্য-আবিষ্কারের প্রয়াস, ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা। হেমচন্দ্রের রচনাবলীতে এই সকল লক্ষণই পরিস্ফুট। হেমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমও তিনটি স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত। এই তিনটি ধারা (১) 'ভারত-বিলাপ' প্রভৃতি জাতীয় ভাবের উদ্দীপক কবিতায়, (২) পৌরাণিক আখ্যান-কাব্যে, যথা—বৃত্রসংহার ও দশমহাবিদ্যায়

এবং (৩) সামাজিক কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। হেমচন্দ্রের অনেক সামাজিক কবিতায় তাঁহার প্রাগ্রসর (Progressive) ও সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয়ও পাওয়া যায়। 'কামিনীকুসুম' কবিতায় আমরা যেন কবি ঈশ্বর গুপ্তের বাণীরই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। কবির সেই উক্তি—'কে খোঁজে সরস মধু বিনা বঙ্গকুসুমে' আমাদের মনে গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়া যায়। কবির অনেক ব্যঙ্গ কবিতারও মূল উৎস স্বদেশ-প্রেম, স্বজাতীয়ের দুর্গতিতে বেদনাবোধ। 'দাঁতভাঙ্গা কাব্যে' (সাহিত্য-সাধক চরিতমালার ৩৩ সংখ্যায় উদ্ধৃত) কবি বাঙ্গালী-চরিত্রের উপর তীব্র কশাঘাত করিয়াছেন। এই কব্যের এক স্থানে কবি লিখিয়াছেন—

'বাঙ্গালী অপূর্ব জাতি বিষম বুকের ছাতি
সাহসে সংবাদপত্র লেখে;
মল্লভূমি মুদ্রালয় একাকী অকুতোভয়
কল্পনায় কত যুদ্ধ দেখে।
ঘরে যদি শিশু কাঁদে সম্পাদক ঘোর নাদে
ছুটে গিয়া কার্ণিসে দাঁড়ায়,
বগলে কাগজ আঁটি কলম ঢাকের কাটী
বর্গী এলো বলিয়া চেঁচায়'।

ব্যঙ্গকবিতা-রচনায় হেমচন্দ্র যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়াছেন কিন্তু তাঁহার কবি-প্রতিভার এই দিকটি অনেকাংশে উপেক্ষিত হইয়াছে।

মহাকবি হেমচন্দ্র

বৃক্ষ-জগতে বনস্পতির যে ঐশ্বর্য, যে মহিমা, যে বিরাটত্ব, কাব্য-জগতে মহাকাব্যেরও তাই। বনস্পতির মূল ভূগর্ভে প্রোথিত কিন্তু শীর্ষ ঊর্দ্ধে আকাশের দিকে উত্থিত;—ইহা শাখা-প্রশাখায়-

পত্রে-পল্লবে বিচিত্র, অথচ আপন অখণ্ড গৌরবে অধিষ্ঠিত। মহাকাব্যে বর্ণনার যে গাম্ভীর্য ও বিষয়বস্তুর যে বিরাটত্ব থাকে, উহা পাঠকের চিত্ত-সমুন্নতি ঘটায়। মহাকবির কল্পনা সুদূর-প্রসারিণী স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল-বিহারিণী, নিরঙ্কুশ। নাটকীয় অখণ্ড ঐক্য-সূত্রে ইহার আখ্যানবস্তু গ্রথিত,—রস-সৃষ্টির বৈচিত্র্যে ইহা উপভোগ্য, কল্পনার ঐশ্বর্যে ইহা সমৃদ্ধ, সর্গগুলির ধারাবাহিকতায় ইহা সংহত ও গাঢ়-বদ্ধ। বিশ্বনাথ প্রভৃতি ভারতীয় ও এরিষ্টটল প্রভৃতি প্রতীচ্য আলঙ্কারিকগণ মহাকাব্যের ও এপিকের যে সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন, উহার তুলনা করিলে আমরা কয়েকটি সাধারণ ধর্ম আবিষ্কার করিতে পারি। সংস্কৃত সাহিত্যে মহাকাব্যের প্রাচুর্য থাকিলেও প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে ইহার নিতান্ত অসদ্ভাব। মধুসূদনের 'তিলোত্তমা-সম্ভব', পূর্ণাঙ্গ মহাকাব্য না হইলেও কিয়ৎ পরিমাণে মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত—মধুসূদনের কবি-প্রতিভা যে মহাকাব্য-রচনার সম্পূর্ণ উপযোগিনী ছিল, তাঁহার রচিত প্রথম কাব্যখানি পাঠ করিলেই সে বিষয়ে কোন সংশয় থাকে না। মধুসূদনের নিরঙ্কুশ কবি-প্রতিভা দণ্ডী, বিশ্বনাথ বা এরিষ্টটলের নির্দেশ সম্পূর্ণরূপে মানিয়া না লইলেও তাঁহার 'মেঘনাদবধ'ই যে বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য, এ বিষয়ে কোন সাহিত্য-রসিকেরই মনে কোন সন্দেহ নাই। 'বৃত্রসংহারের' ছন্দ-বৈচিত্র্য সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের অনুমোদিত হইলেও ইহার দ্বারা যে মহাকাব্যোচিত গাম্ভীর্য অনেকাংশে ব্যাহত হইয়াছে, মনীষী অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সঙ্গে একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। তাহা ছাড়া, হেমচন্দ্র অনেক স্থলেই অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবহমানতা, ধ্বনি-গাম্ভীর্য ও ছন্দ-স্পন্দ রক্ষা করিতে পারেন নাই,—তিনি অনেক স্থলেই অমিত্রাক্ষর ছন্দের নামে মিলহীন পয়ারের প্রবর্তন করিয়াছেন। তথাপি, একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে বৃত্রসংহারের

ন্যায় দৃঢ়বদ্ধ ও সুসংহত মহাকাব্য বাংলা সাহিত্যে আর দ্বিতীয়টি নাই। অন্ধ, নির্মম নিয়তির হস্তে মহামহিমান্বিত পুরুষ রাবণের পরাভবই 'মেঘনাদবধের' প্রধান বিষয়বস্তু, কিন্তু বৃত্রসংহারে নিয়তির মহিমা কীর্তিত হইলেও স্বাধীনতা ও মানবতার আদর্শ-স্থাপনই ইহার প্রধান লক্ষ্য। 'মেঘনাদবধে' যে গ্রীক নিয়তিবাদ অনুস্যূত, উহার সহিত ভারতীয় আদর্শের কোন যোগ নাই; কিন্তু বৃত্রসংহারে যে স্বাধীনতা ও মানবতার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত, উহার মূলে প্রতীচ্য শিক্ষাদীক্ষার প্রেরণা থাকিলেও ভারতীয় আদর্শের সঙ্গে ইহার তেমন কোন বিরোধ নাই। সে যুগে বৃত্রসংহার যে শিক্ষিত যুবকগণের চিত্ত প্রবলভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল, উহার কারণ এই যে, তদানীন্তন শিক্ষিত জন-মানসের নবজাগ্রত স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এই কাব্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। বৃত্রাসুর কর্তৃক পরাজিত পাতালপুরাশ্রিত ক্ষুব্ধ দেবগণকে সম্বোধন করিয়া সেনাপতি স্কন্দ বলিতেছেন—

"ধিক্ দেব! ঘৃণাশূন্য অক্ষুব্ধ হৃদয়ে
এতদিন আছ এই অন্ধতম পুরে,
দেবত্ব, ঐশ্বর্য, সুধা, স্বর্গ তেয়াগিয়া
দাসত্বের কলঙ্কেতে ললাট উজলি।"

এখানে সে যুগের ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালীর নবজাগ্রত স্বাজাত্যবোধ ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। অগ্নির কণ্ঠে আমরা যে অগ্নিময়ী বাণী শুনিতে পাই, উহা যেন হেমচন্দ্রেরই ক্ষুব্ধ হৃদয়ের বাণী—

"প্রকাশি অমরবীর্য, সমরের স্রোতে
ভাসিব অনন্ত কাল, দনুজ-সংগ্রামে
দেবরক্ত যতদিন না হইবে শেষ।"

আবার দেবগণের কল্যাণে দধীচির আত্মত্যাগের মধ্য দিয়া হেমচন্দ্র যেন যুগপৎ স্বদেশ-প্রেম ও মানবতার আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। দধীচির আদর্শ পৌরাণিক, কিন্তু হেমচন্দ্রের দধীচি যেন প্রতীচীর Nationalism ও Humanism-এর প্রতিনিধি। যোগবলে তনুত্যাগের পূর্বে দধীচি ক্ষুব্ধ তাপসবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"জগৎ-কল্যাণ-হেতু নরের সৃজন,
নরের কল্যাণ নিত্য সে ধর্মপালনে,
নিঃস্বার্থ শিক্ষার পথ এ জগতী-তলে।"

(দ্বিতীয় খণ্ড, ত্রয়োদশ সর্গ)

সুতরাং সে যুগে 'বৃত্রসংহার' যে আশাতীত সমাদর লাভ করিয়াছিল এবং অনেক সমালোচকের মতে বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল, ইহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই।

আমরা হেমচন্দ্রের উপর শ্রীমধুসূদনের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করিবার সময় হেমচন্দ্রের উপর অবিচার করিয়া থাকি। 'বৃত্রসংহারে' মধুসূদনের তিলোত্তমাসম্ভবের এবং বিশেষভাবে মেঘনাদবধের প্রভাব আছে, একথা অনস্বীকার্য, কিন্তু ইহাতে মহাকবি হেমচন্দ্রের গৌরব ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তিলোত্তমাসম্ভবের ন্যায় বৃত্রসংহারেও প্রচেতা, সূর্য, অগ্নি, পবন প্রভৃতি দেবগণের উক্তির মধ্য দিয়া তাঁহাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হইয়াছে। বৃত্রসংহারের ইন্দ্র-চরিত্র কিয়দংশে তিলোত্তমাসম্ভবের আদর্শে পরিকল্পিত হইলেও স্বকীয় মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এই মহাকাব্যের দ্বিতীয় খণ্ডের ঊনবিংশ সর্গে কবি হেমচন্দ্র দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার শিল্পশালার যে বর্ণনা দিয়াছেন, উহাতে তিলোত্তমাসম্ভবের ছায়াপাত হইলেও ভীষণ-গম্ভীর দৃশ্যের বর্ণনায় এই সর্গ অধিকতর উৎকর্ষ লাভ

করিয়াছে। আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, এই সর্গ বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয়। তবে হেমচন্দ্রের প্রধান দোষ এই যে, অমিত্রাক্ষর ছন্দের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা সুস্পষ্ট ছিল না বলিয়া তিনি ইহাতে প্রাণ-বেগের সঞ্চার করিতে পারেন নাই,—বরং ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দের মধ্য দিয়া সঙ্গীত-ঝঙ্কার সৃষ্টি করিতেই তিনি অধিকতর নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। 'বৃত্রসংহার' কাব্যের স্থানে স্থানে ভাষাগত নানা দোষও সমালোচকগণ লক্ষ্য করিয়াছেন। তথাপি খণ্ড কবিতাগুলি বাদ দিলে 'বৃত্রসংহার'ই যে হেমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কবি-কৃতি, তাহাতে সন্দেহ নাই। অলোকসামান্য প্রতিভার অধিকারী মধুসূদনের অমর কাব্য আমাদিগকে সহজেই মুগ্ধ ও বিস্ময়ে অভিভূত করে বলিয়া আমরা অনেক সময়ে হেমচন্দ্রকে তাঁহার প্রাপ্য গৌরব দান করিতে কুণ্ঠিত হই। হেমচন্দ্রের প্রতিভার যেখানে স্বকীয়তা, সেখানেও সহজে আমাদের দৃষ্টি পতিত হয় না। হেমচন্দ্রের কাব্যের মধ্যে যে একটা 'গথিক' স্থাপত্যশিল্পের অখণ্ড মহিমা বিরাজ করিতেছে, সেদিকে আমরা অনেকেই অন্ধ বা উদাসীন। মহাকবি ভারবির সম্পর্কে ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"নারিকেলফলসম্মিতং ভারবের্বচঃ।" একথা হেমচন্দ্র সম্পর্কেও হয়তো কিয়দংশে সত্য।

মধুসূদনের প্রধান কৃতিত্ব এই যে, তাঁহার মেঘনাদবধের প্রত্যেকটি চরিত্র আমাদেরই মত রক্তমাংসের মানুষ হওয়াতে সহজেই আমাদের সহানুভূতির উদ্রেক করে। কিন্তু তাঁহার রচিত প্রথম কাব্য 'তিলোত্তমাসম্ভব' সম্পর্কে একথা বলা চলে না। হেমচন্দ্র চরিত্র-সৃষ্টিতে মধুসূদনের নিকট অনেকখানি ঋণী হইলেও তাঁহার চরিত্রগুলি সম্পূর্ণ রক্তমাংসের নরনারী হইতে পারে নাই। তথাপি হেমচন্দ্র চরিত্র-সৃষ্টিতে শুধু প্রাক্তন কবির অনুসরণ করেন নাই, মৌলিক কল্পনারও পরিচয় দিয়াছেন। রাবণের সঙ্গে

বৃত্রাসুরের, মেঘনাদের সঙ্গে রুদ্রপীড়ের, প্রমীলার সঙ্গে ইন্দুবালার, বন্দিনী সীতার সঙ্গে বন্দিনী শচীর, সরমার সঙ্গে চপলার সাদৃশ্যের চেয়ে পার্থক্যও কম গুরুতর নয়। অবশ্য লক্ষ্মণ-কর্তৃক মেঘনাদ-বধের পরে রাবণের আচরণের সঙ্গে রুদ্রপীড়-বধের পর বৃত্রের আচরণের যে সাদৃশ্য, তাহা সহজেই আমাদের চোখে পড়ে। তথাপি, হেমচন্দ্র যে চরিত্র-সৃষ্টিতে অসামান্য নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন, সহৃদয় পাঠকমাত্রেই তাহা স্বীকার করিবেন।

'বৃত্রসংহারে' তিনটি প্রধান ও দুইটি অপ্রধান নারীচরিত্র চিত্রিত হইয়াছে। ইন্দ্রাণী শচী, বৃত্রাসুর-পত্নী ঐন্দ্রিলা ও রুদ্রপীড়-পত্নী ইন্দুবালা—এই তিনটি মহাকাব্যের প্রধান চরিত্র, আর রতি ও চপলা এই দুইটি অপ্রধান চরিত্র। হেমচন্দ্রের নারী চরিত্রগুলি যে অনেকাংশে মানবীয়-গুণে সমৃদ্ধ, বৃত্রসংহারের পাঠকমাত্রেই সে কথা স্বীকার করিবেন। শচীর চরিত্র মহিম-মণ্ডিত,—অভিমান, স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা, দৃঢ়তা ও করুণাই তাঁহার প্রধান বৈশিষ্ট্য। ঐন্দ্রিলা ছলনাময়ী, কুটিলা, গর্বিতা, নিষ্ঠুরা। ইন্দুবালা কুসুম-কোমলা, প্রেমময়ী, পতিপ্রাণা। শচী ও ইন্দুবালা উভয়েরই করুণাধারা শত্রু-মিত্র সকলের প্রতি সমভাবে উৎসারিত। তাঁহারা নারী-চরিত্রের দুইটি বিভিন্ন দিকের প্রতিনিধি। কিন্তু যে মেঘ স্নিগ্ধ ছায়াদানে ও বারিধারা-বর্ষণে পৃথিবীকে শীতল, শ্যামল, উর্বর করিয়া তোলে, সেই মেঘের কোলে যেমন বজ্রের চোখ-ঝল্সানো খর-দীপ্তি লুকান থাকে, সেইরূপ নারীচরিত্রের স্নেহ-মমতার অন্তরালে যে অনেক সময় অভিমান ও দৃপ্ত তেজঃপুঞ্জ লুক্কায়িত থাকিয়া এবং ক্ষণে ক্ষণে প্রকট হইয়া তাহার চরিত্রকে অসাধারণ মহিমাদান করিতে পারে, শচীর চরিত্র তাহারই দৃষ্টান্ত-স্থল।

চপলা যখন শচীকে কমলা, গৌরী অথবা ব্রহ্মাণীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন, তখন মনস্বিনী শচী বলিয়াছেন—

"স্ববশে স্বাধীন চিত্ত, স্বাধীন প্রয়াস,
স্বাধীন বিরাম চিন্তা, স্বাধীন উল্লাস ;
সসর্প গৃহেতে বাস, পরবশ আর
দুই তুল্য জীবিতের, দুই পুরস্কার।"

শচীর অন্তর হইতে যে সন্তান-বাৎসল্য স্তন্য-পীযূষ-ধারার ন্যায় স্বত-উৎসারিত, উহা শুধু পুত্র জয়ন্তকেই প্লাবিত করে নাই, দানব-বধূ ইন্দুবালাকেও সিক্ত করিয়াছে। শচীর মাতৃহৃদয়ের যে দ্বন্দ্বের ছবি হেমচন্দ্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা সত্যই অপূর্ব। রুদ্রপীড়ের সঙ্গে সমরে জয়ন্ত অসীম শৌর্যের পরিচয় দিয়াছেন, রজনী প্রভাত হইলে উভয়পক্ষে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইবে, তাই শচীর জননী-হৃদয় চঞ্চল আলোর মত ক্ষণে ক্ষণে কম্পিত হইতেছে। জননী-হৃদয়ের এই আশঙ্কা তাঁহার উক্তির মধ্য দিয়া চমৎকার অভিব্যক্তি লাভ করিরাছে।

আবার মন্দাকিনী-তীরে পাষাণময় মন্দিরের নিভৃত আলয়ে বন্দিনী শচী স্বর্গের ঐশ্বর্য ও অতুলনীয় সৌন্দর্যের কথা চিন্তা করিতেছেন এবং নিজ জীবনের গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলির কথা স্মরণ করিতেছেন,—এই উপলক্ষ্যে কবি স্বদেশ-প্রেমের আদর্শ প্রচার করিবার লোভটুকু সংবরণ করিতে পারিতেছেন না। তিনি বলিতেছেন, কোন প্রবাসী যেন দীর্ঘকাল পরে জন্মভূমিতে ফিরিয়া আসিয়া তাহার আজন্ম-পরিচিত দৃশ্যাবলী দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছেন এবং মাতৃভূমি শত্রু-কবলিত দেখিয়া ক্ষোভে, বিষাদে অভিভূত হইয়া পড়িতেছেন। কবি বলিতেছেন,—

"কে আছে ত্রিলোক-মাঝে প্রাণী হেন জন
সুদূর প্রবাস ছাড়ি স্বদেশে ফিরিয়া
(কি পঙ্কিল, কিবা মরু, কিবা গিরিময়
সে জনম-ভূমি তার), নিরখি পূর্বের

পরিচিত গৃহ, মাঠ, তরু, সরোবর,
নদী, খাত, তরঙ্গ, পর্বত, প্রাণিকুল,
নাহি ভাবে উল্লাসে, না বলে মত্ত হয়ে
'এই জন্মভূমি মম'। কে আছেরে হায়,
ফিরিয়া স্বদেশে পুনঃ না কাঁদে পরাণ
হেরে শত্রু-পদাঘাতে পীড়িত সে দেশ"।

এখানে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-দীক্ষায় অনুপ্রাণিত কবির রচনায় যে স্কটের কবিতার ছায়াপাত হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই বোঝা যায়। স্কট বলিয়াছেন,—

'Breathes there the man with soul so dead
Who never to himself hath said,
This is my own, my native land'! ইত্যাদি

শচী যেদিন কামবধূর নিকট শুনিতে পাইলেন,—ত্রিদিবজয়ী দনুজ-ঈশ্বর মহেশ্বরের তুষ্টি-বিধানের জন্য তাঁহার বন্ধন-মোচনের সংকল্প করিয়াছেন, সেদিন তিনি বলিয়াছিলেন,—

"না রতি, কহগে দৈত্যে, চাহি না উদ্ধার,
সহিব এ কারাবাসে অশেষ যন্ত্রণা
পতি-হস্তে যতদিন মুক্তি নহে মম।"
(দ্বিতীয় খণ্ড, ১৪শ সর্গ)

আমরা বলিয়াছি, শচীর মাতৃ-হৃদয়ের স্নেহধারা ইন্দুবালাকেও অভিষিক্ত করিয়াছিল, তাই ইন্দুবালার অমঙ্গল-শঙ্কায় শচী ভীত হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে কবি বলিতেছেন,—

"অয়ি নিরুপমা সুরেশরমণী,
নিখিল-ব্রহ্মাণ্ড-মানসের মণি,
তব চিত্ত বিনা হেন মধুরতা

কার চিত্তে শোভে, এ স্নেহ-মমতা
বিপক্ষ-বধূরে কে করে আর ?"
(দ্বিতীয় খণ্ড, অষ্টাদশ সর্গ)

শচীর মাতৃ-স্নেহের আর একটি ছবি দেখিতে পাই এই খণ্ডের বিংশ সর্গে। দেবাসুরগণ যখন ভীষণ সংগ্রামে মত্ত, দেবগণ যখন অসুরবলের দ্বারা পরাভূত এবং জয়ন্ত রুদ্রপীড়ের সঙ্গে সংগ্রামে উদ্যত, তখন শচী চপলার মুখে জয়ন্তকে রণে ক্ষান্ত হইবার অনুরোধ জানাইতেছেন। কিন্তু রুদ্রপীড়-বধের পর শচীর শোকাশ্রু-ধারা আর বাধা মানে নাই—ইন্দুবালা যখন বাতাহতা কদলীর মত বা ছিন্নমূল লতার মত শচীর কোলে লুটাইয়া পড়িয়াছেন, তখন তাহার হৃদয় যেন কন্যা-বিয়োগে হাহাকার করিয়া উঠিয়াছে।

মেঘনাদ-বধের প্রমীলা-চরিত্রে বজ্রের কাঠিন্য ও কুসুমের পেলবতা এক অপূর্ব সমন্বয় লাভ করিয়াছে, কিন্তু ইন্দুবালা কালিদাসের শকুন্তলার মতই নব-মালিকা-কুসুম-কোমলা। আমরা মহাভারতের দ্রৌপদী-চরিত্রে যে দৃপ্ত মহিমা দেখিতে পাই, সীতা বা সাবিত্রীর মধ্যে তাহা না দেখিলেও তাঁহাদের অন্তরে অগ্নিগর্ভা শমীর মতই তেজ প্রচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু মুগ্ধস্বভাবা ইন্দুবালা যেন মূর্তিমতী করুণা। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন,—চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণ-জাল যে আলো বিতরণ করে, উহার জন্য সে সূর্যের দীপ্ত রশ্মির কাছে ঋণী। রুদ্রপীড়ের মধ্যে আমরা মধ্যাহ্ন-তপনের দীপ্তি ও ইন্দুবালার মধ্যে শুভ্র কৌমুদীর কমনীয়তা দেখিতে পাই, এখানেও ইন্দুসমা ইন্দুবালা রুদ্রতেজা রুদ্রপীড়ের ছায়া। কিন্তু নির্মম রুদ্রপীড় যে শত্রু সংহার করে, ইহা তাঁহার পরদুঃখকাতর চিত্তে বেদনা জন্মায়।

পক্ষিণী যেমন পক্ষপুট বিস্তার করিয়া আপন শাবককে আশ্রয় দেয়, শচীও একদিন তেমনি ইন্দুবালাকে আশ্রয়দান করিয়া

ছিলেন,—শিশু যেমন পিতামহীর নিকট আকুল আগ্রহে নানা গল্প শ্রবণ করে, ইন্দুবালাও তেমনি মুগ্ধচিত্তে শচীর নিকট অমরগণের পূর্ব গৌরবের কথা শুনিত। এই জন্যই ঐন্দ্রিলার চোখে সে ছিল 'বধূরূপে কাল-ভুজঙ্গিনী'।

ঐন্দ্রিলা স্বার্থান্ধ, কুটিল, গর্বোদ্ধত, পরশ্রীকাতর, প্রতিহিংসা-পরায়ণ,—তাহার অবিমৃষ্যকারিতাই বৃত্রসংহারের জন্য প্রধানতঃ দায়ী। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, ঐন্দ্রিলা ও ইন্দুবালার মধ্যে আমরা নারীর দুই বিভিন্ন রূপ দেখিতে পাই।

প্রভাতের শশিকলারূপিণী ইন্দুবালাকে শচীর পদতলে উপবিষ্ট দেখিয়া ঐন্দ্রিলা যে ক্রোধ ও ঈর্ষায় জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহার একটি চমৎকার চিত্র হেমচন্দ্র অঙ্কিত করিয়াছেন। ঐন্দ্রিলার চাতুরী ও কপটতার কাছে আমরা বৃত্রাসুরকে পুনঃ পুনঃ পরাভূত হইতে দেখিতে পাই। বৃত্রসংহারের পরে ঐন্দ্রিলার জীবনে যে শোচনীয় পরিণতি ঘটিয়াছে, লেখক অত্যন্ত কলা-কৌশলের সঙ্গে মাত্র তিনটি ছত্রে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন।

দুর্জয় দানবের মৃত্যুর পর—

'দহিল ঐন্দ্রিলাচিত্ত প্রচণ্ড হুতাশে,
চিরদীপ্ত চিতা যথা! ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া
ভ্রমিতে লাগিল বামা উন্মাদিনী এবে।'

বাস্তবিক, পুরুষ-চরিত্রের চেয়ে নারী-চরিত্র-অঙ্কনেই হেমচন্দ্র অধিকতর নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। 'বৃত্রসংহারের' পুরুষ চরিত্রগুলির মধ্যে—বৃত্রাসুর, রুদ্রপীড় ও জয়ন্ত প্রধান। বৃত্রাসুর শ্রেষ্ঠ বীর, কিন্তু তাঁহার চরিত্র নানা গুণে মণ্ডিত হইলেও ঐন্দ্রিলার সমক্ষে তাঁহার দুর্বলতা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে,—তাঁহার পৌরুষ সেখানে ধিক্কৃত ও লাঞ্ছিত। রুদ্রপীড় দৈত্যগৌরব-রবি, কিন্তু সে নিজে জননীর অনুরোধ রক্ষার জন্য বীর-জননী শচীকে লাঞ্ছিত ও

অবমানিত করিতে দ্বিধা করে নাই। ইহাই তাহার চরিত্রের প্রধান কলঙ্ক।

রুদ্রপীড়ের চরিত্র মেঘনাদের আদর্শে পরিকল্পিত হইলেও কবি তাঁহাকে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার চরিত্রে যশোলিপ্সা অতি প্রবল। মহাকবি মিল্টন যাহাকে মহৎ মনের শেষ দুর্বলতা (the last infirmity of a noble mind) বলিয়াছেন, উহা সংসারে মানুষকে অনেক সময় অনেক মহৎ কার্যের প্রেরণা দেয়। বীরশ্রেষ্ঠ পিতা বৃত্রাসুরকে সম্বোধন করিয়া রুদ্রপীড় বলিতেছেন— "বীরের স্বর্গই যশঃ, যশই জীবন,

সে যশে কিরীট আজি বান্ধিব শিরসে।
কর অভিষেক, পিতঃ, এ দাসেরে আজ
সেনাপতি-পদে তব, সমরে নিঃশেষি
ত্রিংশত্রিকোটি দেব, আসিয়া নিকটে
ধরিব মস্তকে দেখ ওই পদরেণু।" (প্রথম খণ্ড, ষষ্ঠ সর্গ)

রুদ্রপীড়ের প্রচণ্ড তেজের নিকট দেবগণকে কেমন করিয়া পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছে, সে চিত্র হেমচন্দ্র অতি নিপুণ-ভাবেই অঙ্কিত করিয়াছেন।

বৃত্রসংহারে দেবরাজের চরিত্র যেমন মহনীয়, দেবরাজপুত্র জয়ন্তের চরিত্রও তেমনি। যে অবস্থায় দেবরাজ শিবের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, সে অবস্থার কথা স্মরণ করিলে আমরা তাঁহার আচরণ সমর্থনযোগ্য বলিয়াই মনে করি।

বৃত্রসংহার কাব্যে জয়ন্তের মাতৃভক্তির চিত্রটি অতি মনোরম। জননীর অপমানের কথা শুনিয়া বীর জয়ন্তের চোখ দু'টি দীপ্ত হুতাশনের মত জ্বলিয়া উঠিয়াছে। জননীর আশীর্বাদ তাঁহার সর্ব-শ্রেষ্ঠ সম্পদ, জননীর বন্ধনমোচন তাঁহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত, জননীর আদেশ তাঁহার নিকট বেদবাক্য। শচীদেবীর আদেশে

একবার তিনি সমর হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন, অতি দুঃখের সহিত তাঁহাকে অস্ত্র ত্যাগ করিয়া রথ ফিরাইয়া লইতে হইয়াছিল। এরূপ চরিত্র সহজেই আমাদের শ্রদ্ধার উদ্রেক করে।

হেমচন্দ্রের বিষয়বস্তু মহাকাব্যের সম্পূর্ণ উপযোগী। মধুসূদনের কাব্যের প্রধান বিষয় অন্ধ, ক্রূর, নির্মম নিয়তির হস্তে মহামহিমান্বিত পুরুষের পরাভব,—তাই গ্রীক নিয়তিবাদের সূত্রে মেঘনাদবধ কাব্য গ্রথিত। কিন্তু হেমচন্দ্রের বিষয়বস্তু—দেবশক্তির কাছে বলদৃপ্ত অসুরশক্তির পরাভব। হেমচন্দ্রের কাব্যে দেবমাতা শচীদেবীর লাঞ্ছনা ও অপমান, মর্মভেদী ক্ষোভ ও দীর্ঘশ্বাস দানবশক্তি-বিনাশের প্রধান উপলক্ষ্য হইয়াছে। সুতরাং হেমচন্দ্রের বিষয়বস্তু প্রধানতঃ ভারতীয়,—তবে ইহারই মধ্যে তিনি কৌশলে জাতীয়তা ও মানবতার আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আমরা ভারতের জাতীয় মহাকাব্যদ্বয়ে দেখিতে পাই,—শক্তিরূপিণী নারীর লাঞ্ছনা ও অপমানে একদিকে বিপুল রাবণ-বংশ ধ্বংস হইয়াছে, অপরদিকে কুরুক্ষেত্রের ভৈরব আহবে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। এখানেও, দেবমাতা শচীর লাঞ্ছনা ও অপমানেই মহাদেবের ক্রোধবহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে এবং যাঁহার বরে দৃপ্ত হইয়া বৃত্রাসুর স্বর্গ হইতে দেবগণকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন, তিনিই অসুর-নিধনের আয়োজনে তৎপর হইয়া উঠিয়াছেন। সুতরাং মধুসূদন যদি বিপ্লবী কবি হন, তাহা হইলে হেমচন্দ্র ভারতীয় আদর্শের কবি।

হেমচন্দ্রের ‘বৃত্রসংহারে’ আমরা যুগপৎ কবির শক্তি ও অক্ষমতার পরিচয় পাইয়া থাকি। ইহাতে আমরা নিরঙ্কুশ কল্পনার নিদর্শন, যুদ্ধবিগ্রহাদির বর্ণনা, অতিলৌকিক ঘটনাবলীর সমাবেশ, বিষয়-বস্তুর মধ্যে নাটকীয় ঐক্য প্রভৃতি ‘এপিক’-লক্ষণ দেখিতে পাই। আবার, ছন্দোবৈচিত্র্য, অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রাণবেগ-সঞ্চারে

অক্ষমতা, ভাব ও ভাষার অস্পষ্টতা প্রভৃতি যে এই মহাকাব্যের প্রধান দোষরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য, তাহাও কাব্যরসিক মাত্রেই স্বীকার করিয়াছেন। অথচ এই মহাকাব্যের স্থানে স্থানে বর্ণনার যে গাম্ভীর্য আমরা লক্ষ্য করি, তাহাতে হেমচন্দ্র যে একজন শক্তিশালী কবি ছিলেন, একথা কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারা যায় না। বৃত্রসংহারের পরিসর (canvas) যেমন বিরাট, ইহার বিষয়বস্তুও তেমনই গম্ভীর ও চিত্তসমুন্নতিজনক ;—হেমচন্দ্রের মহাকাব্যের এই দুইটি বৈশিষ্ট্যও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

প্রতীচ্যের সমালোচকগণ মহাকাব্যকে দুইটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যে ধরণের মহাকাব্যকে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন 'বৃহৎ সম্প্রদায়ের কথা' এবং পাশ্চাত্ত্য সমালোচকগণ বলিয়াছেন Authentic Epic, কোন জাতির হৃন্মর্মমূল হইতে যাহা উদ্ভূত হয়, —বাল্মীকি, বেদব্যাস ও হোমার তাহার কবি। এইরূপ মহাকাব্যের যুগের অবসান ঘটিয়াছে কোন্ স্মরণাতীত কালে। কিন্তু যে মহাকাব্যে একটা সমগ্র যুগ বা জাতির আদর্শ, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি প্রতিফলিত হয় না, সাহিত্যিক রস বা আনন্দসৃষ্টিই যে মহাকাব্যের প্রধান লক্ষ্য এবং যাহাতে কবির ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা কামনা-বাসনা প্রতিবিম্বিত হয়, সমালোচকগণ উহাকে বলিয়াছেন Literary Epic. মিল্টনের Paradise Lost, মধুসূদনের মেঘনাদবধ, হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার ও নবীনচন্দ্রের কাব্যত্রয়ী এইরূপ এপিকের দৃষ্টান্ত-স্থল। অবশ্য, এরূপ ক্ষেত্রেও কবি তাঁহার যুগ বা সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন নহেন, বরং তিনি তাঁহার সমসাময়িক কালেরই শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। এইজন্যই হেমচন্দ্রের মহাকাব্যে উনবিংশ শতাব্দীর দুইটি বিশিষ্ট লক্ষণ—স্বাজাত্যবোধ ও স্বাধীনতার আদর্শ এবং মানবতাবোধ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। হেমচন্দ্রের স্বাজাত্যবোধ কত প্রবল ছিল, 'প্রিন্স অব্ ওয়েলসের' ভারতাগমন উপলক্ষ্যে

রচিত 'ভারত-ভিক্ষা' কবিতায় আমরা তাহার নিদর্শন পাই। তাঁহার মধ্যে যে পরাধীনতার বেদনা ও স্বাধীনতার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা ছিল তাহার স্ফুরণ হয় 'বীরবাহু' কাব্যে; 'ভারত-বিলাপ' কবিতায় আমরা উহারই শ্রেষ্ঠ প্রকাশ দেখিতে পাই। এই শেষোক্ত কবিতায় 'ভারতবাসীর অতীত গৌরব ও মহিমা কীর্তন করিয়া কবি উদাত্তকণ্ঠে তাহাদিগকে জাগ্রত হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার শিঙ্গাধ্বনি একদিন আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিয়া মনে একটা বিপুল উন্মাদনা জাগাইয়া তুলিয়াছিল। মনীষী অক্ষয়চন্দ্র সরকার সত্যই বলিয়াছেন, হেমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম জাতি-বৈরের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ফলতঃ, হেমচন্দ্রের মধ্যে জাতি-বৈরের সঙ্গে উদগ্র স্বাজাত্যাভিমানের মিশ্রণ ঘটিয়াছিল এবং ইহার মূলে ছিল প্রতীচ্য শিক্ষা-দীক্ষার প্রেরণা। অবশ্য, সে যুগে বঙ্কিমচন্দ্র-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র-অক্ষয়চন্দ্র-চন্দ্রনাথ প্রভৃতির মধ্যে আমরা যে স্বাজাত্যাভিমান দেখিতে পাই, তাহা অনেকটা পরিমাণে 'ইয়ং বেঙ্গলের' আতিশয্য ও ব্রাহ্ম সমাজের সংস্কার-স্পৃহার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার ফল। বৃত্রসংহারে দেবগণের স্বর্গরাজ্য উদ্ধারের সঙ্কল্পের মূলেও ছিল এই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও দেবত্বের অভিমান। কিন্তু এই আদর্শের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি মহত্তর ও উদারতর আদর্শের স্থাপনাও বৃত্রসংহার-কাব্যরচনার অন্যতম প্রেরণা ছিল—ইহা মানবকল্যাণে আত্মত্যাগের আদর্শ। দধীচির আত্ম-দানের মধ্যে হেমচন্দ্র আবিষ্কার করিয়াছেন ভারতীয় মৈত্রীর আদর্শ এবং প্রতীচীর philanthropy বা মানব-কল্যাণের আদর্শ।

বাস্তবিক, বৃত্রসংহার কাব্য নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও হেমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কবি-কৃতি, কিন্তু শুধু তাহাই নহে,—তিনি যে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ছিলেন, এই কাব্যের মধ্যে তাহারও যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়।

মহাকবি নবীনচন্দ্র ও উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত

(১৮৪৭-১৯০৯)

নবীনচন্দ্রের ধর্ম ও জাতীয়তা

মহাকবি নবীনচন্দ্রের বিপুল কাব্যসাধনার মূল প্রেরণা ছিল স্বদেশপ্রেম, স্বাজাত্যবোধ, স্বধর্মপ্রীতি। কিন্তু তাঁহার আদর্শের সঙ্গে বিশ্বমানবতার আদর্শের কোন বিরোধ ছিল না। তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্যসমূহে তিনি ছিলেন একাধারে শিল্পী ও প্রচারক, রস-স্রষ্টা ও সত্য-দ্রষ্টা। তিনি ছিলেন একাধারে জাতীয়তার পুরোধা ও মানব-ধর্মের উদ্‌গাতা; সত্য ও শিব তাঁহার কাব্যে সুন্দরের সঙ্গে পরিণয়-বন্ধনে মিলিত হইয়াছিল। তাই জাতীয়তা, বিশ্বমৈত্রী ও ধর্মসমন্বয়ের আদর্শ তিনি কাব্যের মধ্য দিয়া কম্বুকণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন।

তাঁহার ভাষা যেন বর্ষার কূলপ্লাবিনী তটিনীর মত তটের শাসন উপেক্ষা করিয়া স্বাভাবিক গতিতে দুর্বার বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে, তাঁহার কাব্যের সেই দুর্দম গতিবেগ, সেই বিপুল প্রাণ-শক্তি, সেই উন্মাদ কলধ্বনি বাঙ্গালীকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। প্রথম জীবনে কবি কাব্য-রচনার গতানুগতিক পন্থা পরিত্যাগ করিয়া পুরাণের সুবিপুল চিত্র-শালা হইতে চিত্র-সংগ্রহ না করিয়া, আধুনিক বাঙ্গলার কলঙ্কের কাহিনী, বাঙ্গালীর বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী, বাঙ্গলার শেষ স্বাধীন নবাবের পতনের কাহিনী লইয়াই কাব্য-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—এ বিষয়ে তাঁহার অলোক-সামান্য প্রতিভা পূর্বগামীদিগের পথচিহ্ন অনুসরণ না করিয়া আপনার পথ আপনি বাছিয়া লইয়াছিল। কবি নবীনচন্দ্র যে যুগে কাব্যসাধনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সে যুগে শিক্ষিত বাঙ্গালী প্রতীচ্যের মোহ হইতে মুক্ত হইয়া অনেকটা

আত্মস্থ হইয়াছে। স্বাজাত্যবোধের আদ্যাচার্য কবি রঙ্গলাল ভারতের অতীত গৌরবের দিকে বাঙ্গালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তাঁহার 'স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে' প্রভৃতি কবিতায় বাঙ্গালী এক নূতন সুর শুনিতে পাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি শিক্ষিত বাঙ্গালীর কাব্যরস-পিপাসা তেমনভাবে চরিতার্থ করিতে পারেন নাই। তারপর কবি হেমচন্দ্রের ভেরী বাজিয়া উঠিয়া বাঙ্গালীর মোহনিদ্রা ভঙ্গ করিয়াছে। তিনি মুখ্যতঃ স্বদেশ-প্রেমের ভিত্তিতে তাঁহার মহাকাব্যের সৌধ গড়িয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু তিনি আমাদের জাতীয় মহাকাব্য মহাভারত হইতেই কাব্যের বিষয়বস্তু আহরণ করিয়াছেন। কাজেই নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধেই' বাঙ্গালী প্রথম সমর-সঙ্গীত শুনিতে পাইল, জাতির জীবনে বিশ্বাসঘাতকতার শোচনীয় পরিণতির চিত্র দেখিতে পাইল, তাহারা এমন একখানি অপূর্ব কাব্যের আস্বাদন লাভ করিল, যেখানে তাহাদের নব-জাগ্রত অথচ অপরিস্ফুট আকাঙ্ক্ষা ভাষা পাইয়াছে। তাই তাহাদের প্রাণ যেন পুলকে নাচিয়া উঠিল। পরবর্তী কালে বঙ্কিমচন্দ্র এই স্বদেশ-প্রেমের আদর্শকে নব্যতান্ত্রিক ধর্মে রূপান্তরিত করিলেন।

আমাদের জাতীয় মহাকাব্য মহাভারতকে বিশাল বনস্পতির সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। বনস্পতির মত এই মহাকাব্যখানিও স্বর্গে ও মর্তে সেতু রচনা করিয়াছে এবং অগণিত পথশ্রান্ত পথিককে বিশ্রামদান করিয়াছে। কবি নবীনচন্দ্র ইহাকে হিমাদ্রির সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। সত্যই রামায়ণ যেন শ্যামল বনানী আর মহাভারত যেন ধ্যানস্তব্ধ গিরিরাজ। উভয় কাব্যই অদৃষ্টবাদের মূলসূত্রে গ্রথিত, কিন্তু এক হিসাবে রামায়ণ বিরোধের আর মহাভারত মিলনের কাব্য। রামায়ণের বিষয়বস্তু আর্য ও অনার্যের বিরোধ, আর মহাভারতের বিষয়বস্তু জ্ঞাতি-বিরোধ হইলেও উহাতে

আর্য ও অনার্য উভয় জাতিই সমান মর্যাদা ও গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এইজন্যই মহাকবি নবীনচন্দ্র মহাভারতের প্রতি বিশেষ-ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। আমরা দেখিতে পাই, উনবিংশ শতাব্দীর দুইজন শ্রেষ্ঠ মনীষী—বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র প্রধানতঃ মহাভারত অবলম্বন করিয়াই মানবধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রামায়ণ বঙ্কিমচন্দ্রকে তেমন ভাবে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই, কেন না, তিনি শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যে আদর্শ মানবতার পরিপূর্ণ স্ফূর্তি দেখিতে পান নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে শ্রীরামচন্দ্র শাক্যসিংহ বা ঈশার চেয়ে পূর্ণতর ও উন্নততর আদর্শ, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রের সহিত তুলনায় তাঁহার চরিত্র ম্লান ও নিষ্প্রভ। এই জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন করিয়া ঐতিহাসিক শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র প্রতিষ্ঠাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার আশা ছিল, শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে মানব-ধর্মের পূর্ণ আদর্শ দেখিতে পাইয়া—শারীরিকী, জ্ঞানার্জনী, কার্যকারিণী ও চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির সম্যক্ স্ফূর্তি দেখিতে পাইয়া তাঁহার স্বদেশবাসী মনুষ্যত্বের সাধনায় উদ্বুদ্ধ হইবে। আর নবীন চন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে দেখিতে পাইয়াছিলেন খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ভারতে অখণ্ড ধর্মরাজ্য-সংস্থাপনের বিপুল প্রয়াস; যে ধর্মের আত্মা তিনি স্বয়ং, বাহুবল ধনঞ্জয়, ও জ্ঞানবল কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন,—তাই তিনি পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা অবলম্বনে 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাস' নামে কাব্যত্রয়ী অথবা তিন খণ্ডে বিভক্ত এক বিরাট মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। রৈবতকের উৎসর্গপত্রে নবীনচন্দ্র লিখিয়াছেন—'মহাভারতের পাঠ সমাপন করিয়া দেখিলাম, ভারতের বিগত বিপ্লবাবলীর তরঙ্গলেখা এখনও সেই শৈল-উপত্যকার সেই শেখরমালার অঙ্কে অঙ্কে অঙ্কিত রহিয়াছে। দেখিলাম, তাহার সানুদেশে, সেই দৃশ্য ভাষাতীত—ভগবান বাসুদেব ঐশিক প্রতিভায় গগন পরিব্যাপ্ত করিয়া

দণ্ডায়মান রহিয়াছেন এবং অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া পতিত ভারতবাসীর —পতিত মানব-জাতির উদ্ধারের পথ দেখাইয়া দিতেছেন। দেখিলাম, পদতলে লুটাইয়া পড়িলাম।'

নবীনচন্দ্র বিশ্বাস করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক জীবনী ও বাণীর মধ্যে শুধু পতিত ভারতবাসীর নয়—মানব-জাতির উদ্ধারের সঙ্কেত নিহিত আছে। তাই তিনি তাঁহার স্বদেশবাসীকে আত্ম-প্রবুদ্ধ ও সনাতন ধর্মের আদর্শে জাগ্রত করিবার জন্য এই 'কাব্যত্রয়ী' রচনা করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ পরিপূর্ণ মানবতার আদর্শ আর নবীনচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ মহাভারতের প্রতিষ্ঠাতা। নবীনচন্দ্রের বিরাট পরিকল্পনা শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়াই সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার মনীষা ও ক্ষুরধার বুদ্ধির সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা প্রমাণ করিয়াছেন, আর নবীনচন্দ্র তাঁহার কবিসুলভ অন্তর্দৃষ্টি ও হৃদয়াবেগের সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র-গৌরব উপলব্ধি করিয়াছেন; তাই শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা নবীনচন্দ্রের কাছে কবি-কল্পনা বা রূপক না হইয়া ভাগবত সত্য হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা 'রৈবতকে' দেখিতে পাই, ব্যাসদেব যখন ভারতে আর্য ও অনার্যের বিরোধ এবং ভারতের শোচনীয় অধোগতির কথা বর্ণনা করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন, তখন দেবকী-নন্দন সমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন ঃ—

> 'হে মাতা ভারতভূমি! সৃজিলা বিধাতা
> মহারাজ্য-উপযোগী করিয়া তোমায়
> তুষার-কিরীট-শীর্ষ বিরাট মূরতি
> অভ্রভেদী হিমাচল বসিয়া শিয়রে,
> প্রসারিত ভুজদ্বয় করি সম্মিলিত

পদতলে কুমারীতে ভীষণ মুষ্টিতে
আপনি ভারতবর্ষ করেন রক্ষণ।
ভীষণ ভুজাগ্রদ্বয়—মহেন্দ্র মলয়,—
তুচ্ছ মানবের কথা, সমুদ্র আপনি
না পারি লঙ্ঘিতে বলে মানি পরাজয়,
দুর্লঙ্ঘ্য প্রাকাররূপে শোভিছে কেমন,
ভারতের পদতল করি প্রক্ষালন।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যচয় করি সম্মিলিত
এই শৈল-প্রাচীরের মধ্যে পুণ্যভূমে
এক মহারাজ্য, প্রভু! হয় না স্থাপিত,—
এক ধর্ম, এক জাতি, এক সিংহাসন?'

ব্যাসদেব বলিলেন—'বড়ই দুরূহ ব্রত!'
তখন ভারতমাতাকে সম্বোধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

'জননী ভারত।
শক্তি-স্বরূপিণী তুমি, শক্তি-প্রসবিনী।
ব্যাসের অনন্ত জ্ঞান, ভুজ অর্জুনের,
তোমার সেবায় মাতঃ। হলে নিয়োজিত,
কোন্ কার্য নাহি পারে হইতে সাধিত?'

নবীনচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম হইলেও সাধারণ মানবের ন্যায় সুখদুঃখের অধীন, তাই তাঁহার চরিত্র আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের অবসানে শ্রীকৃষ্ণ আকাশপানে চাহিয়া ক্ষুব্ধ হৃদয়ে বলিতেছেন—

'মানবের উষ্ণ রক্ত বিনা মানবের পাপ,
মানবের শোক বিনা মানবের পরিতাপ,
না হয় মোচন যদি, মানবের মুক্তিপথ
রক্ত-সিন্ধুগর্ভে যদি, শ্মশানে দাবাগ্নিবৎ;

একই নির্ঘাতে নাথ! একই নিমিষে হায়!
কৃষ্ণের শোণিতে কেন ভাসালে না এ ধরায়?
একই শ্মশানমাত্র করি নাথ! প্রজ্বলিত,
কৃষ্ণের হৃদয় কেন করিলে না সমর্পিত?

'প্রভাসে' আমরা দেখিতে পাই, নর-নারায়ণের জীবনে নিয়তির নির্মম লীলা। যতুবংশ-ধ্বংসে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য নাই,—তিনি শান্ত, স্থির, নির্বিকার। কেন না, তাঁহার জীবনের ব্রত সফল হইয়াছে, মহাভারত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নারায়ণের লীলা-সংবরণের দৃশ্য কবি অতি নিপুণ-ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন।

এই কাব্যত্রয়ীতে দুর্বাসা ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিনিধি ও কূটনীতিজ্ঞ, কিন্তু তাঁহার চরিত্রের দৃপ্ত পৌরুষ ও অনমনীয় দৃঢ়তা আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ না করিয়া পারে না। অন্তকালে দুর্বাসার কঠোর প্রায়শ্চিত্ত ও বিশ্বরূপ-দর্শনের দৃশ্য বড়ই মর্মান্তিক। কিন্তু ইহা শ্রীকৃষ্ণের ধর্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠারই অঙ্গস্বরূপ।

নবীনচন্দ্রের এই কাব্যত্রয়ী যেন চরিত্রর এক বিরাট চিত্রশালা কিন্তু নারীচরিত্র-সৃষ্টিতেই নবীনচন্দ্র বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। নবীনচন্দ্রের নিকট নারী মহাশক্তিস্বরূপিণী, নারীর অন্তরের মহিমা স্মরণ করিয়া কবি যেন শ্রদ্ধায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। সুভদ্রা, উত্তরা, সুলোচনা, শৈলজা—সকলেই যেন অমরীর শ্রীতে মহীয়সী।

নবীনচন্দ্র যে 'মহাভারতের' স্বপ্ন দেখিয়াছেন, সে স্বপ্ন তাঁহার সঙ্গেই মিলাইয়া যায় নাই। রবীন্দ্রনাথের 'ভারত-তীর্থ', 'শিবাজী-উৎসব' প্রভৃতি কবিতায় এবং যতীন্দ্রমোহনের 'মহানন্দমঠ' কবিতায় (মহাভারতী কাব্য) সেই স্বপ্নই রূপ পাইয়াছে। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, নবীনচন্দ্রের মহাকাব্যের পরিসর অতি বিশাল হইলেও ছন্দো-বৈচিত্র্য, স্থানে স্থানে লঘু ভাবের অবতারণা ও ধর্ম-প্রচারে

আগ্রহের আতিশয্য নবীনচন্দ্রের কাব্যত্রয়ীর মহিমাকে অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। প্রচণ্ড ও দুর্বার হৃদয়াবেগের দ্বারা পরিচালিত হইয়া নবীনচন্দ্র অনেক স্থানে মহাকবিজনোচিত সংযম রক্ষা করিতে পারেন নাই। নবীনচন্দ্রের কাব্যত্রয়ীতে চিন্তার সংহতি বা ঐক্য রক্ষিত হয় নাই। বিশেষত, কালানৌচিত্য দোষ 'প্রভাস' কাব্যের একটি প্রধান ত্রুটি বলিয়া গণ্য হইতে পারে। তথাপি এই কাব্যত্রয়ী যে একাধারে নবীনচন্দ্রের জীবন-দর্শন ও তাঁহার কবি-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তাহাতে সন্দেহ নাই।

ধর্ম-সম্বন্ধে নবীনচন্দ্রের মতবাদ অত্যন্ত উদার ও সার্বভৌম ছিল। তিনি সরল পদ্যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন, বাইবেলের সেণ্ট ম্যাথু অবলম্বনে 'খ্রীষ্ট', বুদ্ধদেবের চরিত অবলম্বনে 'অমিতাভ' এবং শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের চরিত অবলম্বনে 'অমৃতাভ' কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর 'আভাসে' অত্যন্ত সরস ও কৌতুকপ্রদ ভঙ্গীতে তিনি গীতা ও চণ্ডীর তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন। 'খ্রীষ্ট' কাব্যের 'সূচনায়' নবীনচন্দ্র লিখিয়াছেন—'কৃষ্ণোক্তি ও খৃষ্টোক্তিতে কিছুই বিভিন্নতা নাই।' তিনি বলিয়াছেন—'ধর্মসংস্থাপনের জন্যই পৃথিবীর ধর্মগুরু সকল যথা শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট, হজরত মহম্মদ ও শ্রীচৈতন্য বিভিন্ন যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অতএব তাঁহারা সকলেই আমাদের নমস্য। আমাদের ধর্মান্ধতা শুধু ভ্রান্তিপ্রসূত'। আমাদের ধর্মান্ধতা উপলক্ষ্য করিয়া নবীনচন্দ্র বলিতেছেন—'অন্ধ জড়বুদ্ধি-সম্পন্ন মানবের এই এক ভ্রান্তিতেই জগৎ আজি পর্যন্ত ধর্মবিদ্বেষে পরিপূর্ণ। এই এক ভ্রান্তিনিবন্ধনই পৃথিবী কতবার নর-শোণিতে প্লাবিত হইতেছে এবং ধর্ম কি ঘোরতর অধর্মে পরিণত হইয়াছে। হায়! ধর্মের প্রকৃত অর্থ কি, মানুষ কি কখনই তাহা বুঝিবে না?' শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভূমিকায় নবীনচন্দ্র লিখিয়াছেন—'অনন্ত জ্ঞানসিন্ধু

মন্থন করিয়া মানবজাতির জন্য পরম ধর্মামৃত বা চরম মনুষ্যত্ব উদ্ভাবন করাই গীতার মুখ্য উদ্দেশ্য।... গীতোপদিষ্ট সেই চরম মনুষ্যত্বের নাম—নিষ্কামধর্ম। এই নিষ্কামত্ব বা কামনার নির্বাণই বৌদ্ধ ধর্মের নির্বাণ।' সুতরাং আমরা দেখিতেছি, নবীনচন্দ্র কাব্যের মধ্য দিয়া সর্বধর্মসমন্বয়ের মহান আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। প্রতীচ্য-দর্শনের সঙ্গে নবীনচন্দ্রের পরিচয় ছিল, কিন্তু হার্বার্ট স্পেন্সারের অজ্ঞেয়বাদ তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। বেন্থাম্ ও জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের হিতবাদ এবং অগাষ্ট কোম্‌তের মানবতাবাদ যে তাঁহার চিন্তাকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল, তাঁহার কাব্যসমূহে তাহার প্রমাণ আছে। কিন্তু তিনি যে লোকহিত বা মানব-কল্যাণের আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন, উহা সম্পূর্ণ বিজাতীয় নহে, উহা গীতোক্ত ধর্মের সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু একদিন যে 'জীবে দয়া'র আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন, ইহা সেই আদর্শেরই পুনরাবৃত্তি মাত্র। নবীনচন্দ্র যে ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, সর্বভূতহিতের উপরেই তাহার প্রতিষ্ঠা। নবীনচন্দ্র বলিয়াছেন—'সত্যই ইহার প্রাণ, মনুষ্যত্ব ইহার লক্ষ্য। মনস্বী মানবমাত্রই ইহার শিক্ষক, সর্ব অবস্থার মানবই ইহার অধিকারী।' নবীনচন্দ্রের এই ধর্মতত্ত্বের সহিত বঙ্কিমচন্দ্র-ব্যাখ্যাত ধর্মতত্ত্ব বা অনুশীলনতত্ত্বের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় নবীনচন্দ্রও পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেই ধর্মের পরিপূর্ণ স্ফূর্তি দেখিতে পাইয়াছিলেন। নবীনচন্দ্র লিখিয়াছেন —'ভগাবন্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ঐশ্বরিক সম্পদে পঞ্চসহস্র বর্ষ পূর্বে জ্ঞানের সরস্বতী, ভক্তির যমুনা এবং ধর্মের ভাগীরথী সম্মিলিত করিয়া ভারতীয় বা জাতীয়কর্মের মহাপ্রয়াগতীর্থে নবধর্ম স্থাপন করিয়া যান'। বাস্তবিক, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে হিন্দুধর্মের যে নব জাগৃতি ঘটিয়াছিল, এবং শ্রীকৃষ্ণকথিত ধর্মতত্ত্ব যে শিক্ষিত বাঙ্গালীকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়াছিল, তাহার মূলে ছিল বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের মনীষা ও অক্লান্ত সাধনা।

নবীনচন্দ্রের প্রসিদ্ধ কাব্যসমূহের নামকরণের একটি বৈশিষ্ট্য সহজেই আমাদের চোখে পড়ে। আমাদের দেশের প্রচলিত প্রথানুসারে তিনি নায়ক বা নায়িকার নামানুসারে ঐ সকল কাব্যের নামকরণ করেন নাই, কোন যুদ্ধক্ষেত্র, পুণ্যতীর্থ বা পর্বতের নামানুসারেই তিনি কাব্যের নামকরণ করিয়াছেন, যথা "পলাশির যুদ্ধ" (১৮৭৫), "রৈবতক" (১৮৮৭), "কুরুক্ষেত্র" (১৮৯৩) ও "প্রভাস" (১৮৯৬) ; আবার 'রঙ্গমতী' কাব্যটির সঙ্গে রাঙ্গামাটির নাম-সাদৃশ্য ও উপেক্ষণীয় নহে। আমরা যে পলাশির যুদ্ধ ও কাব্যত্রয়ীর উল্লেখ করিলাম, উহাদের মধ্যে নবীনচন্দ্রের চিন্তাধারার ক্রম-পরিণতি লক্ষ্য করিতে পারি। "পলাশির যুদ্ধ"-এ কবির দৃষ্টি প্রধানত বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতির প্রতি নিবদ্ধ, পলাশির রণাঙ্গনে বাঙালীর ভাগ্য-বিপর্যয় তাঁহার কাব্যের বিষয়-বস্তু। সিরাজের চরিত্র কবি মসীবর্ণে চিত্রিত করিলেও মন্ত্রণাগৃহে রানী ভবানীর উক্তি ও সমরক্ষেত্রে মোহনলালের বিলাপের মধ্য দিয়া কবি তাঁহার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি যে স্থানে স্থানে স্বজাতিকে বিদ্রূপের কশাঘাতে জর্জরিত করিয়াছেন, উহারও মূলে রহিয়াছে গভীর স্বজাতি-প্রেম। কৃষ্ণচন্দ্রের মন্ত্রীর মুখে যখন শুনিতে পা —

"সহজে দুর্বল মোরা চির পরাধীন"।

অথবা জগৎশেঠের মুখে যখন শুনি—

"স্বর্গ-মর্ত্য করে যদি স্থান-বিনিময়,
তথাপি বাঙালী নাহি হবে এক মত ;
প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু, সাহসে দুর্জয়।
কার্যকালে খোঁজে সব নিজ নিজ পথ।"

তখন আমরা বুঝিতে পারি, কবির বাঙালী-প্রীতি কত গভীর ছিল। রবীন্দ্রনাথের "দুরন্ত আশা" কবিতাটির এবং এই সকল উক্তির মূল-প্রেরণা অভিন্ন।

অবশ্য "পলাশির যুদ্ধ" রচনার কালেও কবির দৃষ্টি কখনও কখনও ভারতের দিকে নিবদ্ধ হইয়াছে। মোহনলালের বিলাপে আমরা শুনিতে পাই—

"নিতান্ত কি দিনমণি! ডুবিলে এবার!
ডুবাইয়া বঙ্গ আজি শোকসিন্ধু জলে?
যাও তবে! যাও দেব! কি বলিব আর?
ফিরিও না পুনঃ বঙ্গ-উদয়-অচলে॥
কি কাজ বল না আহা! ফিরিয়া আবার?
ভারতে আলোক কিছু নাহি প্রয়োজন।
আজীবন কারাগারে বসতি যাহার,
আলোক তাহার পক্ষে লজ্জার কারণ।
কালি পূর্বাশার দ্বার খুলিবে যখন,
ভারত নবীন দৃশ্য করিবে দর্শন।"

কিন্তু কাব্যত্রয়ীতে নবীনচন্দ্র অখণ্ড ভারতের স্বপ্নদ্রষ্টা;— "পলাশির যুদ্ধ" যদি জাতিবৈরের কাব্য হয়, তবে "রৈবতক", "কুরুক্ষেত্র" ও "প্রভাস" জাতিতে জাতিতে মৈত্রীবন্ধন বা সংস্কৃতি-সমন্বয়ের মহাকাব্য। এই কাব্যত্রয়ীতে অখণ্ড ভারতের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রাহ্মণ্যশক্তির প্রতিনিধি দুর্বাসার যে বিরোধের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা কবির স্বকপোলকল্পিত, কিন্তু আমরা বলিয়াছি, দুর্বাসার চরিত্র যতই হীনরূপে চিত্রিত হউক না কেন, তাঁহার চরিত্রের অনমনীয় দৃঢ়তা আমাদিগকে মুগ্ধ করে। নবীনচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি যতখানি মৌলিক, ভাব-কল্পনা যতটা বিরাট, তদনুরূপ সাহিত্যিক সিদ্ধি তিনি লাভ না করিলেও তাঁহার কাব্যত্রয়ীর বহু

স্থানে স্বত-উৎসারিত কবিত্ব-শক্তির পরিচয় রহিয়াছে। আর এ-কথাও সত্য যে, কাব্যত্রয়ীতে কবির দৃষ্টি শুধু ভারতবর্ষ নহে, ভারতের বাহিরেও প্রসারিত হইয়াছে এবং এই উদার সার্বভৌম দৃষ্টির মূলে আছে শ্রীকৃষ্ণেরই শিক্ষা। শ্রীকৃষ্ণের সেই বাণী "সম্ভবামি যুগে যুগে" কবির মনে এক প্রশ্ন জাগাইয়াছে। ধর্মসংস্থাপনার্থায় যিনি যুগে যুগে সম্ভূত হন, তিনি কি দেশে দেশে সম্ভূত হন না? তিনি কি শুধু ভারতবর্ষেই অবতীর্ণ হইবেন? এমন ত কখনও হইতে পারে না। এইরূপ জিজ্ঞাসার ফলে যে-সত্য তাঁহার অন্তরে প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহা তাঁহারই ভাষায় একটু পরিবর্তিত রূপে বলিতে গেলে বলিতে হয়—

"যেখানে যেখানে ঘটে ধর্মের গ্লানি,
অধর্মের অভ্যুত্থান, আপনারে আমি
করিহে সৃজন! সাধুদের পরিত্রাণ,
বিনাশ দুষ্কৃতদের, করিতে সাধন;
স্থাপন করিতে ধর্ম করি আমি
দেশে দেশে জনম-গ্রহণ।"

ভগবান যে শুধু যুগে যুগে নয়, দেশে দেশেও আবির্ভূত হন, একথা "অমিতাভ" ও "প্রভাস"-এর উপসংহারে কবি সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন। কবি বলরামের দেহত্যাগের যে অভিনব ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহাও আমাদের নিকট কৌতূহলোদ্দীপক।

নবীনচন্দ্রই সম্ভবত আমাদের দেশে প্রথম কবি, যিনি কাব্যের মধ্য দিয়া মানবজাতির ঐক্য ও পৃথিবীর অখণ্ডত্বের (oneness) কথা প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টিতে বেদ, ব্রাহ্মণ ও যজ্ঞ এক অভিনব তাৎপর্য লাভ করিয়াছে। অবশ্য ইহারও মূলে অনেকটা পরিমাণে রহিয়াছে গীতার শিক্ষা। অখণ্ড ভারতের স্বপ্নদ্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণের মুখে আমরা শুনিতে পাই—"মহাবিশ্বই বেদ, মানবহৃদয়ই

ব্রাহ্মণ, স্বধর্মসাধনাই মহাযজ্ঞ আর নারায়ণই যজ্ঞেশ্বর।" নবীনচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ যে-ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা, সে-ধর্ম এইরূপ উদার ও সার্বভৌম। অবশ্য, নবীনচন্দ্র এক্ষেত্রে একক নহেন, তিনি যে একজন যুগ-প্রতিনিধি সে-কথা ত বিস্মৃত হইলে চলিবে না। তাহা ছাড়া এরূপ উদার বাণী ত ভারতবর্ষ যুগে যুগেই প্রচার করিয়াছে।

ভক্ত ও ভাবুক নবীনচন্দ্র শুধু মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণকেই গ্রহণ করেন নাই, তিনি ভাগবত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের শ্রীকৃষ্ণকেও গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য কাব্যত্রয়ীতেও শেষ পর্যন্ত বাঙালী নবীনচন্দ্রেরই জয় হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে নাম-সংকীর্তনকে যুগধর্ম বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, সেই সংকীর্তনের স্রোতে যেন "প্রভাস" কাব্যখানি মুখর হইয়া উঠিয়াছে। আলঙ্কারিক বিচারে অবশ্য এখানে ঔচিত্যের হানি ঘটিয়াছে। নবীনচন্দ্র বিচার-বিশ্লেষণের সাহায্যে সমন্বয়বাদ স্থাপন করেন নাই, অন্তরের সহজ প্রেরণাতেই তিনি বিভিন্ন ভাবাদর্শের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করিয়াছেন। নবীনচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ নর-নারায়ণ, ডিভাইন পার্সন কিন্তু তাঁহার ডিভিনিটি বা দেবত্বের চেয়ে মানবিকতার দিকটাই কবিকে বেশী আকর্ষণ করিয়াছে। আমরা মহাভারতে একটি বিশেষ অর্থে নর-নারায়ণ কথাটির প্রয়োগ দেখিতে পাই, সেখানে নর-নারায়ণ বলিতে বোঝায় নর ও নারায়ণ নামক ঋষিদ্বয়, ইঁহারাই পরজন্মে অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; কিন্তু নবীনচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ একাধারে নর ও নারায়ণ, গড-ম্যান। উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দের শ্রীকৃষ্ণ কর্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির আদর্শের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করিয়াছেন,—উপাধ্যায় মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবতকে গীতার পরিপূরক গ্রন্থ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্মের উপর নূতন আলোকপাত করিয়াছেন। তিনি বর্জন করেন নাই, গ্রহণ করিয়াছেন, সমন্বয় স্থাপন করিয়াছেন, ব্যাখ্যা

করিয়াছেন। একথা অবশ্য স্মরণীয় যে, বঙ্কিমচন্দ্রের "কৃষ্ণচরিত্র" প্রকাশিত হইবার প্রায় সাত বৎসর পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম "ধর্মতত্ত্ব"-এ প্রকাশিত হইতে থাকে। উপাধ্যায় মহাশয় নানা শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত হইলেও আচার্য কেশবচন্দ্রের অনুগামী হইয়া শ্রীকৃষ্ণচরিত আলোচনা করেন। ইহার পর, বঙ্কিমচন্দ্র অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ পুরুষরূপে প্রতিপন্ন করেন। তারপর নবীনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ও অখণ্ড ভারতের স্থাপয়িতা মহামানবরূপে আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করেন। অবশ্য গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়ের গ্রন্থ এখন দুষ্প্রাপ্য, কিন্তু নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও মনীষী গৌরগোবিন্দ রায়ের দৃষ্টিভঙ্গির সহিত স্বদেশপ্রেমিক ও মানব-প্রেমিক কবি নবীনচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গির সাদৃশ্য ও পার্থক্যের আলোচনা বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে স্থানলাভের যোগ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আজও রচিত হয় নাই। গৌরগোবিন্দ ও নবীনচন্দ্র উভয়েই ভক্ত ছিলেন, তবে একজন শাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া ও অন্যজন দিব্যদৃষ্টির প্রভাবে সত্যে উপনীত হইয়াছেন। "রৈবতক"-এর উৎসর্গ-পত্রে ও "প্রভাস"-এর উপসংহারে ভক্ত নবীনচন্দ্রের পরিচয়টি অতিশয় সুস্পষ্ট। "রৈবতক"-এর উৎসর্গ-পত্রে কবি যাহা লিখিয়াছেন, তাহার ভাষা আবেগময়ী, ভক্ত-হৃদয় হইতে স্বতঃ-উৎসারিতা।

তথাপি, এ-কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, ভক্ত নবীনচন্দ্র প্রধানত বাঙালী, তান্ত্রিক বাঙালী ও বৈষ্ণব বাঙালী। "শবসাধন"-এর কবি নিঃসন্দেহে তান্ত্রিক, "পলাশির যুদ্ধ"-এর কবিও হয়ত তান্ত্রিক, কিন্তু "অমৃতাভ" ও "প্রভাস"-এর কবি শ্রীচৈতন্যের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। সুমেধাগণ সংকীর্তনযজ্ঞে ভগবানের আরাধনা করেন, এই প্রত্যয় কবি লাভ করিয়াছিলেন,

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মেরও ইহাই শিক্ষা। আরও কিছু দিন জীবিত থাকিলে কবি হয়ত বৈষ্ণবীয় রসসাধনার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া উপলব্ধি করিতেন—"রসো বৈ সঃ", ভগবান সত্যই রসস্বরূপ, কিন্তু মানুষী ভাষায় তাঁহার মাধুর্যের বর্ণনা করা চলে না, শুধু বলা চলে—"মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্।"

বিহারীলাল ও বাংলার গীতি কাব্য

(১৮৩৫-৯৪)

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই এমন দুই একজন কবি জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহারা দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিকত্ব ও ভাব-কল্পনার অভিনবত্ব সত্ত্বেও কাব্য-সাধনার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন না। তাঁহারা নূতন যুগের প্রবর্তক হইলেও যুগস্রষ্টার মর্যাদা দাবী করিতে পারেন না। বাংলার কাব্যসাহিত্যে বিহারীলাল এই শ্রেণীর কবি। উনিশ শতকের বাংলায় তাঁহার আবির্ভাব অনেকটা আকস্মিক, অভাবনীয় ও অপ্রত্যাশিত।

বিহারীলাল কবিযশঃপ্রার্থী ছিলেন না এবং কবিযশ তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। অথচ এক হিসাবে তিনি সৌভাগ্যবান। যে মুষ্টিমেয় গুণমুগ্ধ ভক্ত তিনি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা অনেকেই বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্মরণীয় ও বরণীয় পুরুষ। বিশ্বের বরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ যাঁহাকে সাহিত্য-গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, কবি ও নিবন্ধকার মনস্বী দ্বিজেন্দ্রনাথ যাঁহার সম্পর্কে বলিয়াছেন— 'তাঁহার রচনা তাঁহাকে যত বড় কবি বলিয়া পরিচয় দেয়, তিনি তাহা অপেক্ষাও অনেক বড় কবি ছিলেন', 'এষা', 'শঙ্খ' প্রভৃতি কাব্যের রচয়িতা অক্ষয়কুমার বড়াল ও 'মহিলা' কাব্যের রচয়িতা সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার যাঁহার কাব্যরস আস্বাদন করিয়া ধন্য হইয়াছেন, এবং কাব্যসাধনার ক্ষেত্রে যাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি যে ভাগ্যবান কবি, তাহাতে সন্দেহ নাই।

উনবিংশ শতাব্দীর যে কয়েক জন কবিকে 'নব জাগরণের' কবি বলা যায় এবং যাঁহাদের মধ্যে তদানীন্তন শিক্ষিত বাঙ্গালীর আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হইয়াছিল, বিহারীলালের কবিমানস

ছিল তাঁহাদের চেয়ে স্বতন্ত্র ধাতুতে গড়া। তিনি কোনদিন মহাকাব্য-রচনার প্রয়াস করেন নাই, ভারতের অতীত ইতিহাসের কোন গৌরবময় অধ্যায় অবলম্বনে খণ্ডকাব্য-রচনারও প্রচেষ্টা করেন নাই, পরাভবের মধ্যেও দুরাধর্ষ বা পরাক্রান্ত মানুষের যে দৃপ্ত পুরুষ-মহিমা, মধুসূদনের মত উহার জয়গান করেন নাই, হেমচন্দ্রের মত স্বদেশের জন্য আত্মোৎসর্গের আদর্শ প্রচার করেন নাই অথবা নবীনচন্দ্রের মত অখণ্ড ভারতের বা মানবজাতির ঐক্যের আদর্শ স্থাপন করেন নাই। এই জন্যই তাঁহার কবি-প্রতিভার দিকে সে যুগের পাঠকগণের দৃষ্টি বড় একটা আকৃষ্ট হয় নাই।

প্রতিভার অর্থ যদি হয় দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিকতা ও প্রকাশভঙ্গির স্বকীয়তা, তবে বিহারীলাল নিঃসন্দেহে প্রতিভাধর পুরুষ। তথাপি, এ কথা সত্য যে মধুসূদনের ন্যায় নব-নব-উন্মেষশালিনী বুদ্ধি বিহারীলালের ছিল না। যে গীতি-কবিতা বিহারীলালের একমাত্র বিচরণভূমি ছিল, উহাতে তিনি নূতন সুরের প্রবর্তন করিয়াছিলেন কিন্তু উহাকে সর্বত্র রসঘন বা শ্রবণ-সুভগ করিয়া তুলিতে পারেন নাই। সেজন্য রবীন্দ্রনাথের ন্যায় অলোকসামান্য দৈবী প্রতিভার প্রয়োজন হইয়াছিল।

বিহারীলালের দেহত্যাগের পর অক্ষয়কুমার বড়াল তাঁহার স্মৃতি-তর্পণ-উপলক্ষ্যে বলিয়াছেন—

'নহে কোন ধনী, নহে কোন বীর,
নহে কোন কর্ম্মী, গর্ব্বোন্নত শির,
কোন মহারাজ নহে পৃথিবীর,
নাহি প্রতিমূর্ত্তি ছবি;
তবু কাঁদ কাঁদ—জনম-ভূমির
সে এক দরিদ্র কবি।

এসেছিল শুধু গায়িতে প্রভাতী,
না ফুটিতে উষা, না পোহাতে রাতি,—
আঁধারে আলোকে, প্রেমে মোহে গাঁথি
কুহরিল ধীরে ধীরে ;
ঘুমঘোরে প্রাণী, ভাবি স্বপ্ন-বাণী
ঘুমাইল পার্শ্ব ফিরে'।

সংসারে কোন শ্রেষ্ঠ কবির সৃষ্টিই সম্পূর্ণ মৌলিক নহে, প্রাক্তন কবি বা সূরিগণের নিকট হইতে যে উপকরণ তাঁহারা সংগ্রহ করেন, তাহার দ্বারাই নূতন সৌধ নির্মাণ করেন। বিহারীলালও বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি ভারতীয় কবিগণের এবং বায়রণ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি, কীটস প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য কবিগণের কাব্যোত্থান হইতে কুসুম আহরণ করিয়া অভিনব মাল্যসমূহ গ্রথিত করিয়াছেন।

গীতিকবিতার ক্ষেত্রে বিহারীলালের মৌলিকতা কোথায় এবং কতখানি, তাহা আমাদের বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। অক্ষয় কুমারের ন্যায় রবীন্দ্রনাথও বিহারীহালকে 'ভোরের পাখীর' সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। কিন্তু সেই বিহগের কণ্ঠে যে গান ধ্বনিত হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে অশ্রুতপূর্ব্ব ছিল কিনা, তাহাও আমাদের বিবেচ্য।

আমাদের প্রাচীন অলঙ্কার-শাস্ত্রে মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, চম্পু প্রভৃতি শ্রেণিবিভাগ স্বীকৃত হইলেও গীতি-কবিতা নামে একটি স্বতন্ত্র শ্রেণি স্বীকৃত হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে গীতি-কবিতার একান্ত অভাব নাই। মহাকবি কালিদাসের 'ঋতুসংহার' ও 'মেঘদূত' এবং মেঘদূতের অনুসরণে রচিত অজস্র দূতকাব্য, বিল্বমঙ্গলের শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, জয়দেবের গীতগোবিন্দ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গীতি-কবিতার নিদর্শন।

মধ্যযুগে শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির কাব্যোদ্যান অজস্র 'গীতি-কবির' কলকণ্ঠে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। গীতি-কবিতা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং আধুনিক গীতি-কবিতায়ও উহাদের প্রভাব অসামান্য। কিন্তু রাধাকৃষ্ণের প্রেম-লীলা বৈষ্ণব পদকর্তাগণের উপজীব্য হওয়াতে তাঁহাদের একান্ত ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ বা আনন্দ-বেদনা, ধ্যান-ধারণা বা ভাবনা-কল্পনা বৈষ্ণব কবিতায় স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ লাভ করে নাই। বৈষ্ণব কবিগণ বিশিষ্ট সাধনা ও ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হওয়াতে তাঁহাদের অনুভূতিও একান্ত ব্যক্তিগত না হইয়া সম্প্রদায়গত বা গোষ্ঠীগত হইয়াছে। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণের গান সম্পর্কেও এই উক্তিগুলি প্রযোজ্য। অবশ্য প্রাচীন যুগে সকল দেশেই গীতি-কবিতা ছিল সেই শ্রেণীর কবিতা যাহা সুরতাল-সংযোগে বাদ্যযন্ত্র-সহকারে গীত হইত (Lyric কথাটির ব্যুৎপত্তি স্মরণীয়),। কিন্তু আধুনিক কালে গীতি-কবিতা বলিতে আমরা বুঝি সেই জাতীয় কবিতা যাহাতে কবি আপনার ব্যক্তিগত অনুভূতিকে রসরূপ দান করিয়া ক্ষণিকের হৃদয়স্পন্দনকে শাশ্বত করিয়া তোলেন। কিন্তু এযুগের গীতি-কবিতায়ও সংগীতের মত ব্যঞ্জনা থাকে বলিয়া উহাতে গানের রস আস্বাদন করা যায়। আধুনিক কালে মধুসূদন চতুর্দশপদী কবিতাবলী রচনা করিয়া এই শ্রেণীর গীতি-কবিতার সূত্রপাত করিয়াছেন। (বিহারীলালের আলোচনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এই কথাটি স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু মধুসূদনের রচনার প্রতি সুবিচার করেন নাই।) মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা কাব্যের কথা এখানে বলিব না, কারণ, কাব্যখানি গীতি-রসোচ্ছল কবিতার সমষ্টি হইলেও এবং উহাতে ছন্দের বৈচিত্র্য থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের জন্য বিরহিণী ও বিদ্রোহিণী রাধার ব্যাকুলতাই কাব্যখানির প্রধান উপজীব্য, সুতরাং কবির ব্যক্তিগত অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ উহাতে ঘটে নাই।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে মধুসূদনের পরে যাঁহারা বাংলা ভাষায় উৎকৃষ্ট গীতি-কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও মহিলা কবি কামিনী রায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হেমচন্দ্রের 'অশোক তরু', 'যমুনা-তটে', 'হতাশের আক্ষেপ', 'প্রিয়তমার প্রতি' প্রভৃতি কবিতার আন্তরিকতা আমাদিগকে মুগ্ধ করে। নবীনচন্দ্রের প্রতিভা তো গীতি কাব্য-রচনারই সবিশেষ উপযোগিনী ছিল। তাঁহার হৃদয়াবেগ ছিল প্রচণ্ড, ভাষা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। তাই নানা দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও তিনি কয়েকটি উৎকৃষ্ট গীতি-কবিতা রচনা করিয়াছেন। (অবকাশরঞ্জিনী দ্রষ্টব্য)। শুধু নবীনচন্দ্রের কবিতা নয়, তাঁহার 'প্রবাসের পত্র' প্রভৃতি গদ্য রচনাও 'লিরিকধর্মী', উহাতে আমরা কবি-হৃদয়ের উচ্ছ্বাস শ্রবণ করি। মহিলা-কবি কামিনী রায়ের শ্রেষ্ঠ কবিকৃতি 'আলো ও ছায়া'তেও বাংলার গীতি-কবিতা এক অপরূপ মাধুর্য, স্নিগ্ধতা ও কমনীয়তা লাভ করিয়াছে। সুতরাং, বাংলার গীতি-কবিতায় বিহারীলাল কোন্ নূতন ধারার প্রবর্তন করিয়াছেন, তাহা আমাদের বিশেষভাবে আলোচনা করা কর্তব্য।

কেহ কেহ বিহারীলালকে ঋষি কবি আখ্যা দিয়াছেন। যাঁহারা মন্ত্রদ্রষ্টা বা সত্যদ্রষ্টা, যাঁহাদের অনুভূতি অপরোক্ষ, তাঁহাদিগকেই আমরা ঋষি বলিয়া থাকি। ঋষিগণের দৃষ্টি যেমন স্বচ্ছ, প্রকাশভঙ্গিও তেমনই সুস্পষ্ট, যেখানে ঋষির ভাষা কুহেলিকাচ্ছন্ন, সেখানে বুঝিতে হইবে, অনুভূতির অস্পষ্টতার জন্য তাঁহারা 'আলো-আঁধারি ভাষার' ব্যবহার করেন নাই। বিহারীলাল সত্যদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন কিনা, আমরা জানি না, কিন্তু তিনি যখন ধ্যানে ও প্রেমে তন্ময় হইয়া আপন মনে গাহিতেন, যখন তাঁহার কণ্ঠ হইতে অজস্র সংগীত উৎসারিত হইত, তখন বাহিরের প্রসাধন-কলার দিকে তাঁহার লক্ষ্য থাকিত না এবং বিশ্বের সীমাহীন রহস্যের মধ্যে তিনি যেন নিলীন

হইয়া যাইতেন। বুদ্ধির দ্বারা তিনি সে রহস্যের যবনিকা অপসারণ করিতে চাহেন নাই, তিনি বলিয়াছেন—

'না বুঝিয়া থাকা ভাল,
বুঝিলেই নেবে আলো,
সে মহা প্রলয় পথে ভুলে কভু যাব না।'

(সাধের আসন)

ক্রান্তদর্শী কবিগণ ও তত্ত্বদর্শী যোগিগণ তাঁহাকে যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, কবিও সেই দৃষ্টিতে দেখিতে চাহেন—

'কবিরা দেখেছে তাঁরে নেশার নয়নে।
যোগীরা দেখেছে তাঁরে যোগের সাধনে'॥

(সাধের আসন)

আমরা মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেখিতে পাই,—যিনি অতি সৌম্যা ও অতিরৌদ্রা, যে দেবী সর্ব্বভূতে চেতনারূপে, বুদ্ধিরূপে, নিদ্রারূপে, ক্ষুধারূপে, ছায়ারূপে, শক্তিরূপে, তৃষ্ণারূপে, ক্ষমারূপে, জাতিরূপে, লজ্জারূপে, শান্তিরূপে, শ্রদ্ধারূপে, কান্তিরূপে, লক্ষ্মীরূপে, বৃত্তিরূপে, স্মৃতিরূপে, দয়ারূপে, সন্তোষরূপে, মাতৃরূপে ও ভ্রান্তিরূপে সংস্থিতা, সেই বিশ্বব্যাপিনী মহাশক্তিকে দেবতারা নমস্কার করিতেছেন। এই মহাশক্তি যে শুধু সৌম্যা নহেন, রুদ্রাও বটেন, সে কথা বিহারীলাল বিস্মৃত হন নাই, কিন্তু সমগ্র বিশ্বে তাঁহার যে লীলা-বিলাস, উহাই যেন কবিকে আত্মহারা করিয়াছে। এই মহাশক্তিই সাংখ্য দর্শনের ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, বেদান্ত দর্শনের অঘটনঘটনপটীয়সী মায়া, শক্তি-সাধকগণের ভবভয়হারিণী জননী। তিনিই সম্পদ ও কল্যাণের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী এবং পরা ও অপরা বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী। এই সরস্বতীই কবির চক্ষে সারদা, কেননা, তিনিই ভক্তজনকে সার বস্তু দান করেন। কিন্তু কবি শুধু সারদার আরাধনা করিয়া তৃপ্ত নহেন, তিনি তাঁহার সহিত

রসের সম্পর্ক স্থাপন করিয়া প্রেমের লুকোচুরি খেলিতে চাহেন, যে দেবী সকল কাব্য-প্রেরণার উৎস, তিনি যে কবির মানসী ও প্রেয়সীও বটেন। সারদা বা সরস্বতী সম্পর্কে কবির এই দৃষ্টিভঙ্গি অভিনব,—প্রাচীন কবিগণের সর্ব্বশুক্লা নিঃশেষজাড্যাপহা সরস্বতী এবং শ্রীমধুসূদনের 'অমৃতভাষিণী দেবী'ই কবি বিহারীলালের 'চির-আনন্দময়ী বিষাদিনী সারদা', কবির ভাষায় 'মানসমরালী মম আনন্দরূপিণী'; 'সরস্বতীর সহিত প্রেম, বিরহ ও মিলনই' কবির 'সারদা-মঙ্গল' কাব্যের প্রধান উপজীব্য। বিহারীলাল কল্পনাবিলাসী আকাশচারী কবি, তিনি স্থিতধী বা স্থিতপ্রজ্ঞ না হইলেও আত্ম-সমাহিত। তবে তাঁহাকে ঋষি কবি না বলিয়া রহস্যবাদী বা অলোকপন্থী কবি বলাই বরং সঙ্গত। এই দিক দিয়া তিনি ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি, ব্লেক প্রভৃতির সমানধর্মা। কিন্তু এ কথাও ভুলিলে চলিবে না যে, বিহারীলাল ভারতীয় সাধনা ও সংস্কৃতিরও উত্তরাধিকারী আর ভারতবর্ষেও অলোকপন্থী বা মিষ্টিক কবির অভাব নাই। কোন সম্ভ্রান্ত সীমন্তিনীর প্রশ্নের উত্তরে বিহারীলাল যখন বলেন—

'ধেয়াই কাহারে, দেবি! নিজে আমি জানিনে।
কবি-গুরু বাল্মীকির ধ্যানধনে চিনিনে।
মধুর মাধুরী বালা,
কি উদার করে খেলা!
অতি অপরূপ রূপ!
কেবল হৃদয়ে দেখি, দেখাইতে পারিনে'।

(সাধের আসন)

তখন তাঁহার ভাষাও যেন 'মিষ্টিক' কবিগণের ভাষার মত 'আলো-আঁধারে' ঘেরা বলিয়া মনে হয়। কিন্তু কবি যখন বলেন—

'প্রত্যক্ষে বিরাজমান,
সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠান,
তুমি বিশ্বময়ী কান্তি, দীপ্তি অনুপমা ;
কবির যোগীর ধ্যান,
ভোলা প্রেমিকের প্রাণ,
মানব-মনের তুমি উদার সুষমা।'

(সাধের আসন)

তখন কবির অনুভূতি যেন অনেকটা স্পষ্ট হইয়া উঠে।

'সারদা-মঙ্গলে' বিহারীলাল বাল্মীকির কবিত্ব-লাভের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। নিষ্ঠুর নিষাদের শরে ক্রৌঞ্চ যখন নিহত হয়, তখন ক্রৌঞ্চীর বেদনায় মহর্ষির অন্তরে শোকের সঞ্চার হইল, আর অমনি—

'সহসা ললাট ভাগে
জ্যোতির্ম্ময়ী কন্যা জাগে
জাগিল বিজলী যেন নীল নবঘনে'।

(সারদা-মঙ্গল)

'ভাষা ও ছন্দে' রবীন্দ্রনাথ এই ভাবটি প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহার অননুকরণীয় ভঙ্গিতে, 'বাণীর বিদ্যুদ্দীপ্ত-ছন্দোবাণ-বিদ্ধ বাল্মীকিরে' পংক্তিটি তুলনীয়। রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি-প্রতিভায়'ও সারদা-মঙ্গলের এই অংশের প্রভাব যে বিপুল, সমালোচকেরা তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।

বাল্মীকির ললাটে যে জ্যোতির্ম্ময়ী কন্যার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, তিনিই কবির আরাধ্যা দেবী, তাঁহাকে অন্তরের অনুরাগ অর্পণ করিয়াছেন বলিয়াই পৃথিবী কবির নিকট সৌন্দর্য-নিকেতন বলিয়া মনে হয়।

'তোমারে হৃদয়ে রাখি—
সদানন্দ মনে থাকি,
শ্মশান অমরাবতী দু-ই ভাল লাগে,
গিরিমালা, কুঞ্জবন,
গৃহ, নাট-নিকেতন,
যখন যেখানে যাই, যাও আগে আগে'।

(সারদা-মঙ্গল)

কিন্তু এই সারদার বিরহে নিখিল বিশ্ব কবির নিকট শূন্যময়, কবি তখন তাঁহার হৃদয়েশ্বরীকে সম্বোধন করিয়া বলেন—

'হে সারদে, দাও দেখা !
বাঁচিতে পারি না একা
কাতর হয়েছে প্রাণ, কাতর হৃদয় ;
কি বলেছি অভিমানে—
শুনো না শুনো না কানে,
বেদনা দিও না প্রাণে ব্যথার সময় !'

(সারদা-মঙ্গল)

মানস-লক্ষ্মীর সঙ্গে বিহারীলালের এই যে প্রেম, 'ইহা সত্যই বাংলা সাহিত্যে অভিনব। বিহারীলালের এই 'সারদাই' যে রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-দেবতা' বা 'মানস-সুন্দরী,' আবার তিনিই যে রবীন্দ্রনাথের 'মোহিনী, নিষ্ঠুরা, রক্তলোভাতুরা কঠোরা স্বামিনী' সে সম্পর্কে প্রাক্তন সমালোচকেরা বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের আস্বাদন যেমন বিচিত্র, প্রকাশ-ভঙ্গিও তেমনি বৈচিত্র্যময়ী, কেননা, তাঁহার বুদ্ধি নব-নব-উন্মেষ-শালিনী।

বিহারীলাল বাংলা সাহিত্যে 'রোমান্টিক' প্রেম-গীতির প্রবর্তক না হইলেও তাঁহার কবিচিত্ত হইতে এইরূপ কবিতা অজস্র ধারে

উৎসারিত হইয়াছে। তিনি বৈষ্ণব কবিগণের মত রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেমলীলার বর্ণনা করেন নাই, আবার প্রেম-পদ্মফুল যে দেহমূল আশ্রয় করিয়াই প্রস্ফুটিত হয়, এই সহজ সত্যকে মানিয়া লইলেও যে প্রেম একান্ত ভাবে দেহবদ্ধ, সেই বাসনামলিন প্রেমের প্রশস্তি রচনা করেন নাই। বিহারীলালের চোখে এই মর্ত্যধর্মী পৃথিবীতে প্রেমই একমাত্র মৃত্যুঞ্জয়ী সুধা, প্রেয়সীকে সম্বোধন করিয়া বিহারীলাল বলিতেছেন—

'তোমার পবিত্র কায়া,
প্রাণেতে পড়েছে ছায়া,
মনেতে জন্মেছে মায়া, ভালবেসে সুখী হই।
ভালবাসি নারীনরে,
ভালবাসি চরাচরে,
ভালবাসি আপনারে, মনের আনন্দে রই'।

(সাধের আসন)

পাশ্চাত্ত্য সমালোচকের ভাষায় বিহারীলালকে 'love-mystic' বলা চলে। যাঁহারা বিহারীলালের রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত, তাঁহারা জানেন, মর্ত্য-প্রীতি তাঁহার কাব্যের অন্যতম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আর এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার চিন্তাধারার যোগ্যতম উত্তরাধিকারী।

বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যের অন্তর্গত 'নারী-বন্দনা' হইতে কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার 'মহিলা কাব্য' (অসমাপ্ত) রচনার প্রেরণা লাভ করিয়াছেন। 'মহিলা' কাব্যের অবতরণিকায়, এবং 'মাতা' ও 'জায়া' এই সর্গদ্বয়ে বিহারীলালের চিন্তাধারার প্রভাব আছে। অবশ্য, সুরেন্দ্র মজুমদারের ভাষায় যে 'মিতাক্ষর-গাঢ়তা' আছে, বিহারীলালে তাহা নাই। 'মহিলা' কাব্যের দুইটি পংক্তি এককালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

'এলোকেশে কে এল রূপসী,
কোন্ বনফুল, কোন্ গগনের শশী'।

বিহারীলাল 'নারী-বন্দনায়' বলিয়াছেন—

'অয়ি ফুলময়ী প্রেমময়ী সতী,
সুকুমারী নারী, ত্রিলোক-শোভা,
মানস-কমল-কানন-ভারতী
জগজন-মন-নয়ন-লোভা'।

(বঙ্গসুন্দরী)

'মহিলা' কাব্যের অবতারণা বা উপক্রমেও অনুরূপ নারী-প্রশস্তি স্থান পাইয়াছে।

বিহারীলালের মধ্যে চিত্রকরের প্রতিভা ছিল, কিন্তু ভাস্করের প্রতিভা ছিল না। তিনি যে নিপুণ চিত্রকর ছিলেন, নিসর্গ-বিষয়ক কবিতাগুলিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কবি অনেক স্থলে পূর্বসূরিগণের কাব্য হইতে ভাব আহরণ করিয়াছেন কিন্তু তাহাতে কোথাও রসের অপকর্ষ ঘটে নাই। 'সারদামঙ্গলে' হিমালয়ের বর্ণনা—

'সানু আলিঙ্গিয়ে করে
শূন্যে যেন বাজি করে
বপ্র-কেলি-কুতূহলে মত্ত করীগণ'

পড়িতে পড়িতে কালিদাসের মেঘদূতের 'বপ্র-ক্রীড়া-পরিণত গজ-প্রেক্ষণীয়ং দদর্শ' মনে পড়িয়া যায়। আবার 'নিসর্গ-সন্দর্শনের' অন্তর্গত 'সমুদ্র-দর্শন' কবিতায়

'পুরাকালে তব তটে কত কত দেশ,
ঐশ্বর্য্য-কিরণে বিশ্ব কোরেছিল আলো,
যেমন এখন পরি মনোহর বেশ,
কত দেশ বেলাভূমে সেজে আছে ভাল'।

পড়িতে পড়িতে বায়রণের প্রসিদ্ধ কবিতার কথা মনে পড়ে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এখানে একটি কথার উল্লেখ করিতেছি। উনিশ শতকের কবি রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের কাব্যে যে স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষা ও পরাধীনতার বেদনা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, 'সমুদ্র-দর্শন' কবিতায়ও সেই আকাঙ্ক্ষা ও সেই বেদনাই কবির কণ্ঠ হইতে উৎসারিত হইয়াছে—

'এ দেশেতে রঘুবীর বেঁচে নাই আর,
তাঁর তেজোলক্ষ্মী তাঁর সঙ্গে তিরোহিতা,
কপটে অনা'সে এসে রাক্ষস দুর্ব্বার,
হরিয়াছে আমাদের স্বাধীনতা-সীতা'।

বিহারীলাল বাংলার কাব্যসাহিত্যে নূতন ধারার প্রবর্তক, মহাকাব্যের যুগে তাঁহার কণ্ঠেই সর্বপ্রথম আধুনিক গীতিকবিতার সুরটি ধ্বনিত হইয়াছে, তিনিই বাংলাসাহিত্যে এক নূতন ধরণের রোমান্টিক যুগের স্রষ্টা, অনেক সমালোচকই এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। বিহারীলাল সম্পর্কে এইরূপ উক্তিকে এ যুগে অনেকে অতিশয়োক্তি বলিয়া মনে করেন। অধ্যাপক শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্যের মতে আমরা যে গৌরব বিহারীলালকে অর্পণ করি, তাহা অনেকাংশে মধুসূদনের প্রাপ্য। তিনি বলিয়াছেন—'বিষয়াবলম্বন, রীতি ও কলাকৃতির দিক দিয়ে চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে মধুসূদন যে গীতিকাব্যধারার প্রবর্তন করেছেন পরবর্তী কালে বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয় বড়াল, দেবেন সেন প্রমুখ উত্তর সূরিবৃন্দের সার্থক সাধনার মধ্যে তা নব-নব সাফল্যের নিত্যপ্রেরণা হয়ে উঠেছে'। (সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ১১১) লেখক অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে মধুসূদন ও বিহারীলালের কবি-মানসের সাদৃশ্য আবিষ্কার করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, মধুসূদনের স্তবকগ্রন্থনের নিকট যে বিহারীলাল তাহার ছন্দের

জন্যও ঋণী, ইহাও দৃষ্টান্তের সাহায্যে প্রদর্শন করিয়াছেন। তথাপি বিহারীলাল যে সর্বদা সচেতন ভাবে মধুসূদনের কাব্য-কানন হইতে মধু আহরণ করিয়া তাঁহার মধুচক্র নির্মাণ করিয়াছেন, এমন কথা বলা যায় না। আর পূর্ব সূরিগণের নিকট ঋণ স্বীকার করিলেও তাঁহার গৌরব ক্ষুণ্ণ হয় না। আমরা বলিয়াছি, বিহারীলালের প্রতিভা নব-নব উন্মেষশালিনী ছিল না। তাঁহার ভাষায় নূপুরের নৃত্য আছে, মহাসাগরের গর্জন নাই। প্রকৃতির মধ্যে যাহা বিরাট, যাহা মহান্, যাহা সমুচ্চ, তাহার বর্ণনায় তিনি সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। হিমালয় বা সাগরের বর্ণনায় তিনি যে ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাও গম্ভীর বিষয়ের উপযোগী নহে। তিনি যথেষ্ট পরিমাণে ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও চলতি বুলির প্রয়োগ করিয়াছেন,—ইহাতে অনেক স্থলে তাঁহার রচনার উৎকর্ষও সাধিত হইয়াছে, কিন্তু 'সাব্লাইম্' বা গুরু-গম্ভীর বিষয়ের বর্ণনায় এই শ্রেণির শব্দ ও বাক্যাংশের প্রয়োগ রসিক জনের চিত্তকে পীড়া দেয়। ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বিহারীলাল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পিগণের মত শব্দচয়নকুশলী ছিলেন না। তাঁহার চিন্তাধারাও লঘু মেঘমালার ন্যায় সর্বদা তাঁহার হৃদয়-আকাশে সঞ্চরণ করিত, কিন্তু সংহত বা ঘনীভূত হইবার অবকাশ পাইত না।

তথাপি, নানা দোষত্রুটি সত্ত্বেও বিহারীলাল ভাব-কল্পনার স্বকীয়তায় বাংলা সাহিত্যে একক। রবীন্দ্রনাথ যে তাঁহাকে 'ভোরের পাখীর' সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন, তাহা এক হিসাবে সার্থক, কারণ, যখন তাঁহার কলধ্বনিতে বাংলার সাহিত্য-আকাশ মুখরিত হইয়াছিল, তখন প্রাচীদিগন্ত ধীরে ধীরে রবির অরুণচ্ছটায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিতেছিল।

গ্রন্থপঞ্জী অর্থাৎ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের তালিকা

[১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত]

গ্রন্থ		গ্রন্থকার	প্রকাশকাল
শর্মিষ্ঠা নাটক	...	মধুসূদন দত্ত	১৮৫৯
চারু পাঠ (তৃতীয় ভাগ)	...	অক্ষয়কুমার দত্ত	১৮৫৯
একেই কি বলে সভ্যতা	...	মধুসূদন দত্ত	১৮৬০
বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ	....	—ঐ—	১৮৬০
তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য	...	—ঐ—	১৮৬০
নীলদর্পণং নাটকং	...	দীনবন্ধু মিত্র	১৮৬০
মহাভারত (উপক্রমণিকা ভাগ)	...	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	১৮৬০
সীতার বনবাস	...	—ঐ—	১৮৬০
মেঘনাদবধ কাব্য	...	মধুসূদন দত্ত	১৮৬১
ব্রজাঙ্গনা কাব্য	...	—ঐ—	১৮৬১
কৃষ্ণকুমারী নাটক	...	—ঐ—	১৮৬১
চিন্তাতরঙ্গিণী	...	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৬১
বীরাঙ্গনা কাব্য	...	মধুসূদন দত্ত	১৮৬২
কর্মদেবী	...	রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৬২
আখ্যানমঞ্জরী	...	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	১৮৬৩
নবীন তপস্বিনী	...	দীনবন্ধু মিত্র	১৮৬৩
বীরবাহু কাব্য	...	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৬৪
হুতোম প্যাঁচার নক্সা (দুই ভাগ একত্রে)	...	কালীপ্রসন্ন সিংহ	১৮৬৪
দুর্গেশনন্দিনী	...	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৮৬৫
কপালকুণ্ডলা	...	—ঐ—	১৮৬৬
চতুর্দশপদী কবিতাবলী	...	মধুসূদন দত্ত	১৮৬৬
নব নাটক	...	রামনারায়ণ তর্করত্ন	১৮৬৬
বিয়ে পাগলা বুড়ো	....	দীনবন্ধু মিত্র	১৮৬৬
সধবার একাদশী	...	—ঐ—	১৮৬৬
লীলাবতী	...	—ঐ—	১৮৬৭

গ্রন্থ		গ্রন্থকার	প্রকাশকাল
সুরসুন্দরী	...	রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৬৮
ভ্রান্তিবিলাস	...	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	১৮৬৯
মৃণালিনী	....	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৮৬৯
ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (১ম)	...	অক্ষয়কুমার দত্ত	১৮৭০
বঙ্গসুন্দরী	...	বিহারীলাল চক্রবর্তী	১৮৭০
নিসর্গ-সন্দর্শন	...	—ঐ—	১৮৭০
প্রেম-প্রবাহিণী	...	—ঐ—	১৮৭০
কবিতাবলী	...	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৭০
বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার	....	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	১৮৭১
অবকাশরঞ্জিনী (১ম ভাগ)	...	নবীনচন্দ্র সেন	১৮৭১
হেক্টর-বধ	...	মধুসূদন দত্ত	১৮৭১
জামাই বারিক	...	দীনবন্ধু মিত্র	১৮৭২
বিষবৃক্ষ	...	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৮৭৩
বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার (দ্বিতীয় পুস্তক)	...	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	১৮৭৩
ইন্দিরা	...	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৮৭৩
কমলে কামিনী	...	দীনবন্ধু মিত্র	১৮৭৩
যুগলাঙ্গুরীয়	...	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৮৭৪
লোকরহস্য	...	—ঐ—	১৮৭৪
মায়াকানন	...	মধুসূদন দত্ত	১৮৭৪
বিজ্ঞান রহস্য	...	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৮৭৫
চন্দ্রশেখর	...	—ঐ—	১৮৭৫
রাধারাণী	...	—ঐ—	১৮৭৫
কমলাকান্তের দপ্তর	...	—ঐ—	১৮৭৫
বৃত্রসংহার (প্রথম খণ্ড)	...	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৭৫

গ্রন্থ		গ্রন্থকার	প্রকাশকাল
পলাশির যুদ্ধ	...	নবীনচন্দ্র সেন	১৮৭৫
পুষ্পাঞ্জলি	...	ভূদেব মুখোপাধ্যায়	১৮৭৬
রজনী	...	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৮৭৭
বৃত্রসংহার (দ্বিতীয় খণ্ড)	...	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৭৭
কৃষ্ণকান্তের উইল	...	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৮৭৮
রাজসিংহ	...	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৮৭৮
সারদামঙ্গল	...	বিহারীলাল চক্রবর্তী	১৮৭৯
কাঞ্চীকাবেরী	...	রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৭৯
সাম্য	...	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৮৭৯
রঙ্গমতী	...	নবীনচন্দ্র সেন	১৮৮০
ছায়াময়ী	...	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৮০
অবকাশরঞ্জিনী (২য় ভাগ)	...	নবীনচন্দ্র সেন	১৮৮২
আনন্দমঠ	....	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৮৮২
পারিবারিক প্রবন্ধ	...	ভূদেব মুখোপাধ্যায়	১৮৮২
দশমহাবিদ্যা	...	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৮২
মুচিরাম গুড়ের জীবন-চরিত	...	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৮৮৪
দেবী চৌধুরাণী	...	—ঐ—	১৮৮৪
মাধবীলতা	...	সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৮৮৫
কৃষ্ণচরিত্র (১ম ভাগ)	...	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৮৮৬
সীতারাম	...	—ঐ—	১৮৮৭
বিবিধ প্রবন্ধ (১ম ভাগ)	...	—ঐ—	১৮৮৭
রৈবতক	...	নবীনচন্দ্র সেন	১৮৮৭
ধর্মতত্ত্ব	...	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৮৮৮
বিবিধ প্রবন্ধ (২য় ভাগ)	...	—ঐ—	১৮৯২
সামাজিক প্রবন্ধ	...	ভূদেব মুখোপাধ্যায়	১৮৯২
কুরুক্ষেত্র	...	নবীনচন্দ্র সেন	১৮৯৩
বিবিধ প্রবন্ধ (প্রথম ভাগ)	...	ভূদেব মুখোপাধ্যায়	১৮৯৫
স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস	...	—ঐ—	১৮৯৫
প্রভাস	...	নবীনচন্দ্র সেন	১৮৯৬
চিত্তবিকাশ	...	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৯৮

নির্দেশিকা

ফ

ব

হ

ক্ষ